বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

ডি এস ই - ৪০৪

(বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ)

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. শান্তনু দাস — অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পাঠক্রম

ডি এস ই - ৪০৪

(বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ)

নাটক : অনুশীলন ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ ১ (সময় ৪ ঘণ্টা)

নাট্যাভিনয় নাট্যপ্রযোজনা (মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আবহরচনা)

পর্যায় গ্রন্থ ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

নাট্যকলা, অভিনয়কলা অনুশীলন ও পাঠ

পর্যায় গ্রন্থ ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

সংলাপ রচনা

পর্যায় গ্রন্থ ৪ (সময় ৪ ঘণ্টা)

নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ : থিয়েটারের ভাষা—উৎপল দত্ত,
অন্বয়; বেট্রোল্ড ব্রেশট—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রসঙ্গ নির্দেশনা—অশোক মুখোপাধ্যায়,
থিয়েটারওয়ালার সিনেমা—বিভাস চক্রবর্তী,
থিয়েটার নিয়ে—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,
রঙ্গমঞ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কাকে বলে নাট্যকলা—শম্ভু মিত্র,
তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক—বাদল সরকার।

ডি এস ই - ৪০৪
(বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ)

সূচিপত্র

ডিএসই-৪০৪	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	নাট্যাভিনয় নাট্যপ্রযোজনা (মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আবহরচনা)	অধ্যাপক ড. শান্তনু দাস	১-৩৭
পর্যায় গ্রন্থ ২	নাট্যকলা, অভিনয়কলা অনুশীলন ও পাঠ	ড. শ্রাবন্তী পান	৩৮-৬১
পর্যায় গ্রন্থ ৩	সংলাপ রচনা	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	৬২-৯৯
পর্যায় গ্রন্থ ৪	নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ : থিয়েটারের ভাষা—উৎপল দত্ত, অন্বয়; বেট্রোল্ড ব্রেশট—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ নির্দেশনা—অশোক মুখোপাধ্যায়, থিয়েটার নিয়ে—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	১০০-১৫৭
	থিয়েটারওয়ালার সিনেমা—বিভাস চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাকে বলে নাট্যকলা—শম্ভু মিত্র, তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক—বাদল সরকার	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

নাটক : অনুশীলন ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ : ১

নাট্যাভিনয় নাট্যপ্রযোজনা

(মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আবহরচনা)

আলো

আধুনিক নাট্য-প্রযোজনায় আলো অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে নাট্য-প্রযোজনার সাথে আলোর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মূলত বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কার ও তার প্রয়োগে প্রভূত পরিমান উন্নতি ঘটেছে নাট্য-প্রযোজনায়। প্রাচীনকালের থিয়েটার মূলত দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হত এবং এই মঞ্চগুলো ছিল উন্মুক্ত(। ফলত প্রাচীন মিশর ও গ্রীসের থিয়েটারে নাট্যাভিনয় দিনের বেলায় সূর্যালোকে অনুষ্ঠিত হত। এই নাট্য উপস্থাপনাগুলি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হত। ফলত কৃত্রিম আলো ব্যবহার এই যুগে নেই।

বি(েনাট্যের ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটার একটি গু(ত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে রয়েছে। যদিও এই থিয়েটারের উদ্ভব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অবিভক্ত(ভারতবর্ষে নাট্য-চর্চার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রে। নাট্য উপস্থাপনা সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রই আমাদের কাছে প্রামান্য গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রে নাট্য-প্রযোজনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেই আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, নাট্যশাস্ত্রের ষড়বিংশ অধ্যায়ে, প্রভাত, দিন, সন্ধ্যা, রাত্রি, গগন, ন(ত্র, চন্দ্রকিরণ, সূর্য, মধ্যাহ(, বিদ্যুৎ, আগুন, উল্কাপাত, স্ফুলিঙ্গ, শি(া, বজ্রপাত প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। যদিও আলো সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। এইগুলি আঙ্গিক অভিনয়ের 'চিত্রাভিনয়' প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে বলেই মনে হয়। অপরদিকে নাট্যশাস্ত্রের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে অভিনয়ের সময়কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে তাতে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে বলা হচ্ছে কেবলমাত্র অর্ধরাত্র, মধ্যাহ(ও সান্ধ্যভোজন কালে নাট্যাভিনয় প্রযোজ্য নয়। ফলত দিবা-রাত্রের যে কোনো সময়ই নাট্যাভিনয় হতে পারে। উন্মুক্ত(জায়গায় দিনের বেলায় সূর্যালোকে সম্ভব। কিন্তু রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরে অর্থাৎ আচ্ছাদিত স্থানে দিনের বেলাতেও কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন। তবে এই আলো শুধুমাত্র দৃষ্টিগোচরতার (visibility) জন্যই ব্যবহার হত। আলোর উৎস রূপে ছিল মশাল, তেল, চর্বি বা মোম।

প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারের পর রোমান থিয়েটার। গ্রীক মঞ্চ স্থাপত্য অনেকটা পরিবর্তিত হয় এই রোমান থিয়েটারে। রোমে থিয়েটার সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হত। ফলে দর্শক আসনকে আচ্ছাদিত করা হত ক্যানভাস কাপড় দিয়ে। রোমেও থিয়েটার মূলত দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হত, ফলে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন পড়ত না।

কিন্তু রঙ্গালয়ের আচ্ছাদিত করবার পর ওই নাট্য উপস্থাপনা দর্শকদের দৃষ্টিগোচর কি ভাবে হতো—তা একটা প্র(্ন বটে। হয়তো এমনভাবে রঙ্গালয় নির্মিত হত যাতে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে। এর পাশাপাশি কৃত্রিম আলোর ব্যবহারও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা পাশ্চাত্য দেশে রোমেই প্রথম রাত্রিকালিন নাট্যাভিনয় প্রচলিত হয়েছিল। এবং তাতে মশালের ব্যবহার আমরা জানতে পারি। সুতরাং মঞ্চে কৃত্রিম আলোর ব্যবহারে রোমান থিয়েটারের অবদান রয়েছে।

থিয়েটারের ইতিহাসে এর পরবর্তী অধ্যায় 'অন্ধকার যুগ' (Dark age) নামে পরিচিত। এই সময়ে ইউরোপে খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে নাট্যসাহিত্য ও নাট্য প্রযোজনায় ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ধর্মীয় যাজকগণ নাট্য সাহিত্য ও নাট্য প্রযোজনায় নানা রূপ বাধা নিষেধ আরোপ করে সকল রকমের নাট্যানুষ্ঠানকে স্তব্ধ করে দেন। চার্চ দ্বারা গৃহীত এই সকল কর্মকান্ডকে তদানিন্তন শাসকশ্রেণীও সমর্থন দিয়েছিল। ফলত এই সময় নাটকের দলগুলি নাট্যশালা থেকে বিচ্যুত হয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, গ্রামাঞ্চলে নৃত্যগীতের মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পরিবেশন করত। ভ্রাম্যমান এই নাট্যানুষ্ঠানগুলি দিনের বেলাতেই অনুষ্ঠিত হত ফলে সূর্যালোক ব্যতীত কৃত্রিম আলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে চার্চের আনুকূল্যে জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টের জীবন ও ধর্মের প্রচারের জন্য নাটককে ব্যবহার করা হল। এর ফলস্বরূপ নাট্যাভিনয় এখন থেকে চার্চের অভ্যন্তরে ও বাইরে দিবালোকে হতে লাগল। চার্চের ভিতরে অভিনয়ের (্ত্রে দরজা, জানালা ও অন্যান্য উন্মুক্ত(জায়গা দিয়ে দিনের আলো যথেষ্ট পরিমান প্রবেশ করত। ফলত কৃত্রিম আলোর ব্যবহার প্রয়োজন হত না। কিন্তু অভিনয়ের সময় মোমবাতির ব্যবহারের উল্লেখ আমরা পাই। অনেকে এটাকে ধর্মীয় রীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। খৃষ্টধর্মে যীশুর প্রতিমূর্তি বা প্রতীকের সম্মুখে অথবা পা(্বে মোমবাতি ব্যবহারের প্রচলন আছে। এই বাস্তব জীবনের রীতি-নীতি যখন নাটকে ব্যবহৃত হয় তা তখন বাস্তবমূল্য অপে(া শৈল্পিক মূল্যই অধিক বিচার্য হয়। সুতরাং মধ্যযুগে চার্চের ভিতর অভিনয়ে যে মোমবাতির ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অবশ্যই অভিনয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দৃশ্য-উপকরণ, চরিত্র যীশুর প্রতীত, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির মতোই মোমবাতি ও ব্যবহার করা হত। এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কৃত্রিম আলো অবশ্যই তৈরি হত। এই সময় mystery নাটকের (্ত্রেও দৃশ্যসজ্জায় দানবের মুখ দেখানো হত নরকের দৃশ্যে। ওই মুখ দিয়ে আগুনের ঝলক মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসত। এই সবই কৃত্রিম উপায়ে আলোক সৃষ্টি নানা কলাকৌশল। ফলত মধ্যযুগে চার্চের ভিতরে নাট্য উপস্থাপনায় মোমবাতির ব্যবহার তা এই চার্চের আনুকূল্যে নাট্য প্রযোজনা কৃত্তিম আলোর (artificial light) প্রয়োগ নিঃসন্দেহে নাট্য-(্ত্রে কৃত্রিম আলোর ব্যবহারে দ্বিতীয় পদ(ে প।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসে দেখা দিল বৈপ-বিক পরিবর্তন। এই সময় বিশেষ করে ইতালীর শিল্প, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে এক নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল যায় প্রভাব ইউরোপের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী হয়ে উঠল। এই সময় 'দর্শনানুপাত' (perspective) রীতির পুনরাবিষ্কার ও অগ্রগতি এই যুগের (renaissance) এক অবিষ্মরণীয় অবদান। এই দর্শনানুপাত' রীতির উপর ভিত্তি করে নাট্য প্রযোজনার দৃশ্যপট অঙ্কন শু(হল। শুধু দৃশ্যপটই নয় আলোর নিত্য নতুন প্রয়োগে এই দর্শনানুপাত রীতি নাট্য-শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। 'আলো' আর শুধু রঙ্গমঞ্চকে আলোকিত করে দর্শকদের দৃষ্টিগোচর করে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। নতুন নতুন আলোক যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থানের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যের পরিবেশ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। মঞ্চে রঙিন আলোর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নাট্য প্রযোজনা অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালীয় বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন রঙ্গালয় গড়ে ওঠে এবং তাতে দর্শনানুপাত রীতির অঙ্কিত দৃশ্যপট ব্যবহৃত হত। ফলত তাকে আলোকিত করতে কৃত্রিম আলোক যে ব্যবহার করা হয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। এই সময়েই ইতালীতে কিছু ব্যক্তি(গত (Private) রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল, প্রধানত রাজপ্রাসাদে, বিত্তবান ব্যক্তি(বর্গের প্রাসাদোপম গৃহে বা বলনৃত্যের হল ঘরে। এই স্থানগুলিতে নৃত্য, গীত ও নাট্যের যে অনুষ্ঠান হত, তা মূলত রাত্রিকালে হত এবং তাতে যথেষ্ট পরিমান কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা হত। আলোর উৎস ছিল মশাল, মোমবাতি ও তৈল প্রদীপ। ব্যক্তি(গত রঙ্গালয়ের সাথে সাথে সাধারণ রঙ্গালয়েও কৃত্রিম আলোর ব্যবহার শু(হয়ে যায়। অনেকগুলি মোমবাতি বা তৈলপ্রদীপ মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে বা ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এর মধ্যে দিয়ে মূলত মঞ্চ আলোকিত করবার কাজই হতো। এরপর মঞ্চের কৃত্রিম আলোর সাহায্যে মঞ্চ আলোকিত করা এবং দৃশ্যপটকে যথাযথ প্রকাশের জন্যও ব্যবহার করা হতে লাগল। আলোকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় মঞ্চ ও দর্শকস্থান প্রায় সমানভাবে আলোকিত হত। এই সমস্যা সমাধানের নানান প্রচেষ্টা হয়েছিল বটে, তবে বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের আগে তা সফলভাবে মঞ্চে করা যায় নি। এই সময়ই আলোকবাতির অবস্থান মঞ্চের একদম সম্মুখভাগে নীচে (যা আজ আমরা পাদপ্রদীপ বা Foot light বলি) স্থাপন করা হত। কিন্তু এই ব্যবস্থা খুব আশাপ্রদ মনে হল না। নতুন বিষয়ের খোঁজ চলতে লাগলো।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেই মঞ্চে রঙীন আলোর প্রয়োগ দেখা যায়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর Sebastiano Serlio কর্তৃক দর্শনানুপাত পদ্ধতিতে আঁকা দৃশ্যপটে নানা বর্ণের আলোর ব্যবহার আলোক শিল্পের উৎকর্ষতারই পরিচয় দেয়। দেশীয় পদ্ধতিতে কাঁচের পাত্রে মদ (wine) লাল, নীল বা অন্য কোনো বর্ণের তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি পরিচালিত করে এই রঙিন আলো সৃষ্টি করা হত। Sebastiano একজন মঞ্চবিদ ছিলেন। তিনি ট্র্যাজেডি, কমেডি ও স্যাটায়র নাটকের গু(ত্ব অনুসারে দৃশ্যপট তৈরি করতেন এবং সেই অনুসারে তার প্রকাশ ব্যবস্থাও করতেন। তিনি কিছ কিছু আলোক উৎসকে গুপ্তভাবে স্থাপন করতেন যার মধ্যে দিয়ে চরিত্র অনুসারে দৃশ্যের প্রয়োজনে তা প্রকাশ পেত। এই সমগ্র প্রক্রি(য়ার মধ্যে দিয়ে আলোর দুটি ভূমিকা আমরা দেখতে পাই— ১) মঞ্চে বাস্তবতা সৃষ্টি ও ২) চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশে রঙের ব্যবহার। Sabastiano তাঁর 'Architectura' নামক মঞ্চ বিষয়ক গ্রন্থে তিনি এই সব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই মহান শিল্পীর অন্যতম আবিষ্কার প্রতিফলনের (Reflection) মাধ্যমে আলোর উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করে তাকে মঞ্চে প্রতিস্থাপিত করা। প্রতিফলরূপে তিনি বেসিন (Basin) ব্যবহার করেছিলেন।

Sebastiano Serlio-র আবিষ্কারকে ভিত্তি করে ইতালীর মঞ্চে আলোর নানান বিকাশ ঘটতে থাকে। তৎকালীন নাট্য পরিচালক ও মঞ্চবিদ De Somi তাঁর একটি রচনা থেকে জানা যায় কমেডি নাটকের (ে ত্রে বিভিন্ন দৃশ্যে যেমন- পথে, উপরে, নীচে বা ঘরের ছাদে যথেষ্ট পরিমান আলোর ব্যবস্থা করে অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করেছিলেন। অপরদিকে ট্র্যাজেডি নাটকের উপস্থাপনার বিশেষ মুহূর্তে আলোকে ঢেকে দিয়ে বা নিভিয়ে দিয়ে সেই আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করা হত। এমনকি রঙিন আলোর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিবেশ (Environment) ও চরিত্রের মনস্তাত্বিক দিকটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

Nicola Sabbattini ইতালির অপর একজন বিশিষ্ট মঞ্চবিদ ছিলেন। তিনি ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'Practica de Fabricar Scene e Machine ni Tea Tre' নামে মঞ্চ ও দৃশ্য বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই

বইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি সেই সময়ের দৃশ্য পরিকল্পনা, দৃশ্য পরিবর্তন বা দৃশ্য সংযোজন ইত্যাদি কিভাবে সংগঠিত হত। তিনি মঞ্চে কোন নাট্যদৃশ্যে আগুন লাগবার effect তৈরি করেছিলেন। ঐ সময় আলোক উৎসগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের আড়ালে, উইংয়ের আড়ালে বা ঝালরের আড়ালে রাখা হত। অনেক ে(ত্রে আলোক উৎসগুলির উপর ঢাকনাও ব্যবহার করা হত। অভিনয় চলাকালীন মঞ্চকর্মীদের দিয়ে আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হত। এরা নাটক চলাকালীন আলো নিভিয়ে বা প্রদীপের পলতেটিকে (wick) বাড়িয়ে দিয়ে আলোর উজ্জ্বলতা কমানো বা বাড়ানো করবেন। কিন্তু দর্শক স্থানকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে তোলা যেত না। Nicola Sabbastine আলোক পরিকল্পনায় সম্মুখ অপে(া পার্শ্ববর্তী আলোক পরিকল্পনায় জোর দিয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁর সুফল পৌঁছাতে কিছুটা দেরী হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের নাট্য ধারায় মধ্যযুগীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল। রেনেসাঁ পরবর্তীকাল, বিশেষ করে রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের শিল্পসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সময়। রানীর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫৭৬ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে Black Friars (1576), The Theatre (1576), The Curtain (1577), Rose (1587), Swan (1595), Globe (1598), The Fortune (1600) প্রভৃতি স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একমাত্র Black Friars ছাড়া অন্য সবগুলি ছিল উন্মুক্ত(এবং তখনও ইংল্যাণ্ডে দিনের বেলাতেই অভিনয় হত। ফলত কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি ছিল না। তৎসত্ত্বেও এলিজাবেথীয় মঞ্চে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। এই আলোর প্রয়োগ General Illumination-এর জন্য নয় তবে তা ব্যবহার হত স্থান, কাল ও পরিবেশ রচনার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই Shakespeare-এর 'Romeo and Juliet' নাটকে Juliet-এর শয়নক(Balcony upper stage-এ দেখানো হত এবং ওই দৃশ্যের রাত্রিকাল বোঝাতে মোমবাতির ব্যবহার করা হত।

এলিজাবেথীয় যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ে দৃশ্য-সজ্জার তেমন কোন আড়ম্বর ছিল না। তবে রাজসভায় অভিনীত 'মাস্ক' (Masque) শ্রেণীর নাটকের উপস্থাপনা খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। Inigo Jones ছিলেন ইংল্যাণ্ডের একজন প্রতিষ্ঠিত স্থপতি ও চিত্রশিল্পী। তিনি প্রথম জীবনে ইতালীয় চিত্র ও মঞ্চ স্থাপত্য বিষয়ে শি(া গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে রাজসভায় 'মাস্ক' নাটকের দৃশ্যপটে ইতালীয় রীতির চিত্রকলার প্রয়োগ শু(করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের নাট্যধারাকে প্রসারিত করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসেনিয়াম আর্চ, সম্মুখ যবনিকা, চলমান দৃশপট, ঘূর্ণায়মান উইং, দর্শনানুপাত রীতির দৃশ্যপট অঙ্কন ইত্যাদি যেমন ছিল তেমনই আলোর কলাকৌশলও ছিল। আলোক উৎসগুলি নীচে, উপরে, উইং ও সাটারের আড়ালে রেখে মঞ্চমায়া (Stage Illusion) সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (আনুমানিক ১৬১৯) প্রসেনিয়াম মঞ্চের (Proscenium stage) প্রচলন হয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রবর্তনের সাথে সাথেই নাট্যমঞ্চ উন্মুক্ত(থেকে আচ্ছাদিত অবস্থার মধ্যে এসে পড়ে। ফলে নাট্যমঞ্চে কৃত্রিম আলোর গু(ত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আলোর উৎসগুলি আগের মতোই কিন্তু বা আগের থেকে অনেক পরিচ্ছন্ন ভাবে মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তভাবে বসিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা হত। কপিকলের সাহায্যে তাকে উঠিয়ে বা নামিয়ে ব্যবহার করা হত। এমনকি কোন দৃশ্যের অভিনয় চলাকালীন কোন আলো নিভে গেলে তাকে প্রজ্বলিত করবার জন্য মঞ্চকর্মীরা সরাসরি মঞ্চের উপর গিয়ে সেই আলো

প্রজ্বলিত করতেন। এতে দর্শক বা অভিনেতা কেউই বিরক্ত(হতেন না। কারণ এটাই ছিল তখনকার সময়ের নিয়ম। রাত্রিকালীন দৃশ্য বোঝাতে আলো নিভিয়ে তা কপিকলের সাহায্যে সরিয়ে দেওয়া হত। এই অবস্থায় কখনও কখনও অভিনেতা প্রজ্বলিত মোমবাতি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের নাট্যমঞ্চে ডেভিড গ্যারিকের বাস্তবমুখী (Realistic) অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনা, দর্শকদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তিনি মঞ্চ ও দৃশ্যপটের সাথে সাথে আলোক ব্যবস্থারও প্রভূত সংস্কার করেন। মঞ্চের আলোগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করলেন যাতে দর্শকাসন ও মঞ্চের আলোর তীব্রতার ফারাক হয়। এছাড়াও আলোকবাতিগুলি যথাসম্ভব উইং বা দৃশ্যপট বা মঞ্চের সামনে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এতো কিছুর পরও দর্শক আসন সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত করা যায়নি। Garrick তাঁর নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চের সামনে নীচের দিকের উৎসগুলিকে (Footlight) বেশী ব্যবহার করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের নাট্য প্রযোজনায় বাস্তবমুখি আলোর প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গ্যাসবাতির (Gas light) মঞ্চে প্রয়োগ, ইউরোপের নাটকে এক গু(ত্বপূর্ণ পদ(প। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে Paris Opera-তে প্রথম গ্যাস বাতির ব্যবহার হয়েছিল। এর আট বছর পর লণ্ডনের Lyceum থিয়েটারে এবং পরবর্তীতে বিশ বছরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল রঙ্গমঞ্চে এই আলোর ব্যবহার শু(হত। গ্যাসের আলো আবিষ্কৃত হয় ১৭৮০-৮১ সালে, তবে তা আবিষ্কারের সাথে সাথেই তা মঞ্চে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এই আলো প্রথমে প্রে(াগৃহে (Auditorium) এবং পরে ধীরে ধীরে মঞ্চে ব্যবহার করা হয়। মঞ্চে গ্যাসবাতির প্রয়োগের সাথে সাথেই আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খিত আলোক নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল কিছুটা আয়ত্ব করা গেল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ রূপে তা সম্ভব হল না। একটি মূল পাত্র (Gas Cylinder) থেকে গ্যাস রবারের নমনীয় নলের মাধ্যমে মঞ্চের বিভিন্ন অংশে, মূলত যেখানে নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে আলোর প্রয়োজন সেখানে এবং দর্শকাসনে গ্যাস বাতিকে প্রতিস্থাপিত করে তার মধ্যে অগ্নি সংযোগ করে আলোকিত করা হত। গ্যাসবাতির ব্যবহারে মঞ্চালোকের উজ্জ্বলতা (intencity) অনেক পরিমানে বৃদ্ধি পেল। এর ফলস্বরূপ মঞ্চের রঙিন আলোর প্রকাশ অনেক স্বচ্ছ হল। দ্বিতীয়ত গ্যাসের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রা(প্ত আলোর কম-বেশি করা সম্ভব হল। কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে আবার গ্যাসবাতি জ্বালানো সম্ভব ছিল না। তার ফলে প্রে(াগৃহ সম্পূর্ণ অন্ধকার করে বা নাটকের দৃশ্যান্তরে সম্পূর্ণ অন্ধকার করা এখনও সম্ভব হল না।

সেই সময় এই গ্যাসবাতির ব্যবহার ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য, তাই বড় বড় কয়েকটি রঙ্গালয় ছাড়া অন্যত্র এর ব্যবহার প্রায় ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোর আবিস্কার ও প্রয়োগের আগে পর্যন্ত ছোট ও ভ্রাম্যমান নাট্যদলগুলি মোমবাতি ও প্রদীপের আলোর উপরই নির্ভরশীল ছিল।

গ্যাসবাতির পরবর্তী পর্যায়ে লাইম লাইটের (Lime light) আবিস্কার হয়। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চে প্রথম লাইম লাইটের ব্যবহার শুর হয়। এক বিশেষ ধরনের চুনাপাথরের উপর গ্যাসের দ্বারা অগ্নিশিখা (Flame) প্রা(গত করে তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি মঞ্চে প্রয়োগ করা হত। এই আলো গ্যাসের আলোর থেকে উজ্জ্বল ও অনেক বেশী সাদা হত। এর ফলে এই আলোর সাহায্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী তথা নাট্যদৃশ্যগুলিকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করা সম্ভব হল। এই সময়ের গু(ত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল প্রতিফলকের (Reflector) ব্যবহারের

মধ্যে দিয়ে বিশেষ নাট্য মুহূর্তে আলোকে কেন্দ্রীভূত করে তার ব্যবহার করা। যাকে আজকের দিনে আমরা Spotting বা Focusing বলে থাকি। লাইম লাইটের উজ্জ্বলতা গ্যাসের আলোর চেয়ে অনেক বেশী, ফলত রঙিন আলো সৃষ্টিতে তা আরো বেশী সহায়ক হয়ে উঠল।

লাইম লাইটের পরবর্তী অধ্যায় হল মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার। মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে আমাদের নাট্য প্রয়োজনায় প্রভূত পরিমান উন্নতি হয়। এই উন্নতির কথা জানবার আগে এই পর্যায়ের আলোর প্রয়োগের অসুবিধাগুলি আমরা একটু জেনে নিলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে কি সুবিধা ঘটল তা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

১) নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা   নাটকের প্রয়োজন অনুসারে আলোকযন্ত্রগুলি জ্বালানো বা নেভানো যেত না। দর্শকাসনকে সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকার করা সম্ভব ছিল না ফলত মঞ্চমায়া সৃষ্টিতে খুবই বাধা তৈরি হত। মঞ্চকর্মীদের সাহায্যে আলোক বাতির নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও তা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। এবং নাট্যরসে বাধা সৃষ্টি হত। পরবর্তী সময়ে গ্যাস ও লাইম লাইটের (েত্রে প্রয়োজন মতো কমানো গেলেও তাকে সম্পূর্ণ নিভিয়ে আবার পুনরায় জ্বালানো প্রায় অসম্ভব ছিল। বৈদ্যুতিক আলোয় এই সকল কাজ খুব সহজেই করা সম্ভব হল।

২) ধোঁয়া (Smoke)   মোমবাতি, তৈল প্রদীপ বা মশালের ব্যবহারে প্রচুর পরিমানে ধোঁয়া নির্গত হত। এক বা দুটি মোমবাতি বা তৈল প্রদীপে এমন কিছু ধোঁয়া নির্গত হয় না। কিন্তু মঞ্চকে যথেষ্ট পরিমান উজ্জ্বল করবার প্রয়োজনে অনেক বেশী পরিমানে মোমবাতি ও তৈল প্রদীপ ব্যবহার করা হত। ফলত এই ধোঁয়া অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দর্শকদের চোখে প্রভূত পরিমান অসুবিধা সৃষ্টি করত। পরবর্তীকালের গ্যাস বা লাইম লাইটের আলোয় এই জাতীয় ধোঁয়ার সৃষ্টি হত না আর বৈদ্যুতিক আলোর (েত্রে তা একেবারেই না।

৩) তাপ (Heat)   মোমবাতি ও তৈল প্রদীপে যে তাপ উৎপন্ন হত তা খুব বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করত না। গ্যাসের আলোর (েত্রেও নয়। কিন্তু লাইম লাইটের আলো যথেষ্ট পরিমান তাপ সৃষ্টি করত। যদিও এই আলেকযন্ত্রগুলি একেবারে মঞ্চে না থেকে, উইংয়ের আড়ালে থাকত ফলে সরাসরি মঞ্চের পার্(্ববর্তী অংশে প্রভূত তাপ প্রকট হত। এই তাপের কিছুটা প্রভাব মঞ্চ ও দর্শকাশনেও অনুভূত হত। বৈদ্যুতিক আলোর উৎসও তাপ সৃষ্টি করে তবে তা লাইম লাইটের তুলনায় অনেক কম।

৪) অগ্নি সংযোগ   মোমবাতি, তৈলপ্রদীপ, গ্যাস বা লাইম লাইট উন্মুক্ত(থাকার ফলে সামান্য অসাবধানতা বশত মঞ্চে আগুন লেগে যেত। পাশ্চাত্য দেশের মঞ্চগুলিতে এই জাতীয় দূর্ঘটনা বহুবার ঘটেছে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'Globe' ও 'The Fortune' থিয়েটার এইভাবেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে আগুন লাগবার ঘটনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তা নয়। তবে তার সম্ভাবনা অনেক কমে গেল। এই সার্বিক পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে বৈদ্যুতিক আলোর পূর্ববর্তী আলোক উৎসগুলি মঞ্চে ব্যবহারের (েত্রে বৈদ্যুতিক আলোর তুলনায় অনেক বেশী অসুবিধাজনক ও (তিকারক ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম আবিষ্কার হল বিদ্যুৎশক্তি((Electric Power)। লণ্ডনের 'স্যাভয়' থিয়েটারে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর (Electric light) ব্যবহার এক ইতিহাস রচনা করে। বৈদ্যুতিক শক্তি(র ব্যবহারে মঞ্চের নানা প্রকার যান্ত্রিক কলা কৌশলের প্রভূত উন্নতি সাধন ঘটে। আলোক যন্ত্রের উন্নতির সাথে সাথে দৃশ্য নির্মাণ তথা পশ্চাদপট চিত্রনের রীতিতেও পরিবর্তন ঘটল। নতুন আলোর পদ্ধতিতে আলো

অনেক বেশী নমনীয় ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজতর হবার ফলে মঞ্চে বাস্তবধর্মী পরিবেশ ও রস সৃষ্টি খুব সহজেই সম্ভব হল। আবিস্কৃত হল 'দ্বৈত মঞ্চ' (Double stage) 'হড়কানো মঞ্চ' (Sliding Stage), নতুনভাবে 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চ' (Revolving Stage) ইত্যাদি। সৃষ্টি হল আধুনিক 'সাইক্লোরামা' (Cyclorama)। মঞ্চের পিছনে সাইক্লোরামাতে আলোর সাহায্যে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাত প্রভৃতি বাস্তবমুখী দৃশ্যাবলি সৃষ্টি করা সম্ভব হল। মঞ্চের বিভিন্ন অংশের ও নাটকের প্রয়োজন নানা রকমের আলোকযন্ত্র তৈরি হল।

মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাস ও লাইম লাইটের ব্যবহার বিদূরিত করা যায়নি। প্রায় ১৮২২ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত গ্যাস ও লাইম লাইটের প্রয়োগে কিছু পরী(া নিরী(াও সম্ভব হয়েছিল। এই সময়কালে ইংল্যাণ্ডের মঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতারা যথা- David Garrick, Edmond Kean, Charles Macready, Madam Vestris প্রমুখরা মঞ্চে অভিনয় শিল্পের উন্নতি সাধনের সাথে সাথে মঞ্চে অন্যান্য জিনিসের উন্নতি সাধনেও স্বচেষ্ট হয়েছিলেন। মঞ্চে রঙিন আলোর পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার, গ্যাসের আলোর প্রতিফলন করে স্বতন্ত্রভাবে চরিত্র বা বস্তুবিশেষের উপর প্রয়োগ করে মঞ্চালোকে নতুন দিগন্তের হদিশ দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শু(করে শেষের তিন দশকের ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা Henry Irving, অভিনয়ের সাথে সাথে মঞ্চ সংস্কারকও ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে তিনি বহুকিছু প্রবর্তন করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য মঞ্চকে সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলা। অর্থাৎ একটি দৃশ্যের অভিনয় সমাপ্ত হতেই মঞ্চের সব আলো নিভিয়ে মঞ্চকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং ওই অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তন করা হত। এই রীতি ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়ত অভিনয় চলাকালীন প্রে(াগৃহকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা। এর মধ্যে দিয়ে মঞ্চ ঘটে যাওয়া অভিনয়ের প্রতি দর্শকদের পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করা। তৃতীয়ত, Irving মঞ্চকে বিভিন্ন অংশে (Zone) বিভক্ত(করে প্রত্যেকটি অংশের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন। শুধু তাই নয় দৃশ্য ও চরিত্রের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন। চতুর্থত, আলোক উৎসগুলি সব সময়ই দর্শকে দৃষ্টির আড়ালে স্থাপন করেছেন। পরিবেশ রচনার মধ্যে দিয়ে বাস্তবতা সৃষ্টি, চিত্র রচনা ও চরিত্রের মানসিক অবস্থার প্রকাশে রঙের ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নাট্যরস দর্শকদের মধ্যে খুবই ভালোভাবে সঞ্চারিত হত। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী Ellen Terry-র বক্ত(ব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, Irving গ্যাস, লাইম লাইট ও বৈদ্যুতিক আলো এই তিন ধরনের আলো নিয়েই কাজ করেছিলেন কিন্তু তিনি লাইম লাইটের আলোকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন।

মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার শু(হতেই নানাবিধ পরী(া নিরী(া চলতে থাকে। এর ফলে থিয়েটারে প্রভূত পরিমান পরিবর্তন ও আমরা ল(করি। বিংশ শতাব্দীতে এসে থিয়েটার হয়ে ওঠে 'পীপ শো' (Peep Show) থিয়েটার। পীপ কথাটির অর্থ হল উঁকি মেরে দেখা। অর্থাৎ কিনা কোন ছিদ্র বা গহ্বরের মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত মোমবাতি, তৈল প্রদীপ, গ্যাস বাতি বা লাইম লাইটের ব্যবহার উপর থেকে ঝুলিয়ে বা নীচে রেখে ব্যবহার করা হত। এতে মঞ্চ ও দর্শকস্থল প্রায় সমান ভাবেই দর্শকদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত(থাকত। যদিও গ্যাস ও লাইম লাইটের সময় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ রূপে দর্শক স্থানকে আলোকহীন করা যায়নি। ফলত ওই সকল থিয়েটারকে ঠিক পীপ শো বলা যায় না। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে দর্শকাসনকে প্রয়োজন মতো সম্পূর্ণভাবে আলোকহীন করা গেল। এরফলে প্রসেনিয়াম আর্চের গু(ত্ব অনেক বৃদ্ধি

পেল। অভিনয় ও সামগ্রিক দৃশ্যসজ্জা প্রসেনিয়ামের অভ্যন্তরে চলে গেল। প্রসেনিয়ামের দেওয়ালটি হয়ে উঠল মঞ্চের চতুর্থ দেওয়াল। আর তার মধ্যবর্তী খোলা অংশটি হল 'ছিদ্র' বা মঞ্চমুখ (Proscenium Opening)। নাটক চলাকালীন সম্পূর্ণ অন্ধকারে বসে থাকা দর্শকরা যেন মঞ্চমুখ রূপী ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে সব কিছু দেখছেন। এই কারনেই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে 'পীপ শো থিয়েটার' বলা হয়। বাস্তবিক প(আমাদের থিয়েটার 'পীপ শো থিয়েটার' হয়ে ওঠার জন্য বৈদ্যুতিক আলো ও তার উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সময়টিতে বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কার ও মঞ্চে তার প্রয়োগ শু(হয়, সেই সময়টি ছিল নাট্য উপস্থাপনায় বাস্তববাদী (Realistic) ও স্বভাববাদী (Naturalistic) ধারার প্রসারকাল। প্রকৃতপ(সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা জুরে বাস্তব ও অতি বাস্তব (স্বভাববাদী) নাট্যধারার জোয়ার এসেছিল। নানা ধরণের আলোকযন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আলোর (সাদা এবং রঙিন) প্রয়োগও উন্নত হয়। বাস্তব হল সত্য। আমরা যা করি, আমাদের চতুর্দিকে যা কিছু দেখি, তাই বাস্তব। জীবনের আশা-আকাঙ্খা, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আচার-আচারণ সব কিছুই বাস্তব। এইসব কিছুকেই শিল্পসম্মতভাবে নাটকে ও মঞ্চে উপস্থাপিত করাই—নাটকে বা মঞ্চে বাস্তবতা। অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা বা আলো সব কিছুর মধ্যে দিয়ে মঞ্চে বাস্তবতা সৃষ্টি হল। এই বাস্তবতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল রাশিয়ান থিয়েটারে। Stanislavsky-র পরিচালনায় Moscow Art Theatre-এর নাট্য প্রযোজনাগুলি ছিল অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তাঁর পরিচালিত 'Tsar Fyodor', 'The Sea Gull' বা 'The Lower Depths' নাটকের উপস্থাপনা যে প্রকারের বাস্তবধর্মী দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছিল তা দর্শকদের বিস্মিত করেছে। Dantchenko তাঁর 'My Life in the Russian Theatre' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে একটি শিশু তার মায়ের সঙ্গে 'The Sea Gull' নাটকের অভিনয় দেখতে এসে উদ্যানের দৃশ্যটি দেখে সে বলেছিল—'Mother let's go into the garden for a walk'। এই একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকে আমরা সেই সময়ের বাস্তব রীতির (Realistic Style) থিয়েটার সম্পর্কে এক ধারণা করতে পারি। আলোর উৎপত্তি ও ত্র(মবিকাশের আলোচনায় দৃশ্যকে বাদ দিয়ে আলোচনা অসম্ভব। কারণ আলো, শুধু মঞ্চকে আলোকিত করেনা। আলোর সাথে দৃশ্যের গভীর সংযোগ রয়েছে। বাস্তববাদী নাটকে স্থান, কাল (Period) চরিত্র, সময় (Time) ইত্যাদি প্রকাশে দৃশ্যপট ও আলো সহায়িক ভূমিকা পালন করে। রেনেসাঁসের কাল থেকে মঞ্চালোকের বিকাশে যে প্রচেষ্টা শু(হয়েছিল ত্র(মবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারই পূর্ণতা লাভ হয় রাশিয়ান বাস্তববাদী থিয়েটারে।

মঞ্চালোকের প্রাথমিক শর্ত

আমাদের জীবনযাত্রায় আলো একটি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে দিনে সূর্য ও রাতে বৈদ্যুতিক আলো ও চাঁদ আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বাড়ি তৈরির সময় থেকেই আমরা মাথায় রাখি বাড়িটাকে কেমনভাবে বানালে তার জানলা, দরজা দিয়ে খুব সহজেই সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে ও ঘরটিকে প্রয়োজন অনুসারে আলোকিত করতে পারে। রাতে ঐ সূর্যালোকের কথা মাথায় রেখেই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করে থাকি। আমাদের থিয়েটারেও আলো একটি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বিশেষত আমাদের থিয়েটার অর্থাৎ 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'-এ আলোর ব্যবহার সেই আদিম (Primitive) যুগ থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দর্শক যাতে সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। এর পরবর্তীতে

Candlelight, Chandelier, Gas Light, Lime & Carbon Arc-এর যুগ পেরিয়ে প্রথম লণ্ডনে 1881 সালে (মতান্তরে 1880 বা 1882) Richard D'Oyly তাঁর নতুন থিয়েটার স্যাভয় (Savoy)-তে বৈদ্যুতিক আলোর (Electricity) ব্যবহার করেন। এরপরই মঞ্চে আলোকসম্পাতের গু(ত্ব অনেকটা বেড়ে গেল। কারণ, এই নতুন আলোক-পদ্ধতির নমনীয়তা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সব রকমের বাস্তবধর্মী পরিবেশ ও রস সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলল। ইতিমধ্যে আমরা মঞ্চালোকের মধ্য দিয়ে রঙ-এর ব্যবহার, দৃশ্যপটে কোন আলোকবস্তু তৈরি করা, দৃশ্যান্তরের সময় মঞ্চকে অন্ধকার করা, দৃশ্যপটের পিছনে আলোকবস্তুকে স্থাপন করে অভিনেতাকে অতিরিক্ত(আলোক প্রদান করা ইত্যাদি নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছি। বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগের দ্বারা আমাদের মঞ্চ অনেক বেশি যান্ত্রিক কলাকৌশলে সমৃদ্ধ ও প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি সহজতর হল। দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে উঠল সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। আমরা পেলাম আধুনিক সাইক্লোরামা (Cyclorama)। মঞ্চের পিছনে এই সাইক্লোরামা ব্যবহার করে আলোর সাহায্যে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি বাস্তবমুখী দৃশ্য তৈরি করা সম্ভব হল। মঞ্চের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারের জন্য নানা ধরণের আলোকযন্ত্র (Light Equipment) সৃষ্টি হল। আলোকশিল্পীরা এখন আর আলোর মাধযমে শুধু নিছক বাস্তববোধ সৃষ্টির কথা না ভেবে বিভিন্ন পরী(া-নিরী(ার মধ্যে নিয়োজিত হলেন। এর ফলস্বরূপ আমরা পেলাম আলোক পরিকল্পনার প্রাথমিক পাঁচটি শর্ত (Five Fundamentals of Lighting Design)। যেমন-

i) মঞ্চকে দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে আলোকিত করা (Visibility Illumination)।

ii) বি(াসযোগ্যতা (Plausibility Realistic Effect)।

iii) কম্পোজিশন (Composition)।

iv) মনস্তাত্ত্বিক বি(-ষণ (Mood / Psychological Expression)।

v) বস্তুর মাত্রাবোধ সৃষ্টি করা (Plastic Quality / Dimension)।

i) মঞ্চকে দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে আলোকিত করা (Visibility Illumination) -

থিয়েটার একটি দৃশ্য-শ্রাব্য (Audio-visual) শিল্পমাধ্যম। এর অর্থ এখানে দর্শক প্রথমে দেখে তারপর শোনে বা প্রথমে শোনে তারপর দেখে বা দুটোই একসাথে করে। অতএব দর্শক যাতে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় সেটাই আলোক পরিকল্পনার প্রাথমিক শর্ত। দর্শক যেন সহজেই মঞ্চ, দৃশ্য, অভিনেতা বা সকল নাট্য-ত্রি(য়াই সহজে দেখতে পার তার উপযুক্ত(আলোক ব্যবস্থা করতে হবে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কৃত্রিম আলোর মূল কাজই ছিল সকলনাট্য-ত্রি(য়াকে দর্শকের কাছে তুলে ধরা, যা কিনা আজকের দিনেও অপরিহার্য। আজকের প্রসেনিয়াম মঞ্চকে দর্শকদের দৃষ্টিগোচর করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের আলোকযন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা (Visibility) নির্ভর করে প্রধানত চারটি বিষয়ের উপর -

ক) মঞ্চের পরিমাপ ও আকৃতি।

খ) মঞ্চ ও দর্শক আসনের মধ্যে দূরত্ব।

গ) মঞ্চের উপর প্রোথিত আলোর প্রখরতা (Intensity)।

ঘ) মঞ্চের বা সেটের পশ্চাৎপটের সাথে বৈপরীত্য (Contrast)।

ক) মঞ্চের পরিমাপ ও আকৃতি সাধারণভাবে যে কোন মঞ্চকে উপযুক্ত(ভাবে আলোকিত করে তোলার জন্য প্রথমেই যে বিষয়টির উপর আমরা নজর দিয়ে থাকি তা হল মঞ্চের পরিমাপ ও আকৃতি (Size & Shape)। অর্থাৎ কোন একটি নাটক যখন বর্গাকার (30′×30′) মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে, তাতে যে পরিমাণ আলোর প্রয়োজন ঐ নাটকটি যখন অন্য কোন আয়তকার (50′× 40′) মঞ্চে অভিনীত হবে তাতে আগের তুলনায় অনেক বেশি আলোর প্রয়োজন হবে। সাধারণভাবে আলোক পরিকল্পনার সময় সমগ্র মঞ্চটিকে আমরা (10′×10′) বর্গ(ত্র অনুসারে ভাগ করে নেই। অর্থাৎ (30′×30′) মঞ্চের ভাগ হবে নয়টি বা (50′×40′) মঞ্চের ভাগ হবে কুড়িটি। এই ভাগের ফলে সহজেই মঞ্চ পরিকল্পক কতখানি অঞ্চল বা কটি (10′×10′) বর্গ(ত্র ব্যবহার করেছেন সেই আনুপাতিক হারে কতগুলি আলোকযন্ত্রের প্রয়োজন তা মঞ্চে যাবার আগেই হিসেব করে নিতে পারবেন।

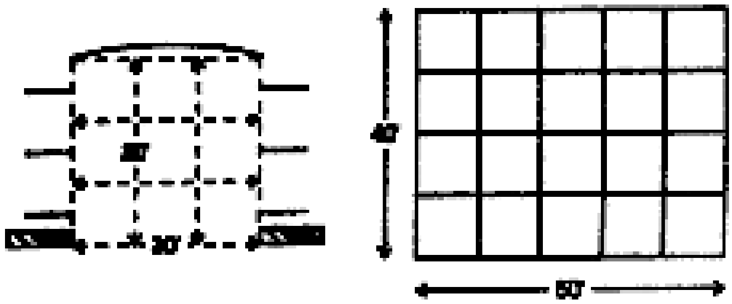

সাধারণভাবে একটি বর্গ(ত্রের জন্য স্বাভাবিক আলো (General Light) করতে দুই ধরণের Angle of light ব্যবহৃত হয়-

a) Horizontal Angle

b) Vertical Angle

a) Horizontal Angle : ভূমিচিত্র (Ground Plan) অনুসারে অভিনেতার সমান্তরালে একটি horizontal line নিতে হবে। এবার অভিনেতাকে ত্রিভুজের শীর্ষকোণ ধরে নিয়ে ঐ horizontal line-এর দুই প্রান্ত থেকে 45^0 angle-এ আলো ফেললে অভিনেতার ডানে ও বামে দুটি 45^0 কোণ তৈরি হবে। একেই horizontal angle বলে।

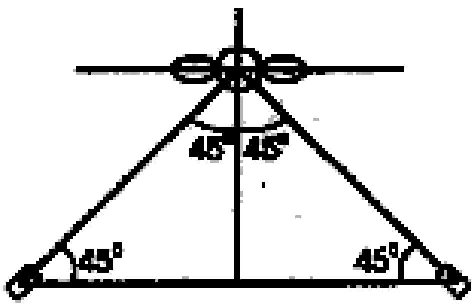

Horizontal Angle

b) Vertical Angle : সাইড এলিভেশন (Side Elevation) অনুসারে (অর্থাৎ দুপাশের wings থেকে সরাসরি তাকালে) অভিনেতার সামনের ও পিছনের উপর থেকে যে 45^0 কোণ সৃষ্টি হয় তাকে vertical angle বলে।

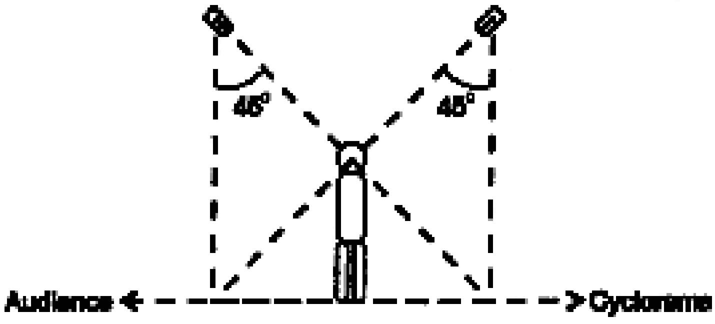

Vertical Angle

আমরা সাধারণভাবে মঞ্চে এক একটি (10’ x 10’) বর্গ(ে ত্রের জন্য অভিনেতার সামনে থেকে দুটি horizontal angle-এর আলো ও অভিনেতার পিছন থেকে একটি vertical angle-এর আলো দিয়ে থাকি। এই সূত্র অনুসারে যত বড় বা ছোট মঞ্চই হোক না কেন তাতে কত আলোকবাতির প্রয়োজন তার হিসাব সহজেই করে ফেলা যায়।

খ) মঞ্চ ও দর্শক আসনের মধ্যে দূরত্ব যে কোন মঞ্চের আকার অনুসারে তার দর্শক আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন ছোট মঞ্চের দর্শক আসন সংখ্যা অপে(াকৃত বড় মঞ্চের তুলনায় কম হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি একটি (30′×30′) মঞ্চের Apron Stage থেকে দর্শক আসনের প্রথম সারির দূরত্ব 5 ফুট ও কোন শেষ সারির দূরত্ব 100 ফুট হয়ে থাকে, তবে (50′×40′) মঞ্চের Apron Stage থেকে প্রথম সারির দূরত্ব 8 ফুট ও শেষ সারির দূরত্ব 250 ফুট হবে। সুতরাং একই নাটক এই দুটি stage-এ অভিনীত হলে অপে(াকৃত বড় stage-এ বেশি অলোর প্রয়োজন হবে।

গ) মঞ্চের উপর প্রোথিত আলোর প্রখরতা (Intensity) যে কোন মঞ্চের সাইড এলিভেশন থেকে আমরা মাপতে পারি মঞ্চে অবস্থিত আলোকযন্ত্রটি ভূমি থেকে দ্রুত কত উপরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ একটি ছোট মঞ্চের opening-এর উচ্চতা (15′ - 18′) হলে সেখানে একটি 500w pc Spot Light ব্যবহার করলে যে প্রখরতা (Intensity) পাওয়া যাবে একটি বড় মঞ্চের (ে ত্রে (20′ - 25′) উচ্চতা থেকে পতিত 500w pc Spot Light-এর প্রখরতা (Intensity) তুলনায় অনেক কম হবে। সুতরাং ছোট মঞ্চের ঐ প্রখরতা (Intensity)-কে বড় মঞ্চে পেতে গেলে আলোবাতির ওয়াটেজ বাড়ানো প্রয়োজন।

ঘ) মঞ্চের বা সেটের পশ্চাৎপটের সাথে বৈপরীত্য (Contrast) মঞ্চ, সেট বা অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রয়োজন মত আলোকিত করে তোলার (ে ত্রে বস্তু বা ব্যক্তি(র প্রতিফলন ও পরিশোষণ (মতার প্রতি নজর দিতে হয়। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি(র প্রতিফলন (মতা বেশি, তাদের (ে ত্রে আলোর পরিমাণ কিছুটা কম হলেও চলতে পারে। কিন্তু যে সকল (ে ত্রে প্রতিফলন অপে(া পরিশোষণ বেশি, সেই সকল (ে ত্রে আলোর পরিমাণ অধিক হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চে সাধারণভাবে আলোকিত করার সময় আলোর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে বৈপরীত্য (Contrast)

সৃষ্টি করতে হয়। এই বৈপরীত্য নানা ‌(ে ত্রে তৈরি করা যেতে পারে, যেমন বলয়পটের (Cyclorama) সঙ্গে অভিনয় ‌(ে ত্রের (Acting Area), দৃশ্যের সাথে অভিনয় ‌(ে ত্রের, দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ইত্যাদি। মঞ্চকে আলোকিত করতে রঙ একটি বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। অর্থাৎ সাদা, হলুদ প্রভৃতি অধিক উজ্জ্বল রঙের বস্তুকে আলোকিত করতে সামান্য আলোর প্রয়োজন। কিন্তু যে কোন গাঢ় রঙ (নীল, সবুজ প্রভৃতি) -এর বস্তুর ‌(ে ত্রে অধিক আলোর প্রয়োজন হয়। মঞ্চের পশ্চাৎপটে যদি কোন গাঢ় রঙ ব্যবহার করা হয় এবং সেই রঙই চরিত্রের পোষাকে ব্যবহার করা হয়, সেই ‌(ে ত্রে চরিত্রের উপর অপে(াকৃত বেশি আলো ব্যবহার না করলে চরিত্ররা পশ্চাৎপটের সাথে মিশে যাবে বা হারিয়ে যাবে।

সার্বিকভাবে মঞ্চকে সঠিকভাবে আলোকিত করা মানে ফ্লাড (Flood) লাইটের মধ্যে দিয়ে মঞ্চে আলোর বন্যা বইয়ে দিলেই যে তা সুন্দর হবে, তা নয়। আলোকের মাধ্যমে মঞ্চের সকল নাট্য-ত্রি(য়া দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হবে, তবে তা একেবারেই নাটকের প্রয়োজন অনুসারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে Macbeth নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটিতে বলা হয়েছে— "An open place. Thunder and lightening. Enter three witches." বজ্র ও বিদ্যুৎ - সুতরাং ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে আকাশে প্রচুর মেঘ রয়েছে। ডাকিনীদের আবির্ভাব - সেই হেতু রাত হওয়াটাও স্বাভাবিক। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের আলোর প্রখরতা কি হবে? অর্থাৎ কিনা আমাদের এমন আলোর প্রখরতার পরিমাপ নির্ধারণ করতে হবে যাতে কিনা একই সাথে সেটা দেখে মনে হয় গভীর রাতে, বজ্র-বিদ্যুৎসহ মেঘ। সমাহিত, অথচ আবার সমগ্র দৃশ্যটি ভালোভাবে দেখাও যাবে। এই ‌(ে ত্রে আমরা সাধারণভাবে গাঢ় নীল রঙের ফিল্টার (Colour Paper) আলোকবাতির মধ্যে ব্যবহার করি। যার ফলে আলোকবাতির প্রখরতা (Intensity) কমে গিয়ে দর্শকমনে এক গভীর রাতের আভাস নিয়ে আসে এবং সকল নাট্য-ত্রি(য়া দেখতে সাহায্য করে।

ii) বি(্বাসযোগ্যতা (Plausibility/Realistic Effect)

যে কোন নাটকেরই বাস্তবধনর্মীতা নির্মাণে আলো একটি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোর দ্বারা বাস্তবের মায়া (Illusion) সৃষ্টি করা হয়। সর্বোপরি বাস্তবধর্মী নাট্য-উপস্থাপনার মূল কথাই হল বাস্তবের অনুকরণ বা অনুসরণ (Imitation)। বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কার ও মঞ্চে তার ব্যবহারের অনেক আগে থেকেই এই প্রচেষ্টা দেখা গেছে। মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর আসার পর বৈপ্-বিক পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুন নতুন আলোকযন্ত্র ও রঙের ব্যবহারে নাট্য-উপস্থাপনার ‌(ে ত্রে দর্শকদের মধ্যে বাস্তবের বি(্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা অনেকখানি সম্ভব হল।

যে কোন নাট্যরীতির নাট্য-ত্রি(য়ার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হল স্থান ও কাল নির্দেশ। নাট্য-ত্রি(য়াটি কোন স্থানে ও কোন কালে সংঘটিত হচ্ছে দর্শকমনে তার সুনির্দিষ্ট ছাপ ফেলতে হবে। যেমন নাটকটি কোন স্থানে, অর্থাৎ কলকাতায় না মিশরে না তিব্বতে সেই অনুসারে মঞ্চে ব্যবহৃত আলোকবাতিও যেমন বদলে যায় তেমনই বদলে যায় তার গুণগত মান। নাটকটি একই স্থানে থেকে বিভিন্ন কাল বা যুগের কথা বলা যেতে পারে এবং সেই অনুসারে আলোকবাতিও বদলে যাবে। মঞ্চে প্রধানত দুইভাবে কালকে নির্ধারণ করা হয়। যেমন দিনের বা রাতের কাল এবং যুগের কাল। যুগের কাল পোশাক-পরিচ্ছদ, আসববপত্র, আলোকবাতির ধরণের মধ্যে প্রকাশ ঘটে আর দিনের বা রাতের কাল কেবলমাত্র আলোকবাতির আলোকের দ্বারা আমরা মঞ্চে সৃষ্টি করি। আমরা

নজর দিয়ে থাকি দৃশ্যটি ঘরের মধ্যে না উন্মুক্ত(পরিবেশে ঘটছে তা রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করি। এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা দর্শকমনে একটা নাট্য-ত্রি(য়ার বি(্বাসযোগ্যতা তৈরি করি।

iii) কম্পোজিশন (Composition)

নাটককে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনে বা বিভিন্ন চরিত্রের গু(ত্ব অনুসারে আমরা কম্পোজিশন বা মঞ্চ-চিত্র রচনা করি, এবং প্রায় প্রতিটি (ে ত্রেই আমরা চেষ্টা করে থাকি যাতে তৈরি হওয়া মঞ্চ-চিত্রটি সুন্দর হয় ও মঞ্চমায়া সৃষ্টিতে স(ম হয়। নাটকে আমরা কম্পোজিশন করি তার কারণ মূলত ঐ দৃশ্যে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুর মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু জিনিস, চরিত্র বা ঘটনাকে জোর (Emphasis) দিয়ে দেখাতে চাই আর ঐ দৃশ্যের অন্য অনেক কিছুকেই দেখাতে চাই না। আমাদের বাস্তব জীবনেও প্রতিনিয়ত এইরকমই ঘটে চলেছে। অর্থাৎ আমরা ল(্য করি দিনের যে কোন সময় আমাদের ঘরের প্রতিটি জায়গা সমানভাবে আলোকিত হয় না, বা প্রকৃতির মধ্যেও এই আলো-ছায়ার খেলা সবসময়ই বিরাজমান। এই সমগ্র প্রত্রি(য়াতে আলোর ভূমিকা খুবই গু(ত্বপূর্ণ। কারণ আলোর মাধ্যমে আমরা সব কিছুকে দেখতে পাই। এখন ধরা যাক আধুনিক সুসজ্জিত একটি ড্রয়িং(ম। পিছনের একটি বড় জানলা দিয়ে রাতের আকাশে কালো জমাট মেঘরাশির মধ্যে মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝলক দেখা যায়। ঘরের একপাশে স্ট্যান্ড-লাইট জ্বলছে-অপে(াকৃত জোরালো সাদা আলো কিন্তু তা বিশেষ খানিকটা অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। স্ট্যান্ড-লাইটের অন্যদিকে ফায়ার-পে-সে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। এই দৃশ্যটি প্রকাশ করার জন্য আমরা যদি ফ্লাড (Flood) লাইট ব্যবহার করি, তাহলে দৃশ্যটির মধ্যে উপস্থিত কাল, পরিবেশ সৃষ্টিকারী উপাদান ও মনোমুগ্ধকর চিত্ররূপ সবটাই বিনষ্ট হবে। সর্বোপরি কোনরূপ মঞ্চমায়া (Illusion) তৈরি হবে না। কারণ বাস্তবিক (ে ত্রে দৃশ্যটির মধ্যে ভীষণভাবে লুকিয়ে আছে আলো-ছায়ার খেলা বা কোথাও প্রচুর আলো আবার কোথাও প্রচুর অন্ধকার। এই আলো-ছায়ার খেলা আমরা ভীষণভাবে দেখতে পাই চিত্রশিল্পে। আমাদের আলোক পরিকল্পকদের মঞ্চে আলো করার (ে ত্রে সেই চিত্রশিল্পীদের মতো হয়ে উঠতে হয়।

iv) মনস্তাত্ত্বিক বি(-ষণ (Mood/Psychological Expression)

আলোর মাধ্যমে চরিত্রের তথা নাটকের মনস্তাত্ত্বিক বি(-ষণ বা মুড (Mood)-এর প্রকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা কোনরূপ আধুনিক থিয়েটারের অবদান নয়। আধুনিক থিয়েটারে এর অগ্রগতি ঘটেছে বটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত রেনেসাঁস যুগে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালীতে Serlio যেদিন প্রথম মঞ্চে রঙিন আলো ব্যবহারের সূচনা করেন, সেই দিন থেকেই মঞ্চে অভিনীত নাটকের মুড প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন আলোকযন্ত্র, রঙের মাধ্যম ইত্যাদি মানুষের ত্র(মবর্ধমান শৈল্পিক চাহিদার বিকাশ ও পরিপূর্ণতা ঘটতে থাকে।

আমাদের জীবনে রঙের প্রভাব খুবই গভীর। সকল রঙের বিশেষ কতগুলি গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে যা মানুষের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের মনের ভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে রঙ। এর থেকেই তৈরি হয়েছে রঙের 'আবেগ মূল্য' ও 'সাংকেতিক মূল্য'। মঞ্চে চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশের (ে ত্রে মূলত এই সাংকেতিক মূল্যকেই ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোন নাটকের হালকা হাসির অংশবিশেষকে আলোকিত করার সময় আমরা উজ্জ্বল আলো (Bright Light)

ব্যবহার করে থাকি। এর কারণ, এই জাতীয় ঘটনায় চরিত্রের কিছু গভীরতা থাকলেও তেমন কোন জটিলতা থাকে না। সুতরাং আলোর মধ্যে দিয়েও আলো-ছায়া তৈরি করে কোনরূপ জটিলতার প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না। আবার কোন নাট্য-ঘটনায় যখন প্রচণ্ড টেনশন বা চরিত্রের মধ্যে দোলাচলের সৃষ্টি হয় তখন আমরা মঞ্চময় আলো-ছায়ার প্রকাশ ঘটাই। সেটা কখনো জানলার গ্রীল-এর ছায়া বা জাফরীর ছায়া ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। এই আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে কনট্রাস্ট (Contrast) বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে দর্শক কিছু দেখতে পেয়ে বা কিছু না দেখতে পেয়ে, তার মনের মধ্যে ঐ নাটকে বর্ণিত টেনশনটি সঞ্চারিত হয়। এইভাবে আলো শুধুমাত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেই নয়, নাটকের ঘটনা, চরিত্র বা নাট্য-ত্রি(য়ার সঙ্গে দর্শকমনের একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।

v) বস্তুর মাত্রাবোধ সৃষ্টি করা (Plastic Quality / Dimension) -

আমাদের চোখের সামনে যা কিছুই দেখা যায়, তার প্রায় সবই ত্রিমাত্রিক হয়ে থাকে। ডাইমেনশন (Dimension) অর্থাৎ 'মাত্রা' হল যে কোন বস্তু কতটা জাগয়া বা স্থান অধিকার করে রেখেছে তার পরিমাপ। বস্তুর পরিমাপ নির্ধারিত হয় বস্তুটির দৈর্ঘ্য (Length), প্রস্থ (Width) ও বেধ/গভীরতা (Depth or Thickness)-এর পরিমাপের দ্বারা। মঞ্চে আমরা দ্বিমাত্রিক (Two-Dimensional) ও ত্রিমাত্রিক (Three-Dimensional) দুই ধরণের বস্তুকেই ব্যবহার করে থাকি। মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যপট যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থাকে কিন্তু বেধ থাকে না, তথাপি দৃশ্য অঙ্কন ও আলোর দ্বারা ঐ দ্বিমাত্রিক চিত্রকে আমরা ত্রিমাত্রিকতার মায়া সৃষ্টি করি। এছাড়াও বহু জিনিস আমরা ব্যবহার করি যা ত্রিমাত্রিক। সর্বোপরি আমাদের প্রসেনিয়াম মঞ্চকে দর্শক আসন থেকে একটি ফ্রেম করা চিত্রের মত দেখতে লাগে, খানিকটা দ্বিমাত্রিক চিত্রের মত, কিন্তু বাস্তবিক (ে ত্রে আমাদের মঞ্চটি ভীষণভাবে ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ তিনই থাকে। আমরা মঞ্চে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, বস্তুসামগ্রী ও চরিত্র-অভিনেতার ত্রিমাত্রিকতার উপর যেমন জোর দিয়ে থাকি তেমনই মঞ্চের যে ত্রিমাত্রিকতা তার উপরেও জোর দিয়ে থাকি। আলোর প্রখরতার তারতম্য ঘটিয়ে,রঙের বৈপরীত্য এনে ও আলোকবাতিকে বিভিন্ন angle থেকে ব্যবহার করে মঞ্চে অবস্থিত বস্তু, চরিত্র-অভিনেতা ও মঞ্চের ত্রিমাত্রিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকি। অর্থাৎ কিনা দৃশ্যপটে যে পরিমাণ আলো আছে অভিনেতার উপর তার থেকে বেশি আলো প্রয়োগ করে অভিনেতাকে দৃশ্যপট থেকে আলাদা করে প্রকাশ করি। আবার কখনও অভিনেতা বা সমগ্র মঞ্চের একপাশ থেকে নীল আলো, অন্যান্য পাশ থেকে কমলা আলো ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে রঙের বৈপরীত্য ঘটিয়ে ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টি করে থাকি। মঞ্চের উপর যে কোন বস্তুকে সাধারণভাবে দেখাবার কারণে horizontal angle থেকে আলো করা হয়। এর ফলস্বরূপ বস্তু বা অভিনেতার উপর সৃষ্ট ছায়ার পরিমাণ কম হয়, তখন ঐ বস্তু বা অভিনেতার ত্রিমাত্রিকতা তৈরি করার জন্য vertical angle ব্যবহার করা হয়। Horizontal angle-এর মধ্যে দিয়ে বস্তু বা অভিনেতার সম্মুখভাগ প্রকাশিত হয়। আর vertical angle-এর মধ্যে দিয়ে বস্তু বা অভিনেতার পশ্চাৎভাগ প্রকাশিত হয়ে ত্রিমাত্রিকতার প্রকাশ ঘটায়। এছাড়াও আমরা side বা diagonal light ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বস্তুর ত্রিমাত্রিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকি।

ধ্বনি (Sound)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর শু(তে লন্ডনের গোব থিয়েটার আগুন লেগে পুড়ে যায়, তা বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়। এই আগুনের উৎস ছিল একটি কামানের গোলা। যা গোব থিয়েটারের ছাদে অবস্থিত মেশিন-(ম থেকে ছোঁড়া হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ধ্বনি সৃষ্টি। কামানের গোলা ফাটিয়ে তোপধ্বনি সৃষ্টি—নিঃসন্দেহে একটি চরমতম উদাহরণ। তবে ঐ মেশিন (মের অস্তিত্ব এবং তখনকার বিভিন্ন নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি মধ্যযুগীয় রঙ্গালয়গুলিতে ধ্বনি সৃষ্টির জন্য অনেক কৃত্রিম উপায় ব্যবহার করা হয়েছে। ধামসা বা দামামা জাতীয় বাজনার সাহায্যে, কিংবা অসম চাকাযুক্ত(কাঠের গাড়ী গড়িয়ে মেঘের গর্জনের শব্দ তৈরির কথাও আমরা জানতে পারি।

ওইসব ঐতিহাসিক তত্ব থেকে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে নাট্য উপস্থাপনা ধীরে ধীরে বাস্তবধর্মীতার দিকে এগিয়ে গেছে। এই বাস্তবধর্মীতার প্রয়োজনেই প্রথমে এসেছে দৃশ্যপট, তারপর কৃত্রিম ধ্বনি এবং সবশেষে এসেছে আলোক সম্পাত।

মঞ্চালোক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুতের ব্যবহার সাথে সাথে নতুন ধরনের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি সৃষ্টি ও প্র(পনের পদ্ধতিও পাল্টে গেল। আজ আমরা 'লাইভ সাউণ্ড'-এর ব্যবহার খুব কম করি। বিভিন্ন প্রকাশের প্রয়োজনীয় ধ্বনি ভাণ্ডারে মজুত রাখা আছে, আর দরকারের সময় সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ধ্বনি নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে মৌলিকত্বের দিক থেকে এখনও কৃত্রিম ধ্বনি সৃষ্টির চাহিদা ও শিল্পগুন অনেকটা সমাদৃত হয়ে থাকে।

শব্দ ও মানুষের কানে তার অনুভূতি—এই দুইয়ের মধ্যে এক পার্থক্য আছে। জনমানবশূন্য পার্বত্য প্রদেশে পাহারের ধ্বস নামলে শব্দ ওঠে কিনা, আজও একটি তর্কের বিষয়। আমাদের কানে ধরা পড়ে, এমনই কোনও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বি(াভ কিংবা চাপের পরিবর্তন অথবা স্পন্দনকে আমরা শব্দ অথবা ধ্বনি নামে অভিহিত করি। সাধারণত এই শব্দ বায়ুস্তর মারফৎ আমাদের কানে পৌঁছায়। ধ্বনির প্রসারণের জন্য সব সময়ই কোন না কোন মাধ্যমের প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে জাড্য ও স্থিতিস্থাপকতা উভয় গুন বর্তমান। শূণ্যের মাধ্যমে ধ্বনির বিস্তরণ সম্ভব নয়। অতএব সংঙ্গারূপে আমরা বলতে পারি, কোনও কম্পনশীল বস্তু থেকে স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ অনুভূতি আমাদের কানে প্রবেশ করে, তাকেই আমরা শব্দ বা ধ্বনি বলি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম কর্ণ বা কানের কাজ মস্তিষ্কের শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। মস্তিষ্কের স্নায়ু তন্ত্রীগুলির অন্তিম প্রান্তে অনুভূতিপ্রবণ ও অতিসূক্ষ্ম কোষাণু জড়িত আছে যার দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রেরিত উত্তেজনা গৃহীত হয়।

শব্দের উৎপত্তিস্থল কোন না কোনও স্পন্দিত বস্তু। সেতার বা তানপুরার তারে আঘাত করলে, শব্দের উৎসমুখের স্পন্দন আমরা দেখতে পাই। আবার বেতার যন্ত্রের স্পিকারে স্পন্দন এত মৃদু যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না(কিন্তু স্পর্শের দ্বারা অনুভব করি।

বাতাস পরিবেষ্টিত অবস্থায় যখন কোনো বস্তু কাঁপতে থাকে, ওই সময় ওই কম্পনের ফলে বস্তুর শরীর বাইরের দিকে এগিয়ে যায় এবং সংলগ্ন বায়ুস্তরে ধাক্কা খাওয়ার ফলে, বায়ুস্তর সংকুচিত হয়। যার

পরিণতিতে ওই স্তরের ঘনত্ব ও উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে ঘনীভবন বা ‘কম্‌প্রেসন’ বলা হয়। এই অঞ্চলে অপে(াকৃত নিম্নচাপ থাকার ফলে, উর্দ্ধচাপযুক্ত((ে ত্রের অনুগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ওই অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায় এবং চাপবৃদ্ধি ঘটায়। একইভাবে নতুন তৈরি ঘনীভূত স্থানগুলি থেকে পরবর্তী নিম্নচাপ অঞ্চল সমূহে অনুপ্রবাহ ঘটতে থাকে। কম্পনের ফলে বস্তুর শরীর যখন ভিতরের দিকে পিছিয়ে আসে, সংলগ্ন বায়ুস্তর থেকে হঠাৎ চাপ অপসারিত হওয়ার ফলে তনীভবন বা ‘রেয়ারফ্যাকসান’ ঘটে। এই তনীস্থানগুলি আগের তৈরি হওয়া ঘনীস্থানগুলিকে ত্র(মান্বয়ে এবং পর্যায়ত্র(মে অনুসরন করে চলে একই দিকে, সমান গতিতে। ঘনীস্থান ও তনীস্থানের এই জাতীয় ত্র(মাগত প্রবাহের নাম দেওয়া হয়েছে ধ্বনি তরঙ্গ। যে মাধ্যমে ধ্বনি বা শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তার ঘনত্ব ও সঙ্কোচনশীলতার উপরে প্রবাহের গতি নির্ভর করে। সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি ঘনত্ব ও সঙ্কোচনশীলতা যত কম হবে, তরঙ্গ প্রবাহের গতি তত দ্রুত হবে।

যে কোন তরঙ্গের মাঝে কোনও দুটি পাশাপাশি (ে ত্রে যেখানে বস্তু কনিকাদের অবস্থান সমভাবাপন্ন, সেই দুই বিন্দুর ব্যবধানকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। সাধারণত এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ‘ওয়েভ লেংথ’-কে প্রকাশ করার জন্য রোমান হরফ ল্যামডা (λ) চিহ্(ব্যবহার হয়। পুকুরের জলে একটি ঢিল ফেললে যে ধরনের ঐককেন্দ্রিক বৃত্তে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, বাতাসের বুকে সৃষ্ট তরঙ্গের চেহারাও হুবহু সেই রকমের।

ঘনীভবনের ফলে স্থানচ্যুত বস্তুকনা তনীভবনের ফলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে একটি বৃত্ত বা সাইকেল পূর্ণ হয়। এর জন্য যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় পর্যায়কাল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে স্পন্দিত বস্তু যতবার তার এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে আসা পূর্ণ করে, অর্থাৎ যতবার সংলগ্ন (ে ত্রের অনুগুলিকে তাড়না করে, তাকে বলা হয় ধ্বনির কম্পাঙ্ক বা ‘ফ্রিকোয়েন্সি’। এই কম্পাঙ্ক উল্লেখের সময় অবশ্যকীয় সংখ্যার পর সী-পি-এস (সাইকেল্‌স পার সেকেণ্ড) অথবা (~) চিহ্(দিয়ে বোঝানো হয়। আধুনিককালের প্রযুক্তি(বিজ্ঞানে কম্পাঙ্ক মাপার আর একটি নামকরণ হল ‘হার্জ’ যাকে সং(েপে এইচ-জেড বলা হয়। তবে এই ‘সী-পি-এস’ এবং ‘এইচ-জেড’ সংখ্যাগত এবং অর্থগত উভয় দিকেই সমান সমান।

একজন সুস্থ যুবক/যুবতী ২৭ থেকে ২০,০০০ হার্জের মধ্যে ধ্বনি শুনতে স(ম। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতার কম্পাঙ্কের ধ্বনি শোনার (মতা আমাদের কমে আসে। একজন বৃদ্ধের শ্রবণ (মতা ৪০০০ হার্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অত্যন্ত তী(্ ধ্বনি তরঙ্গ ত্র(মাগত কানে আঘাত করলেও শ্রবণশক্তি(নষ্ট হতে পারে। শ্রুতিসীমার বাইরে অর্থাৎ ২০,০০০ হার্জের বেশী কম্পাঙ্ক যুক্ত(তরঙ্গকে ‘শব্দোত্তর তরঙ্গ ’ বা ‘সুপারসনিক ওয়েভ’ বলা হয়।

মানুষের শোনার (মতাকে পরিমাপ করবার জন্য একটি পৃথক একক রূপে আবিষ্কৃত হয়েছে ‘বেল’। ধ্বনি বিজ্ঞানের অন্যতম গবেষক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল-এর নাম থেকেই এই ‘বেল’ পরিমাপের উৎপত্তি। ধ্বনিমাত্রা নির্ধারক যন্ত্র বা সাউণ্ড লেভেল মিটারে এই ‘বেল’ দশাংশ অর্থাৎ ‘ডেসিবেল’-এর সাহায্যে যাবতীয় পরিমাপ ধার্য করা হয়। একটি ছোট হাতের ‘d’ এবং বড় হাতের ‘B’—অর্থাৎ dB প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয় ডেসীবেল বোঝানোর সময়।

ধ্বনির বিস্তরন পথে বিশেষ কোনও দিকের প্রতি লম্বভাবে অবস্থিত একটি একক (েত্রের উপর দিয়ে কোনও একবিন্দু পর্যন্ত ধ্বনি প্রবাহের গতিকে, সেই দিকে সেই বিন্দুতে ধ্বনির তী(তা বা 'ইনটেনসিটি' নামে অভিহিত করা হয়। এই তী(তার পরিমাপ করা হয় বর্গ সেন্টিমিটার প্রতি '–' ওয়াট রূপে।

রঙ্গমঞ্চের ধ্বনি প্রে(াগৃহের দেয়াল, ছাদ, দোতলার সম্মুখভাগে প্রভৃতিতে আবদ্ধ একটি (েত্রের প্রতিটি প্রান্তে আঘাত খাওয়ার ফলে প্রতিফলিত হয়। যত(ণ না দূরত্ব ত্র(মাগত বেড়ে যাওয়ার পরিণতিতে, ধ্বনির তী(তা বা চাপ (য় পেতে পেতে শোনার অযোগ্য হয়ে যায়,তত(ণ এই প্রতিফলনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। আবদ্ধ স্থানে প্রতিধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলে শব্দের এই জাতীয় স্থিতিকে অনুরণন বলে। নাটকের কথোপকথন ও সংগীতের উপর এই অনুরণনের প্রতিত্রি(য়া অনেকখানি। অনুরণন ত্রি(য়াটি সুনিয়ন্ত্রিত হলে তা প্রে(াগৃহের একটি বিশেষ গুন বলে বিবেচিত হয়।

ধ্বনি তরঙ্গ আমাদের পরিবেশের মধ্যে বিশেষ করে ঘরের মধ্যে মজবুত দেয়াল, মেঝে, দরজা জানালা বা ছাদের নীচের ধাক্কা খায়, তখন এই ধ্বনির অনেকখানি অংশ প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে। এই ধ্বনি তরঙ্গ সমতল, অবতল ও উত্তল পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অবতল (েত্রের এই জাতীয় সংহত প্রতিফলনকে নিয়ন্ত্রিত করে, স্থপতিরা প্রে(াগৃহের প্রতিটি প্রয়োজনীয় স্থানে সমান চাপের ধ্বনি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। তেমনি আবার স্থপতিদের সুনিয়ন্ত্রণের ফলে, প্রে(াগৃহের সীমান্ত বিন্দুগুলিতে, উত্তল(েত্রের বিচ্ছুরিত প্রতিফলনের সাহায্য নিয়ে, ধ্বনির তী(তা কমিয়ে দেওয়াও সম্ভব।

আলোর প্রতিসরণ আর ধ্বনির প্রতিসরণ একই নিয়ম অনুসারে সংগঠিত হলেও, আপাতঃ দৃষ্টিতে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। আলোর ন্যায় ধ্বনি তরঙ্গ ও সরলরেখায় গমন করে, কিন্তু ধ্বনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি ক(বহির্গমনের পথ বা প্রতিফলন (েত্রের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট ছোট না হয় তবে এই নিয়ম প্রমাণ করা যায় না। আমাদের বেশীর ভাগ ক(, রন্ধ্র বা প্রতিফলনের (েত্র আয়তনে সাধারণ নিম্নগ্রামে শব্দ তরঙ্গের চেয়ে অনেক ছোট। ফলে জানালা, দরজা, থাম, কড়িবরগা এমনকি দেয়ালের সাধারণ উঁচু নক্সা ও শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটায় যার পরিণতিতে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত শব্দের দিক এবং স্বরগ্রাম বদলে যায়।

কোন ক(ের প্রতিটি অংশে যদি ধ্বনি তরঙ্গের চাপ সমান থাকে, তবে সেই ক(ধ্বনির সুসম প্রসারণ বা 'ডিফিউসান' ঘটেছে বলা হয়। বাস্তবে পরিপূর্ণ সুসম-প্রসারণ ঘটে না এবং এটিও কাম্য নয়। পরিপূর্ণ সুসম-প্রসারণের ফলে, শ্রোতার প(প্রতিটি ধ্বনির উৎসের দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধ্বনির এই সুসম প্রসারণ শ্রোতা আবার খুবই পছন্দ করে। ধ্বনির সুসম প্রসারণ বৃদ্ধি করা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর।

১) ক(ের ভিতরের বস্তুগুলি যদি এলোমেলো ভাবে রাখা থাকে, তবে ধ্বনি তরঙ্গের প্রবাহ একমুখী না হয়ে সুসম-প্রসারণ ঘটে।

২) দেওয়ালের গাত্র যদি সমান ও মসৃণ না হয়ে ধ্বনি তরঙ্গ প্রতিফলন ও পরিশোষণের মাধ্যমে সুসম প্রসারিত হতে পারে।

প্রে(াগৃহে ধ্বনির সুসম-প্রসারণ বাড়ানোর আর একটি উপায় হল ক(ের মধ্যে 'ধ্বনিশোষক' (Sound absorber) বস্তুর বেশী ব্যবহার করা। বিশেষ করে ওই জাতীয় বস্তু যতটা সম্ভব এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে রাখা।

ধ্বনির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সুষম-প্রসারণের আবশ্যকতা ও বিস্তরণের প্রাকৃতিক নিয়মগুলির পরিপ্রে(িতে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। প্রে(াগৃহ, মুক্ত(অঙ্গন বা বৃহৎ ক(ের মধ্যেই হোক ধ্বনি প্রসারণের সুব্যবস্থা না করতে পারলে, সকল দর্শক সমান ভাবে নাটক উপভোগ করতে পারবে না।

প্রাচ্য দেশীয় এক জনৈক অধ্যাপকের অনুরণন সম্পর্কে একটি উক্তি(রীতিমতো গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর ক্লাস (মের প্রচণ্ড অনুরণন (মতার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, পরের দিন পড়াতে এসে তিনি আগের দিনের শেষ কথাগুলি শুনতে পান। ফলে সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা শু(করার জন্য তার প(বিশেষ সুবিধাই হয়। এই উক্তি(টি হয়তো পরিহাসের বিষয়। তবে ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুরণন ধ্বনির গতি প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। বিংশ শতাব্দীতেই এর বৈজ্ঞানিক প্রতিকার উদ্ভব হয়েছে।

প্রাচীনকালের গ্রীক নাট্যমঞ্চ বিশেষভাবে বাছাই করা পাহাড়ের ঢালে তৈরি করা হয়েছিল। দর্শকরা পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে বা বসে এই নৃত্য-গীতমূলক অভিনয় দেখতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তাকার অভিনয় স্থলটির নাম হয় অর্কেষ্ট্রা, তার দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা ঘিরে তৈরি হয় দর্শক বসবার আসন, এবং পরবর্তী যুগে অর্কেষ্ট্রার পিছন দিকে স্কীন নামে এক উঁচু বেদী যোগ হয়। কালত্র(মে তা এক বড় ক(তৈরি হয়ে যায়। এই সময় ধ্বনির ব্যবহার মুক্ত(বাতাসে ধ্বনির বিস্তরণের উপরেই নির্ভর ছিল। রোমান নাট্যমঞ্চে অর্কেষ্ট্রা স্কীন এর সাথে অর্ধাকৃতিতে যুক্ত(হয়।

রোমান নাট্যমঞ্চ শহরের বাইরে মূলত সমতল (েত্রে তৈরি হত। অর্কেষ্ট্রা অর্দ্ধবৃত্ত হয়ে স্কীন অনেক পরিণত হয়ে বেশ উঁচু মঞ্চ বা বেদীতে প্রকাশ পেল। এই স্কীনে তৈরি হল প্রতিফলক প্রাচীর এবং মোট পাঁচটি প্রবেশ পথ তৈরি হল— দুটি দুইপাশে আর তিনটি পিছনের দিকে। এই সময়েই অনুভূত হয় মঞ্চে অভিনেতার কণ্ঠস্বর প্র(েপণের জন্য প্রতিফলকের প্রয়োজন আছে। গ্রীস ও রোমের নাট্য প্রযোজকরা বুঝেছিলেন সাধারণ প্রে(াগৃহে মানুষের কণ্ঠস্বর সমস্ত দর্শকদের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনেক (েত্রে অভিনেতারা যেসব মুখোস ব্যবহার করতেন তা শুধুমাত্র মুখভঙ্গী বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়, ওই মুখোসগুলিতে চোঙের মতো একটা জিনিস ব্যবহার করা হত, যেটা আসলে ধ্বনিবর্দ্ধনের কাজ করত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতে অলিম্পিয়ান একাডেমিতে প্রায় রোমান শিল্পের অনুকরণে তৈরি মঞ্চে ছাদ ও দেয়াল যুক্ত(হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই দৃশ্য-পটের ব্যবহারের ফলে ধ্বনির প্রতিফলন উন্নতি

লাভ করল। এর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মঞ্চটি যেন একটি বড় দরজার পিছনে নিয়ে যাওয়া হল—যা কিনা আজকের মঞ্চমুখ। দর্শক বসবার বৃত্তাকার ব্যবস্থার কুফলও বুঝতে পারা গেল— যার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম ইংরাজী অ(র 'U'-এর অনুরূপ আসন ব্যবস্থা। এর সাথে তৈরি হল একাধিক ঝুল বারান্দা। এই ঝুল বারান্দার ফলে দর্শকরা মঞ্চের অনেক কাছাকাছি বসবার সুযোগ পেলেন। এই ব্যবস্থা আরও একটি লাভ হল দর্শকপূর্ণ আসনগুলি দেওয়ালের প্রতিফলন(ত্র ঢেকে রাখার ফলে এই বিশাল আকৃতির ক(র প্রচণ্ড অনুরণন অনেকটা কমে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রযোজক ও মঞ্চের মালিকেরা এই ধ্বনি বিজ্ঞানকে আমল দেননি বা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা ঝুলবারান্দার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। এর সাথে সাথে সিমেন্টর দৃষ্টি সুখকর চকচকে কঠিন দেওয়ালের ব্যবহারের ফলে ধ্বনি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল।

বিশং শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন তাঁদের ধ্বনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার ফল নিয়ে। সাধারণভাবে তাঁরা বাসস্থান, বিদ্যালয়, মঞ্চ, উপাসনা ক(প্রভৃতির ধ্বনি প্র(পন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। আজকের আধুনিক প্রে(াগৃহ নির্মাণের সময় প্রতিটি স্তরে স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের যৌথ পরিশ্রমেই বিষয়টির সুফল পাওয়া যাবে। যে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নরূপ—

১) তুলনামূলক শান্ত পরিবেশকে রঙ্গমঞ্চের স্থান রূপ নির্বাচন করা প্রয়োজন। নির্বাচিত স্থানটি যানবাহন বহুল বড় রাস্তা উপর না হলেই ভালো হয়।

২) দিনের বেলা রঙ্গমঞ্চের আশেপাশে কি কি ধরণের অযাচিত শব্দ তৈরি হচ্ছে, তার তালিকা প্রস্তুত করে, তার পরিশোষনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) ক(র আয়তন নির্ধারণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আর এই আয়তনের উপর নির্ভর করেই তৈরি হবে দর্শকাসন।

৪) ধ্বনি অন্তরণের ব্যবস্থা মজবুত ও সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার।

৫) অট্টালিকার মধ্যবর্তী বহু শব্দ যথা— লিফট্, এয়্যার কণ্ডিশন মেশিন, জলের পাম্প ও অন্যান্য ক(র রেডিও প্রভৃতি বায়ুস্তর, রন্ধ্রপথ বা ক(াদির কঠিন স্তর মারফত প্রবাহিত হয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৬) প্রতিফলক প্রাচীর ও পরিশোষক, এই দুটির সংযুক্তি(র ব্যবস্থাটি এমন সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত, যাতে তাদের কাজও সঠিক ভাবে হয় ও ক(র ভিতরে সৌন্দর্যবিধানেও সাহায্য করে।

৭) প্রয়োজন হলে, সাউণ্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোককে তার পরিচালনার ভার দিতে হবে।

ধ্বনি তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পরিশোষণ প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত করে প্রে(াগৃহে ধ্বনির সুষম প্রসারণ ব্যবস্থা করবার পরও সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক ৫০,০০০ ঘনফুট আয়তন পর্যন্ত স্থানে পৌঁছাতে পারে। অভ্যাসের দ্বারা অভিনেতার কণ্ঠস্বর খুব শক্তি(শালী হলেও তা ত্র(মাগত ওই একই উচ্চতর

স্তরে শব্দসৃষ্টি করতে পারে না। অন্যদিকে (ুদ্রতর প্রে(াগৃহে যেখানে অবাঞ্ছিত শব্দের সমাগম হয় যা প্রয়োজনীয় ধ্বনি তরঙ্গকে নষ্ট করে দেয়, যারফলে সাধারণ কণ্ঠস্বরের ধ্বনি বিস্তরণে অসমর্থ হয়। এই প্রকার প্রে(াগৃহে যান্ত্রিক উপায়ে ধ্বনি বিবর্ধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রে(াগৃহে সাউণ্ড সিস্টেম তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথাত্র(মে—

১) প্রথম অংশ মাইত্রে(াফোন বা ধ্বনিগ্রাহক। এগুলি প্রতিস্থাপিত করা হয় ধ্বনিসূত্রের নিকটবর্তী স্থানে।

২) দ্বিতীয় অংশ এমপ্‌লি-ফায়ার বা ধ্বনি-বিবর্দ্ধক। এটি সাধারণভাবে প্রে(াগৃহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে— যেটি সাধারণভাবে মঞ্চের পাশে বা মিউজিক পীটে হয়।

৩) তৃতীয় অংশ লাউডস্পীকার বা ধ্বনি প্র(েপক। এইগুলি সাধারণ ভাবে প্রে(াগৃহে রাখা হয় এবং এদের মুখ দর্শকদের দিকে এমনভাবে রাখা থাকে, যার দ্বারা প্র(েপিত ধ্বনিতরঙ্গ পর্যাপ্তভাবে সমগ্র প্রে(াগৃহে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক মাইত্রে(াফোন বিভিন্ন ধ্বনি উৎসের কাছে রাখা যেতে পারে। এই মাইত্রে(াফোনগুলি প্রত্যেকেই একটি মাত্র এমপ্‌লি-ফায়ারের সঙ্গে যুক্ত(থাকবে। এই এমপ্‌লি-ফায়ার দ্বারা বর্ধিত চাপের ধ্বনিতরঙ্গ এক বা একাধিক লাউডস্পীকারের মাধ্যমে প্রে(াগৃহে ছড়ানো হবে। যদি সম্ভব হয়, তবে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি দর্শকের মাঝে স্থাপনা করতে পারলে ভালো হয়। তাহলে নিয়ন্ত্রণকারী অনেক সহজেই তাঁর নিয়ন্ত্রণের ফলাফল সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। যদিও এই ব্যবস্থা প্রচুর ব্যয় সাধ্য। তাই বেশির ভাগ (েত্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক(মঞ্চের পাশে স্থান করা হয়। সে(েত্রে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণকারী অনুষ্ঠান শু(পূর্বে দর্শক আসনে বসে, এই নিয়ন্ত্রিত ধ্বনির গাম্ভীর্য মাত্রা যাচাই করে নেওয়া উচিত। এর সাথে এটাও মনে রাখতে হবে শূন্য প্রে(াগৃহ এবং পূর্ণ প্রে(াগৃহে ধ্বনি বিস্তারণের অনেক তারতম্য ঘটে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অনুষ্ঠান চলাকালীন এই সমস্যাটি অনুধাবন করে ক্রটি সংশোধন করা সম্ভব। অনেক সময় অভিনেতারা প্র(েপিত শব্দ শোনার প্রয়োজন অনুভব করেন। নাচের বাজনা, বা নাটকের বিভিন্ন শব্দ ইত্যাদি। এই (েত্রে মঞ্চে নিম্ন কম্পাঙ্কের একমুখী প্র(েপক ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই নিম্ন কম্পাঙ্কের সাউণ্ড বক্স থেকে সরাসরি বা প্রতিফলিত ধ্বনি তরঙ্গ মাইত্রে(াফোনে ধরা যাতে না পড়ে, তার দিকে ল(্য রাখতে হবে।

অভিনয়ের সময় নাটকের পরিবেশকে বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য নানাবিধ আনুষঙ্গিক শব্দের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও সংলাপের ভাব ও রস অনুসারে সঙ্গীত বা আবহসঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এমন কিছু ধ্বনিসূত্র থেকে যদি শব্দটি উৎপন্ন না হয়ে অন্য কোনো যান্ত্রিক কৌশলে সেই শব্দটি উৎপন্ন করে দর্শককে শোনানো হয়, তবে তাকে আমরা কৃত্রিম শব্দ বলে অভিহিত করতে পারি। এই কৃত্রিম শব্দগুলির উৎস মঞ্চের উপরে থাকে না বা স্বাভাবিক উপায়ে দৃষ্টিগোচর ধ্বনিসূত্র থেকে পর্যাপ্ত শব্দও উৎপন্ন সম্ভব হয় না অথবা ধ্বনিসূত্র মঞ্চে আছে ও পর্যাপ্ত শব্দ উৎপন্নেও স(ম কিন্তু তা যদি সঠিক সময়ে ধ্বনি উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। সবশেষে পরিবেশ রচনার জন্যও আমরা কৃত্রিম ধ্বনি

ব্যবহার করে থাকি। নেপথ্য থেকে অ(শ্বখুর ধ্বনি, কামানের গর্জন, দরজায় কড়া নাড়া বা কলিংবেল প্রভৃতির শব্দ এই জাতীয় শব্দগুলি একদম আসল শব্দ সৃষ্টি করে দর্শকদের শোনানো অসম্ভব।

প্রাচীন যুগের সঙ্গীত যন্ত্রাদি যথা তূরী ভেরীর ইত্যাদির নকল তৈরি করে আমরা অভিনেতাকে দিয়ে থাকি। তারা বাজাবার অভিনয় করে মাত্র, বাজানো প্রায় সম্ভব নয়। গভীর রাতে চোর ঘরে ঢুকে নকল চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলতেই বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে গেল, এই চাবি ঘোরানোর শব্দে। আসল চাবি ঘোরানোর শব্দ এত জোরে হয় না যে তাতে সমগ্র প্রে(াগৃহের সকল দর্শক শুনতে পাবে। টেবিলে রাখা টেলিফোন বা মোবাইলের শব্দ, মঞ্চে তাকে সঠিক সময়ে বাজানো সম্ভব নয় আর তা সম্ভব হলে অত্যন্ত ব্যয় সাপে(। ফলে মঞ্চে দর্শকের চোখের সামনে এই সকল ধ্বনি সূত্র উপস্থিত থাকলেও আমরা কৃত্রিম উপায়কেই অবলম্বন করি।

মঞ্চে শাঁখে ফু দিলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা প্রে(াগৃহের সব জায়গা থেকে সমানভাবে তা শোনা যায় না। নাটকে ব্যবহৃত নকল পিস্তল থেকে যে শব্দ তৈরি হয় তা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যর্থ হতে পারে। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম ধ্বনি ব্যবহার করাই যুক্তি(সঙ্গত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, সমুদ্রের বা নদীর শব্দ, রাতের নিস্তব্ধতা, এই সকল শব্দ নাটকের পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে আর এই সকল শব্দ কৃত্রিম উপায়েই সৃষ্টি করা সম্ভব।

মানুষ তার নিজের শরীর সংর(ণের ইচ্ছা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল মমি তৈরি। নিজের চেহারা সংর(ণের তাগিদে তৈরি হয়েছিল—প্রতিকৃতি অঙ্কন। এমনকি নিজের কথা বা নিজেদের যুগের কথা সংর(ণের প্রয়োজনেই লেখার হরফের আবিষ্কার হয়। কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ সেই প্রাচীনকালে থাকলেও এই বিষয়ে কৃতকার্যতার নজির পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে চৈনিক লোকগাথার কিংবদন্তীতে শোনা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে জনৈক চৈনিক সম্রাট নাকি তাঁর কণ্ঠস্বর সংর(ণে সফল হয়েছিলেন।

আধুনিক কালে ১৮৫৯ সালে স্কট নামে একজন বৈজ্ঞানিক ধ্বনি সংর(ণের বিষয়ে প্রথম সাফল্য লাভ করেন। স্কট তাঁর যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন ফোন অটোগ্রাফ। পরে ১৮৬৪ এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন কোনিগ। রেকর্ড করার ব্যাপারে এই যন্ত্র কাজ করলেও পুন(ৎপাদনের (ে ত্রে এটি প্রায় কোন কাজ করতো না।

বৈজ্ঞানিক এডিসন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি উন্নত ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করলেন—যার নাম দিলেন ফোনোগ্রাফ। এই ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের ত্র(মবিবর্তনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড পে-য়ারের রূপে আমাদের কাছে সমাদৃত ছিল। ধ্বনি সংর(ণের জন্য আজ আমাদের কাছে পাঁচ রকমের মাধ্যম উপলব্ধ যথাত্র(মে—

১) ডিস্ক (রেকর্ড পে-য়ার)

২) টেপ (স্পুল টেপরেকর্ডার ও ক্যাসেট টেপরেকর্ডার)

৩) ওয়্যার

৪) ফিল্ম (যা চলচিত্রে ব্যবহৃত হয়)

৫) ডি.ভি.ডি (ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক)

এই মাধ্যমগুলির মধ্যে স্পুল ও ক্যাসেট টেপরেকর্ডার এক সময় মঞ্চনাটকে খুবই ব্যবহার হত। ওয়্যার আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। আজ আমরা নানা রূপে ডিজিটাল মাধ্যমে সংগ্রহীত শব্দ মঞ্চনাটকে ব্যবহার করে থাকি।

নাটকের পরিকল্পনায় যেমন আমরা প্রপস্, পোষাক পরিচ্ছদ, আলো ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করি, তেমনই নাটকে ব্যবহৃত শব্দ, সঙ্গীত ইত্যাদিরও তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। নাটকের নেপথ্য শব্দ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথাত্র(মে,

১) নাটককারের দেওয়া নির্দেশ

২) নাটকে বর্ণিত পরিবেশের বর্ণনা অনুসারে

৩) পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকের নিজস্ব কল্পনাশক্তি(

উদাহরণ স্বরূপ আমরা অনেক নাটকেই উল্লেখ থাকে— 'নেপথ্যে কোলাহল', 'দূর থেকে আগত মোটরের শব্দ ও হর্ণ', 'টেলিফোন বা দরজার কলিং বেল', বা 'মন্দিরের ঘন্টা' ইত্যাদি অনেক প্রকার ধ্বনি নির্দেশ নাটককার দিয়ে থাকেন। যেগুলি প্রথমে ত্র(মান্বয়ে তালিকাভুক্ত(করতে হবে।

অনেক (্ত্রে নাটকে কোন শব্দ সংকেত না থাকলেও শুধু পরিবেশের বর্ণনা থাকে, যার দ্বারাও আমাদের নাটকের ধ্বনি পরিকল্পনা করতে হয়—'কারখানার অভ্যন্তর', 'নদীর তীর', 'কয়লা খনি', ব্যস্ত শহরের রাস্তা ইত্যাদি নানা ধরনের পরিবেশ রচনাতে শব্দ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশ রচনায় আমাদের খানিকটা কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয় যেমন ধরা যাক কারখানার অভ্যন্তর সেখানে কি প্রকারের কারখানার যন্ত্রপাতি আছে, সেই অনুসারে শব্দ তৈরি করে পরিবেশ রচনা করতে হয়।

এই দুই ধরনের দৃষ্টান্ত ছাড়াও নাট্য পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালক নাটকের ভাব ও রস অনুসারে শব্দ বা সঙ্গীত ব্যবহার করেন। এই নির্দেশগুলি নাটককার তার পাণ্ডুলিপিতে সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেন না। চরিত্রের মানসিক অবস্থা— 'আতঙ্ক', 'ত্র(োধ', 'নিঃসঙ্গতা' বা 'নিস্তব্ধতা' এই রকমের বহু-ভাব প্রযোজনা অনুসারে আমরা নাটকে পরিস্ফুট করে থাকি।

এই সমগ্র কাজটি তালিকাভুক্ত(করে যদি আমরা একটি ধ্বনি সংকেত লিপি প্রস্তুত করি, তাহলে আমাদের নাটকে আলোর মতোই ধ্বনিগুলিও সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে বাজলে তাতে নাট্য প্রযোজনারই উন্নতি ঘটবে।

একক ২

থিয়েটারের উদ্ভব ও ত্র(মবিকাশ

থিয়েটারের জন্ম রহস্য নিয়ে আমাদের মধ্যে নানান মত বিরাজ করছে। এই বিষয়ে পৃথিবীর সুপ্রাচীন দুটি গ্রন্থ এ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' এবং 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র'-এ আমাদের থিয়েটারের রূপরেখা লিখিত আছে। আশ্চর্য রকম ভাবে এই দুই গ্রন্থেই নাট্যকর্মের প্রধান কাজ রূপে 'অনুকরণ' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। মানুষ তথা প্রানী জগতের অধিকাংশ প্রাণী তার বাল্যকাল থেকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কারণেই অনুকরণ করে থাকে। শৈশবে মায়ের কাছে যা শোনে তাই বলবার চেষ্টা করে, পরবর্তীতে পুতুল খেলায় কনে বা বর অথবা তাদের বাবা-মা কিংবা চোরপুলিশ খেলায় চোর বা পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যখন সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে শু(করেছে তখন থেকেই থিয়েটার চর্চার শু(। দ(িণ ফ্রান্সের ট্রোয়েস ফ্রেরেস গুহায় অঙ্কিত প্রস্তর যুগের হরিণের চামড়া ও শিং পরা কোনো এক নৃতরত মানুষের বিখ্যাত চিত্রটি, ম্যাজিশিয়ান বলে আখ্যায়িত, কিন্তু যখন আমরা দেখি পায়ের পাতা ও আঙুলগুলি বেরিয়ে আছে, ঠিক তখনই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে থিয়েটারের বীজ কোথায় নিহিত।

আদিম পৃথিবীর সভ্যতার থিয়েটারের বিকাশের তিনটি প্রাথমিক শর্ত আমরা অনুমান করতে পারি—

১। ভাষার অনুপূরণের প্রয়োজনে

২। খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে

৩। বিভিন্ন ধরণের শত্রুর (হিংস্র পশু ও অন্য গোষ্ঠী) পরাজয় নিশ্চিত করতে

এছাড়াও বিভিন্ন আচার প্রথা (Rite) ও আনন্দমূলক উৎসব পার্বণ ছিল আদি নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এখনও পৃথিবীর বহু আদিবাসী সমাজে ভাব বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা এত অপর্যাপ্ত যে তাদের অধিকাংশ ভাব-বিনিময় ও ইঙ্গিতের সাহায্যে হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আমাদের দেশের আন্দামানের 'জারোয়া' জনগোষ্ঠীকে পর্যবে(ণ করতে পারি। শুধু এই জনগোষ্ঠীরাই নয় আমাদের যাদের ভাষার ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ আমরাও কথা বলার সময় হাত ও মাথার সঞ্চালনা করে থাকি। এমনকি অনেক সময় কিছু না বলে ইশারাতে ভাবে প্রকাশ করি। অর্থাৎ শরীরী-ভঙ্গিমা (Action-Gesture) ও ভাষা, এই দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে থিয়েটার নামক শিল্পটি আদিম সমাজে।

আদিম সমাজের প্রধান কর্মোদ্দেশ্য ছিল খাদ্যসংগ্রহ। মানুষ তার জীবন শু(করেছে শিকারীরূপে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই শিকার সংত্র(ান্ত নানা রকমের অনুষ্ঠান বেশি দেখা যেত। পে-ইনস ইণ্ডিয়ানরা মহিষ শিকারের সময় মহিষের চামড়া গায়ে দিয়ে মহিষ শাবকের মতো ডাকতো মহিষের পালকে আকৃষ্ট করার জন্য। আফ্রিকার কাফ্রিদের অনুরূপ নৃত্য দেখা যেত। উত্তর আমেরিকার মান্ডান ইণ্ডিয়ানরাও মহিষ শিকারের সময় মহিষের মাথা, শিং ও লেজ পরে হাতে ঢাল ও বর্শা নিয়ে যতদিন পর্যন্ত মহিষের দলের দেখা না পেত, ততদিন 'মহিষ-নৃত্য' করে যেত। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা যে পশু শিকারে বের হয়, শিকারের আগেই সেই পশু সম্পর্কিত বিভিন্ন নৃত্য ও উৎসব করে থাকে।

খাদ্য সংগ্রহ শুধু পশু শিকারেই সীমিত ছিল না। যখন মানুষ শস্যের ব্যবহার ও উৎপাদন করতে শু(করল অর্থাৎ মানুষ কৃষিজীবী হল, তখন থেকেই যেসব আচার-পার্বণ (Rite) অনুষ্ঠিত হতে থাকল- যাকে পরবর্তীতে 'ধর্ম' বলে আখ্যা দেওয়া হল। শস্য উৎপাদনে সূর্য ও বৃষ্টির গু(ত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টি আদিম মানুষরাও অনুধাবন করে সূর্য ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা-উৎসব করত। সারা পৃথিবীর সমস্ত জনজাতির মধ্যেই এই সূর্য ও বৃষ্টির উপাসনা আমরা দেখতে পাই। থিয়েটারের বিকাশে এই 'ধর্ম' একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

আদিম যুগের এই সকল অনুকরণের অবশ্যম্ভাবী উপজাত বিষয় হল নৃত্য। আর এই নৃত্যই হল থিয়েটারের প্রথম শিল্পরূপ। ভাব প্রকাশের বিকল্প রূপে ইশারা-ইঙ্গিত হচ্ছে প্রধান উপকরণ। আজকের ভাষার যুগেও মানুষ অনেক ভাব প্রকাশ হাত ও মাথার সঞ্চালনার মাধ্যমে করে থাকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই এই সঞ্চালনার এক ছন্দের সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষদের এই ছন্দবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনা এক বিশেষ গু(ত্ব পেত। তাই তাদের সকল উৎসব অনুষ্ঠানও সর্বদাই নৃত্যসম্বলিত হত(যথা সাপ নৃত্য, ডিঙিনৌকা নৃত্য (Canoe), হরিণ নৃত্য, শস্য নৃত্য, সূর্য নৃত্য ইত্যাদি। ভাষার উদ্ভবে নৃত্যের সাথে যুক্ত(হয় সঙ্গীত। এই ভাবেই আদিম যুগের নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের সম্মিলিত একটি একক শিল্পরূপ ধারণ করে থিয়েটার।

থিয়েটারের আদিতে আমরা মূলত মুখোশের ব্যবহার দেখতে পাই। আদিম সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীই মুখোশের ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। এই মুখোশ থিয়েটারকেই আমরা থিয়েটারের আদি মেক-আপ ও কস্টিউম বা রূপসজ্জা বলতে পারি।

বিভিন্ন উপাদান দিয়ে মুখোশ তৈরি হতো। আদিমকালেতে পশুর খুলি ও চামড়া ব্যবহার হয়ে থাকতো। পরবর্তীতে কাঠের তৈরি মুখোশের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। আরও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের ধাতু, চামড়া, যেকোন প্রাণী খোলা, মাটি, কাপড়, শস্যগুঁড়ো গাছের ছাল ইত্যাদির ব্যবহার দেখতে পাই। পৃথিবীর সমস্ত অংশের জনজাতিরাই তাদের জীবন চর্চার মুখোশকে ভীষণভাবে আত্মস্থ করেছিল। তারা মুখোশ নির্মাণে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতিও ল(্য রাখত। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যকলা 'কথাকলি'-তে বা জাপানের 'নো' নাটকে যে মুখোশ ব্যবহার হয়, তা অতুলনীয়।

আদিম মানুষদের কোনো স্থায়ী বসতি ছিল না(মূলত তারা যাযাবর ছিল। ফলত তাদের অনুষ্ঠান সমূহের কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। যখন যেখানে ডেরা বাঁধত, তখন সেখানেই তারা উৎসব-অনুষ্ঠান করত। অধিকাংশ অনুষ্ঠান হত খোলা জায়গাতে। বিশেষ কোন পূজা অর্চনার (্ে ত্রে জায়গা নির্বাচন করে তাকে হয়তো সজ্জিত করা হত।

মানব সভ্যতায় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়। ফলত নিজেদের বাসস্থানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ শু(করে। যতদূর জানা যায়, আজটেক উপজাতিই প্রথম স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে। অবশ্য আজটেক জনজাতীদের আদিম মানবগোষ্ঠী রূপে গণ্য করা হয় না। এই জনজাতী তাদের বসতির মাঝখানে কাঠের ও পাথরের স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করেছিল বলে জানা যায়, যার উপরে নাট্যানুষ্ঠান হত। প্ল্যাটফর্মের আকার ছিল বিশাল, দর্শক তার চারপাশে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করত। আমাদের ধারণার মঞ্চ তৈরির প্রথম ধাপ। খানিকটা আজকের এরেনা-মঞ্চ বলা যেতে পারে। আদিম নৃত্য বা নাট্যানুষ্ঠান মূলত বৃত্তাকারে হত। অধিকাংশ সময়েই বৃত্তের কেন্দ্র স্থলে কোনো ব্যক্তি(বা কোনো বস্তু রাখা হত যাকে আজকের পরিভাষায় সেট বা মঞ্চসজ্জা বলতে পারি। স্পেনের কোগালে প্রাপ্ত প্যালিওলিথিক যুগের একটি দেওয়াল চিত্রে দেখা যায় যে, নয়জন রমনী একজন পু(ষকে কেন্দ্র করে নাচছে। এই অংশগ্রহণকারীরা নৃত্যের বা নাট্যের বিষয়বস্তু অনুসারে ফুল, গাছের শাখা ও পাতা, বর্শা-বল্লম প্রভৃতি বহন করছে। যা কিনা আজকের নাটকের পরিভাষায় প্রপস্‌রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলত নাট্যানুষ্ঠানগুলিতে সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। তাই এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হল বিশেষ দল, যাদুকর, ওঝা বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে। অর্থাৎ নাট্যকর্ম স্পেশালাইজ লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতে শু(হয়। আদিম সমাজে যাদুর ভূমিকা ছিল খুবই গু(ত্বপূর্ণ। যাদুবৃত্তি ও চিকিৎসাবৃত্তি সকলের জন্য নয়। সে(ত্রে যাদুকর ওঝাই সমাজে প্রথম স্পেশালাইজ পেশার অধিকারী। পরবর্তী যুগে ওঝারাই হল ধর্মনেতা বা ধর্মযাজক এবং ত্র(মশ ধর্মযাজকরূপী রাজা বা দলপতি বা গোষ্ঠীপতি। বিভিন্ন উৎসব-পার্বন, ধর্মীয় কর্মবৃত্তি ও ধর্মযাজকদের নির্দেশ বা পরিচালনার অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এভাবেই ধর্মযাজকদের তথা ধর্মের প্রসাদপুষ্ট হয়েই কালত্র(মে বিকশিত হল নাটক তথা নাট্যশিল্প।

মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারেরও বিবর্তন আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন সভ্যতার প্রায় প্রতিটিতে আমরা থিয়েটারের অস্তিত্ব পর্যবে(ণ করতে পারি। অতি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় ধর্ম ও থিয়েটার অঙ্গাঙ্গীন ভাবে জড়িয়ে ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা বি(্বাস করত, মানুষের দুটি আত্মা- 'বা' ও 'কা'। 'বা' - আত্মা আর 'কা' - দ্বিতীয় সত্তা। মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সত্তা গ্রহণ করে মানুষের পুন(জ্জীবন লাভ হয়, তাই মিশরীয়রা মৃতদেহকে মমি করে রাখত বিশেষ করে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজ পরিবারের সদস্যদের, পুরোহিতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি(দের(কেননা তারাই সাধারণ মানুষ ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। মমি সংর(ণের জন্যই তৈরি হয় পিরামিড। ঐতিহাসিকদের মতে মিশরীয় নাট্যকলার শু(খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। লুই ই. লাফলিন জুনিয়রের মতে মিশরে চারটি অথবা পাঁচটি ধারার নাট্যরূপ প্রচলিত ছিল। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে পিরামিড টেক্সট্স (Pyramid Texts)। বিভিন্ন পিরামিড ও উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি(দের সমাধির দেওয়াল গাত্রে মোট পঞ্চান্নটি টেক্সট পাওয়া গেছে। এইগুলির মধ্যে মঞ্চ নির্দেশনা, চরিত্র সমূত্রের নাম ও পরিচিতি এবং সংলাপ রয়েছে। আত্মার স্বর্গারোহন অথবা মৃত সম্রাট ও উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি(র দৈহিক পুন(থান এবং দ(িণ অয়নান্তের রূপক এইসব নাটকগুলি মূল বিষয়বস্তু।

এছাড়াও রাজ্যাভিষেক উৎসব নাটক (Coronation Festival Play) এবং পুরোহিত সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'চিকিৎসামূলক নাটক' (Medicinal Drama) দ্বারা তারা চিকিৎসার কাজ করত। মিশরীয় সভ্যতার সর্বাপে(া প্রধান নাট্যধারাটি হল এ্যাবিডস বা ওসিরিস প্যাশন পে- (Abydos or Osiris Passion Play)। খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৫৬৯ বা ৫২৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই নাট্য অনুষ্ঠিত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একমাত্র এই প্যাশন পে--র লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন মিশরে কোনো নাট্যগৃহ অথবা নাট্যানুষ্ঠানের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। প্যাশন পে--র অভিনয় স্থান ছিল রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ, পথ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতি। করোনেশন ফেস্টিভ্যাল পে- ও হেবসেদ অনুষ্ঠিত হত রাজগৃহে, পিরামিড টেক্সট হত সমাধি মন্দিরে আর চিকিৎসামূলক নাটক হত মন্দির সমূহে। সমগ্র অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হত পুরোহিতদের দ্বারা। চরিত্র অনুসারে পোশাক পরিধান করা হত। প্রাচীন মিশরে প্রসাধন ও রূপচর্চা এতটা উন্নত ছিল যে, সঙ্গতকারণে নাট্যানুষ্ঠানেও এর প্রয়োগ থাকবে বলেই মনে করা হয়।

মিশরীয় নাট্যকর্ম উদ্দেশ্য ও পরিবেশনায় ছিল ভাবগম্ভীর ও আন্তরিক(কোনো রচনাতেই হাস্যরসাত্মক উপাদান ছিল না। তাঁদের এই চর্চা ছিল ভীষণভাবে ধর্মভিত্তিক জীবনধারারই অঙ্গ, ফলত কোনোমতেই তারা একে শিল্পরূপে পরিচর্যা করেনি। যদিও এতে কাহিনী, চরিত্র, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সবই উপস্থিত, কিন্তু তা শুধুমাত্র ধর্মীয় ভাবে প্রকাশ পেত। এই কারণেই মিশরীয় সভ্যতায় কোনো উচ্চমানের থিয়েটারের বিকাশ ঘটেনি। অথবা তাদের দৃষ্টিতে থিয়েটার

কোন সচেতন শিল্পকর্ম রূপে বিবেচিত হয়নি। অর্থাৎ 'থিয়েটার' একটি স্বতন্ত্র শিল্প, এই ধারনার জন্ম তারা দিতে পারেনি।

কৃষি দেবতাকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধারা প্রাচীন সভ্যতায় অনেক ছিল। তাদের দেবতার সংখ্যাও কম ছিল না। সিরিয়াতে এ্যাডোনিস ও থামুজ (জল ও শস্যের দেবতা) ব্যাবিলনে থামুজ ও ইস্থার (উর্বরতা শক্তি(র দেবী ও থামুজের পত্নী) ফ্রাইজিয়ার আটিসা এবং গ্রীসের ডিয়োনাইসাস, যাকে উপল(ও অবলম্বন করেই জন্ম নিল ও বিকশিত হল 'থিয়েটার শিল্প'।

থিয়েটার (Theatre) ও ড্রামা (Drama) দুটি শব্দই এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। থিয়েটার কথাটির অর্থ হল এমন একটি স্থান যেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে কোনো 'এ্যাকশন' বা অনুষ্ঠান দেখা যায়। আর ড্রামা বলতে বোঝায় এক বিশেষ ধরণের 'এ্যাকশন' বা 'কৃত্য', এমনভাবে তৈরী যা অংশগ্রহণকারী ও দর্শক উভয়ের জন্যই অর্থবহ হবে তাদের জীবনদর্শনে আবার তা অবশ্যই আনন্দ ও বিনোদনমূলকও হবে। আর এই ফল্গুধারা সারা বি্বের নাট্যচর্চা ও সাধনা আজও বহন করে চলেছে।

মিশরের যেমন ওসিরিস, গ্রিসের তেমনই ডিয়োনাইসাস বা ডাইয়োনাইসাস (Dionysus) বা (Dionysos) ছিলেন দেবশ্রেষ্ঠ জিউস ও মানবী সেমিলির (মতান্তরে ডিমিটের অথবা পার্সোফোনে) পুত্র। ওসিরিসের মতোই এই ডিয়োনাইসাসও নিহত হন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিখণ্ডিত হয় এবং আবার পুনর্জীবন লাভ করেন। তাঁর জীবন সম্পর্কিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যথা— জন্ম, বিকাশ, ত্র(মধ্বংস প্রাপ্তি ও মৃত্যু   বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। গ্রিকদের অন্যান্য দেবতারা ছিলেন অভিজাত, জাগতিক জীবনের সাথে সম্পর্কহীন, কিন্তু ডিয়োনাইসাস ছিলেন লৌকিক দেবতা। সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের সাথে জড়িত। ডিয়োনাইসাস শস্যের ও উর্বরতার দেবতা, মদিরা এবং আনন্দের দেবতা। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এমন অভিমত পোষণ করেন যে, ডিয়োনাইসাস হলেন মিশরীয় দেবতা ওসিরিসেরই গ্রিক রূপান্তর। এই ডিয়োনাইসাস আরোও দুটি নামে পরিচিত ছিলেন যথা— বাকখাস (Bacchus) ও মেলানাইজিস (Melanaigis) যার অর্থ ছাগচর্ম পরিহিত দেবতা। আদিম যুগে সাধারণ মানুষের পরিধেয় বস্ত্র ছিল পশুর চামড়া এবং সম্ভবত ছাগলের চামড়ার ব্যবহারই প্রধান ছিল। ডিয়োনাইসাস যেহেতু লৌকিক দেবতা, তিনি চাষী আর সাধারণ মানুষের দেবতা তাই তার পরিধেয় বস্ত্রও তাদেরই অনুরূপ। ডিয়োনাইসাসের সর্ব(ণের সঙ্গী ছিল স্যাটুর (Satyr)। এই স্যাটুয়দের আকৃতি ছিল অর্ধছাগ ও অর্ধমানবের মতো কল্পনা করা হত।

ডিয়োনাইসাসের ধর্মাচার শু(হয় আনুমানিক ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এ্যাটিকা (Attica) অঞ্চলে। এই পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হত চারটি পর্বে। প্রথম উৎসব হল (রাল ডিয়োনাইসিয়া (Rural Dionysia) বা Festival of Vintage। এটি অনুষ্ঠিত হত ডিসেম্বর মাসে। এই সময়টি হল সদ্য প্রস্তুতের জন্য দ্রা(া সংগ্রহের কাল। দ্বিতীয় উৎসব ছিল লেনিয়া (Lenaea) বা Festival of Winepress, এটি অনুষ্ঠিত হত জানুয়ারী মাসে, এই সময় দ্রা(া পেষণ করার কাল। তৃতীয় উৎসবটি হত ফেব্রুয়ারি মাসে, বসন্তের আগমনের সময়, এর নাম ছিল এনথেসটেরিয়া (Anthesteria) বা এ্যানথেসট্রেরিয়া (Anthestreria) বা Festival of testing। এই সময়ে মদের গুনাগুন ও আস্বাদ নেওয়া হত। সর্বশেষ তথা উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হত মার্চ মাসে, সিটি ডিয়োনাইসিয়া (City Dionysia) বা গ্রেট ডিয়োনাইসিয়া (Great Dionysia)। এই সময়ই সমুদ্র বাণিজ্য শু(হত।

ডিয়োনাইসাসের উদ্দেশ্যে যে পূজা অনুষ্ঠিত হত তাকে ডিথাইরাম্ব (Dithyramb) বা ডিয়োনাইসিয়াক (Dionysiac) উৎসব নামে অভিহিত করা হত। এই সব অনুষ্ঠানে সমবেত ভাবে গীত বা স্তোত্রগীত এবং তা হত সমবেত নৃত্যসহযোগে, এই উৎসব ও পূজা অনুষ্ঠানটি পৌরহিত্য করতেন পুরোহিত। তিনি কল্পিত স্যাটুরদের মতো পোষাক ও মুখোশ পরতেন এবং ডিয়োনাইসাসের ভক্ত(বৃন্দও স্যাটুরদের অনুসরণ করত। এই উৎসবের প্রাণ ছিল উদ্দামতা ও উন্মত্ততা। গ্রিক থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। সে(ত্রে পণ্ডিতদের অনুমানকেই আমাদের আশ্রয় করতে হয়েছে এবং এর ফলে অনেক (ত্রে এইসব অনুমান পরস্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু সকল পণ্ডিতরা এই বিষয়ে একমত যে ডিয়ানাইসাসের উৎসব থেকেই গ্রিক থিয়েটারের জন্ম।

স্তোত্রগীত বা ডিথাইরাম্ব অনুষ্ঠিত হত সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং এর সাথে কথা বা সংলাপও যুক্ত(ছিল। উৎসবের সময় সাধারণ মানুষরা শোভাযাত্রা সহকারে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হত। এই যাত্রাপথে তারা গান, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রঙ্গকৌতুক ও হুল্লোড়ও করত। এই উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পূর্বেই ডিয়োনাইসাসের বেদী স্থাপন করা হত। নানাবিধ পূজা আচারের মধ্যে অন্যতম ছিল ছাগবলি। এই বলিদান কালে যে নৃত্য ও সঙ্গীত হত তাকে ট্র্যাজোডেইয়া (Tragodeia) নামে অভিহিত করা হত।

ডিয়োনাইসাসের উৎসব তথা গ্রিক থিয়েটারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হল কোরাস (Chorus) এবং অর্কেস্ট্রা (Orchestra)। কোরাস অর্থাৎ কিনা সমবেত নৃত্য ও গীত এবং অর্কেস্ট্রা হল নৃত্যভূমি। এই নৃত্য ও গীতে যারা অংশগ্রহণ করত তাদেরকে কোরাস বলে আখ্যায়িত করা হত।

ডিথাইরাম্ভ বা কোরাল ওড কোনটাই পূর্ব লিখিত ছিল না। মুখে মুখে চলে আসত এই স্তোত্র ও গীতসমূহ। এটা আমাদের দেশের বেদের লিখিত রূপ আসবার আগে যেরূপ শ্রুতি আকারে ছিল এটাও খানিকটা সেইরূপ। হেরোডোটাসের মতে আনুমানিক ৬২০ খৃষ্টপূর্বে লেসবোস দ্বীপের অধিবাসী লোককবি ও সঙ্গীতকার আরিয়োন কোরিন্থে বসবাসের সময় প্রথম ডিথাইরাম্বের লিখিত রূপ প্রদান করেন। এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও, তাঁরা সকলেই একমত যে আরিয়োনই ডিথাইরাম্ব ও ডিয়োনাইসাসের জীবনবৃত্তান্তকে নিয়ে এক দীর্ঘ পালা ও গাথায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি গ্রিক সংস্কৃতির দুই ধারা ডোরিয়ান ও ইয়োনিয়ানকে এক সাথে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেন এবং এই আরিয়োনকৃত নতুন রূপ দ্রুত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ নাট্যরূপ লাভ করে। ট্র্যাজোডাইয়া বলতে বোঝানো হত ছাগসঙ্গীত। ট্র্যাজি শব্দের অর্থ হল 'ছাগ' আর তার সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে 'ode' বা 'গাথা'। অর্থাৎ ট্র্যাজি এবং ওড এই দুইয়ের সন্ধিতেই তৈরি হয়েছে ট্র্যাজেডি। পণ্ডিতরা আরিয়োনকৃত এই নাট্যরূপটির নাম দিয়েছেন লিরিক ট্র্যাজেডি।

লিরিক বা কোরাল ট্র্যাজেডির নাট্যরূপ লাভের (ত্রে প্যানাথেনিয়া উৎসবের (Panathenaea) ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দেবী এথেনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই উৎসব জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হত। মশাল দৌড়, ত্র্গীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছাড়াও হোত মহাকাব্য আবৃত্তি (বিশেষ ভাবে হোমারের) ও সিথারা বাদ্যে প্রতিযোগিতা। মহাকাব্য আবৃত্তি বা পাঠের ঐতিহ্য বহু পূর্বেই গ্রিসে প্রচলিত ছিল। এই মহাকাব্য আবৃত্তির সঙ্গে কোরাস গীতের বা অর্কেস্ট্রার কোনো প্রত্য(সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই আবৃত্তির সঙ্গে সংলাপের পরো(সম্পর্ক থাকার ফলে নাটকের জন্ম প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে সেই যুগান্তকারী ঘটনা যার দ্বারা সম্পন্ন হল তিনি হলেন থেসাপিস (Thespis)। তিনি ইকারিয়ার (Icaria) অধিবাসী এবং পরে এথেন্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

থেসপিস ছিলেন কবি ও সঙ্গীতকার। তিনি ডিয়োনাইসাসের উৎসবে কোরাস দলের নেতৃত্ব দিতেন। আবৃত্তিকার যেভাবে আবৃত্তির রীতি বৈশিষ্ট্যকে অ(ু ণ্ণ রেখে সমস্ত চরিত্রের সংলাপ বিনিময় যেমন করেন তেমনই থেসপিস নিজেকে কোরাস দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি চরিত্ররূপে কোরাসের বিপরীতে দাঁড় করাতেন। উদাহরণ রূপে আমরা ধরতে পারি থেসপিস 'রাজা ইডিপাসের সংলাপ বলবার সময় নিজেকে কোরাস গায়ক দলে না রেখে, নিজেকে ইডিপাস রূপে উপস্থিত করলেন। এই ভাবেই জন্ম নিল 'অভিনেতা' এবং থেসপিস হলেন প্রথম অভিনেতা, অ্যাকটর (actor) যার অর্থ প্রত্যুত্তরদানকারী আবৃত্তিকার (Answering Reciter)। থেসপিসের এই বিস্ময়কর সংযোজনার ফলে এতদিনের লিরিক ট্র্যাজেডি উন্নত হল ড্রামাটিক ট্র্যাজেডিতে। এ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যারা ডিথাইরাম্বে নেতৃত্ব দান করত তাদের দ্বারাই ট্র্যাজেডির উদ্ভব ঘটেছিল।

থেসপিস তাঁর দলবল অর্থাৎ কোরাস দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। তিনি কোরাস দলের মাঝখানে উঁচু পৃথক একটি স্থানকে অভিনয়ের স্থান রূপে ব্যবহার করতেন। যাকে আমরা মঞ্চরূপ বলতে পারি। বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে থেসপিস উঁচু টেবিল ব্যবহার করতেন। গ্রিকদের নাট্যাভিনয়ের গোড়ার দিকে ঠেলাগাড়ির মতো মানুষে টানা বা ঘোড়া অথবা গ(র গাড়ির ব্যবহার হোত। অনেকে অনুমান করেন থেসপিসও ওইরূপ কোনো গাড়ী ব্যবহার করতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে ওই গাড়িকে মঞ্চ রূপে ব্যবহার করতেন।

অভিনেতার আগমনে নাটক কেবল গীতপ্রধান আখ্যান থাকল না। এই নাটকের কাহিনীর মধ্যেকার চরিত্ররাও ঘটনার বিস্তারে মঞ্চে উপস্থিত হতে লাগলো। থেসপিস একক ভাবে সকল চরিত্র অভিনয় করত। ফলত কোরাস গীতির অবসরে অর্কেস্ট্রা থেকে আড়ালে গিয়ে পোশাক ও মুখোস বদল করে আসত। পরবর্তীকালে এস্কাইলাস দুইজন ও সোফোক্লেস তিনজন অভিনেতা যুক্ত(করেন। অনুমান করা যায় সংলাপকারী অভিনেতা ছাড়াও একাধিক নীরব অভিনেতাও থাকত।

গ্রিক থিয়েটারের শু(র থেকে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে এর স্থাপত্যের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সেই বিবর্তনের সঠিক কোনো বর্ণনা সেই যুগে লিপিবদ্ধ করা নেই। এমনকি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এ্যারিস্টটলের লেখা 'পোয়েটিক্স'-এ নাট্যশাস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও তার প্রায়োগিক দিক অর্থাৎ 'ফিজিক্যাল থিয়েটার' নিয়ে কোনো তথ্য বা বর্ণনা দিয়ে যাননি। ফলত গ্রিক পরবর্তী যুগে রচিত বিভিন্ন বই ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে একটা ধারণা আমরা করতে পারি। গ্রিসের স্বর্ণযুগে প্রতিটি প্রধান নগরীতে ধর্মীয় আচার বিধি পালনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ থিয়েটার নির্মাণ করে। এই সমস্ত থিয়েটার একই সময়ে তৈরি হয়নি এবং পাঁচশো বছরের ত্র(মবিবর্তনের ফলে মঞ্চ ব্যবস্থাও পরিবর্তন ল(ণীয়। তবুও গ্রিক থিয়েটারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে সাধারণত এথেন্সের ডিয়োনাইসাসের থিয়েটারকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়। কারণ এটিই ছিল সর্বপ্রথম এবং এখানেই শ্রেষ্ঠ গ্রিক নাটককারদের নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এথেন্স শহরের প্রান্তে সমুদ্রতীরে পাহাড়ের পাদদেশে এই মঞ্চ নির্মিত হত। পাহাড়ের ঢালে খাঁজকাটা ধাপে ধাপে দর্শকরা বসত। আনুমানিক ১৫ থেকে ১৭ হাজার দর্শক একসাথে বসে নাটক উপভোগ করত। মূল অভিনয় স্থলটি ছিল আয়তকার। শু(র দিকে এটি একটি আয়তকার কাঠের ঘরের মতো ছিল। এই ঘরটিকে বলা হত স্কেনে (skene) বা সেকনে বিল্ডিং (Skene Building)। এই স্কেনে শব্দটি থেকেই সিন (Scene) কথাটি এসেছে। নাটক শু(র আগে অভিনেতারা এই স্কেনের ভিতরে গিয়ে নিজেদের তৈরি করে নিত। চরিত্র বদলের সময় পোশাক ও মুখোস বদল করত। নাটকে নিজের ভূমিকা শেষ করে এখানে বিশ্রাম নিত। এই স্কেলের সামনে একটা অংশ ছিল যার নাম প্রস্কেনিয়ন (Proskenion) যা থেকে পরবর্তীতে প্রসেনিয়াম (Proscenium) কথাটি এসেছে। এই প্রস্কেনিয়নের সামনে একটি

গোলাকৃতি মঞ্চ ছিল যার নাম অর্কেস্ট্রা (Orchestra)। এই অর্কেস্ট্রাতেই কোরাস অভিনয় করত। স্কেনের যে পিছনের দেওয়াল ছিল তাতে প্রথমে একটি আসা-যাওয়ার প্রবেশপথ থাকত। পরবর্তীতে দুটি এবং আরো পরবর্তীতে তিনটি প্রবেশ পথ যুক্ত(হয়। প্রস্কেনিয়নের যে থামের ব্যবহার হত অর্থাৎ স্তম্ভসারির ফাঁকে ফাঁকে বসানো থাকত পিনাকেস (Pinakes) চিত্রময় কাঠের প্যানেল। ঈসকাইনাসের পরবর্তীকালে সোফোক্লেস চলমান দৃশ্যপটের ব্যবহার করেন। যার নাম ছিল পেরিয়াকতই (Periaktoi)। পোনাক্স ও ভিট্রভিয়াস উভয়েই এই পেরিয়াকতই-কে একটি যান্ত্রিক কৌশলের কথা বলে উল্লেখ করেছেন। পেরিয়াকতই আসলে একটি তিনদিক বিশিষ্ট প্রিজম্ (Prism)। সম্ভবত মঞ্চের পিছনে দুই দিকে অথবা দরজার কাছাকাছি বসানো থাকতো নাটকের প্রয়োজন অনুসারে স্থান বা পটভূমি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মতো তাকে ঘোরানো যেত। এর তিন দিকেই বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য আঁকা থাকত। ভিট্রভিয়াস গ্রিক থিয়েটারে তিন ধরনের দৃশ্যপটের কথা উল্লেখ করেছেন যথা—ট্র্যাজিক, কমিক ও স্যাটুরিক। সম্ভবত এই তিন ধরনের নাটক তখন অভিনিত হত, তার পরিপ্রে(তেই বিভিন্ন স্টাইলের দৃশ্যপট রচনা করা হত। প্রস্কেনিয়নের দুইপাশ দিয়ে দর্শকরা প্রবেশ করতেন গ্যালারীতে। এই পথের নাম ছিল প্যারোদোস (Parodos)। অভিনেতারা প্রস্কেনিয়নে ওঠবার জন্য যে ঢালুপথের ব্যবহার করতেন তাকে বলা হত র‍্যাম্প (Rampe)।

একথা বলার অপে(া রাখে না যে গ্রিক থিয়েটারের নাট্যগৃহ ছিল উন্মুক্ত(। তৎসত্ত্বেও নাট্য প্রযোজনায় দৃশ্যসজ্জার মধ্যে দিয়ে পরিবেশনাকে সুন্দর, মনোগ্রাহী এবং আড়ম্বরপূর্ণ করার প্রয়াস ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। অর্কেস্ট্রার পিছনে অস্থায়ী দেয়ালও যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘দ্য পার্সিয়ান’ নাটকে ডারিয়ুসের প্রেতাত্মা ওই দেয়ালের নীচ থেকেই মঞ্চে প্রবেশ করত।

পোলাক্স তিন দরজা বিশিষ্ট দেয়ালের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, মাঝের দরজাটি অন্য দুটি দরজার থেকে বড় ছিল। এই মাঝের দরজা দিয়েই নাটকের বর্ণিত সকল রাজকীয় প্রবেশ প্রস্থান ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ডানদিকের দরজাটি ছিল দ্বিতীয় অভিনেতার প্রবেশের জন্য এবং অন্যান্য ক(র সাথে সংযোগকারী রূপে ব্যবহৃত হত। বাম দিকের দরজাটি অন্যান্য চরিত্ররা ব্যবহার করত। এছাড়াও এই শেষোক্ত(দরজাটি দূর-প্রান্তর, মন্দির, কারাগার ইত্যাদিতে যাতায়াতের জন্যও ব্যবহৃত হত। প্যারোদোসের পথটি ব্যবহার হত কোরাসের জন্য এবং নগরের বাইরের পথ নির্দেশ করতে। স্কেনের দরজাগুলি কোন না কোন দৃশ্যময় সেটিং-এর কাজ করত। গ্রিক থিয়েটারে কোনো মৃত্যু দৃশ্য মঞ্চের উপর পরিবেশন করা হত না। এই দৃশ্যগুলি সংঘটিত হত মঞ্চের অভ্যন্তরে। নাটকে এই দৃশ্যগুলির বর্ণনা কোনো একজন চরিত্র মঞ্চে এসে বর্ণনা করত, যেমন অয়দিপাউস নাটকে ইওকাস্তের মৃত্যু এবং অয়দিপাউসের অন্ধত্ব বরণের দৃশ্য আমরা দূত মারফত জানতে পারি। গ্রিক থিয়েটারের একটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রের ব্যবহার হল ‘মেকানে’ (Mechane)। অর্কেস্ট্রা বা মঞ্চের বামদিকে প্রস্ককেনিয়নের ছাদ বা স্কেনের উপর থেকে পুলি বসিয়ে, দড়ির সাহায্যে ‘মেকানে’-কে উপর থেকে মঞ্চে নামিয়ে আনা হত। এই যন্ত্রের সাহায্যেই এ্যারিস্টোফেনেসের ‘দি ক্লাউডস’ নাটকে সত্রে(টিসকে বাস্কেটের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। পোলাকস ছাড়াও আরও অনেক গবেষক বজ্র-মেশিন (thunder machine) বা (thunder tub)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। যার গ্রিক নাম ব্রনটেউওন (bronteion)। উজ্জ্বল দিবালোকে নাটকগুলি হল ফলত কৃত্রিম আলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব এই দিবালোকেই রাত্রিকালীন ঘটনা ঘটত। ফলত বজ্র-মেশিন ছাড়াও কেরাউনোসকোপেইওন (Keraunoskoperion) বা বিদ্যুৎ মেশিনের (Lighting machine) উল্লেখ পাই। বিভিন্ন ধরণের ট্রাপের কথাও অনেক পণ্ডিত জানিয়েছেন। এরি জিয়ার মঞ্চে ‘শ্যারনস স্টেপ (Charon's Step)

এর তাদের মধ্যে অন্যতম। অর্কেস্ট্রা ও মঞ্চে, এই দুই জায়গাতে ট্র্যাপের ব্যবস্থা ছিল। এইসব ট্র্যাপের ভিতর থেকে অর্থাৎ পাতাল থেকে প্রেতাত্মা এবং অশরীরী মঞ্চে উঠে আসত।

গ্রিক থিয়েটারকে দিয়েই পাশ্চাত্য তথা আধুনিক থিয়েটারের শু(। প্রাচীন যুগের ‘নো’, ‘কাবুকি’ বা ‘ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ’ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে গড়ে উঠে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই থিয়েটারগুলি গ্রিক থিয়েটারের মতো বিস্তার লাভ করেনি। ফলতঃ গ্রিক থিয়েটারের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বি(-ষণ করলে দেখা যাবে যে আধুনিক থিয়েটারের মৌলিক অঙ্গগুলি এর মধ্যে নিহিত ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রিক নাট্যসাহিত্যের প্রভাব আজকের আধুনিক নাট্যসাহিত্যেও আমরা দেখতে পাই। ধর্মাচরণের আবেগ দিয়ে দেবতা ডিয়োনাইসাসের পূজা-উৎসবকে কেন্দ্র করে যে শিল্প আঙ্গিক নাট্য বা থিয়েটার নাম নিয়ে জন্ম নিল কালত্র(মে তা গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব রূপে বিবেচিত হয়। গ্রিক সভ্যতা যদি নাট্য শিল্প প্রদান না করত, তাহলে আমরা হয়তো আরো অনেককাল পরে নাট্যশিল্প লাভ করতাম ঠিকই, কিন্তু তার রূপ এবং আঙ্গিক হয়তো অন্যরকম হত।

শস্যের দেবতা ডিয়োনাইসাসের উৎসবকে অবলম্বন করে গ্রিসে নাট্যকলার জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু রোমানরা তাদের শস্যদেবতা সিলভানুস (Silvanus) ও টেল্লুস (Tellus)-কে অবলম্বন করে বিশেষ কোনো উন্নত মানের থিয়েটারের জন্ম দিতে পারেনি। রোমান শস্য দেবতাদের উৎসবে পরিবেশিত হত হাস্যকৌতুক, ভাঁড়ামি, অ(ীল নৃত্য ইত্যাদি। তবে রোমানরা থিয়েটারের স্থাপত্যে অনেক সংযোজন ঘটিয়েছেন—থিয়েটারের ইতিহাসে তাদের অবদান প্রধানত স্থাপত্যেই। তাদের এই অবদানে মঞ্চগৃহের দ্বিতীয় স্তরটি সম্ভব হয়েছে।

রোমান থিয়েটারের আদিতে (ষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হলেও রোমান থিয়েটারের সঙ্গে ধর্মের সত্যিকারের যোগ আমরা দেখতে পাই না। গ্রিকদের মতো ‘থিয়েটার’ রোমানদের কাছে কোন জাতীয় ধর্মোৎসব রূপে বিবেচিত হয়নি। যদিও রোমানদের দেবদেবীর সংখ্যা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তাদের জীবনধারার ধর্মীয় আগ্রহ ও অনুভূতি বিশেষ ল(করা যেত না। বাস্তব বোধসম্পন্ন রোমানরা যুদ্ধ আর রাজনীতি থেকে জীবনের প্রতি আস্থা ও (মতা স্থাপন করেছিল। জীবনকে উপভোগ করার (ে ত্রে বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরিয়ে তুলে ছিল। ফলত রোমান উৎসবের উদ্দেশ্যই ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বর পূর্ণ।

রোমান থিয়েটারের উৎসবকালে আদিতে অস্থায়ী মঞ্চ ‘পুলপিটাম’ (Pulpitum) তৈরি করা হত। অস্থায়ী মঞ্চের পিছনে কাঠের স্কেনে ফ্রন্স (Scaenae Frons) নির্মাণ করা হত। এই স্কেনে ফ্রন্স গ্রিক থিয়েটারের স্কেনে বা মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়াল। এতে প্রায় পাঁচফুট উঁচু মঞ্চ থাকত। আর উৎসব শেষে এইসব অস্থায়ী মঞ্চ ভেঙে ফেলা হত। এইরূপ মঞ্চ ব্যবস্থায় দর্শক বসবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলত কোন দর্শক বসে অনুষ্ঠান দেখতে চাইলে তাদের নিজেদের আসন নিজেকে নিয়ে আসতে হত। সেই সময়ের রোমান আইন অনুসারে নাট্যগৃহে দর্শক বসার ব্যবস্থা বা স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ১৯৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে ফুলভিয়াস ফ্লাককুস ও পস্টুমাস আলবিনুস নির্মিত একটি রঙ্গালয় এবং ১৭৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে এ্যাপোলোর মন্দিরের কাছে একটি কাঠের পরিপূর্ণ মঞ্চগৃহ থিয়েট্রাম এট প্রসিনিয়াম (Theatrum at Proscenium) তৈরি হয়।

গ্রিক থিয়েটারের শেষ যুগে কোরাস নাটক থেকে লোপ পাওয়া রোমান থিয়েটারেও তার ব্যবহার থাকল না, ফলে অর্কেস্ট্রা অভিনয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এই পরিবর্তনের ফলে মঞ্চ আরো সামনের দিকে এগিয়ে এসে অর্কেস্ট্রার অর্ধেক দখল করে নেয়। আর অর্কেস্ট্রাও অর্ধবৃত্তাকার হলে গেল। এবং এখানে অভিজাত ও উচ্চবিত্তদের বসবাস স্থান রূপে ব্যবহৃত হতে লাগল।

খৃষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দের আগে রোমে স্থায়ী নাট্যগৃহ তৈরি হয়নি। এই সময়ই মহান পম্পে (Pompey) যে থিয়েটার গৃহ নির্মাণ করেন তাকেই রোমান থিয়েটারের আদর্শ রূপ বলে গণ্য করা হয়। এই থিয়েটারের পিছনে, উঁচুতে তিনি দেবী ভেনাসের (Venus victrix) বেদী স্থাপন করেন, অর্থাৎ দেবী মন্দিরের পাদদেশে নির্মিত হল মঞ্চ। মন্দিরে যাবার জন্য অর্ধচত্র(াকারে তৈরি হল সোপান শ্রেণী যা আসলে দর্শকদের বসবার জন্য গ্যালারী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লি-নির মত অনুসারে এখানে ৪০ হাজার দর্শক আসন ছিল। পম্পে থিয়েটারে একাধিক বৈশিষ্ট ল(করা যায়। প্রোসেইনিয়াম-এ (Proscaennium অর্থাৎ গ্রিক প্রোসকেনিয়ন) সমগ্র অভিনয় স্থল ও তার পশ্চাৎপট অন্তর্ভুক্ত(হল প্রোসেইনিয়ামের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ স্কেনে ফ্রান্স থাম ও কুলুঙ্গি (Niche) দ্বারা সুসজ্জিত ও আড়ম্বরপূর্ণ করা হল। পম্পে থিয়েটারের মৌলিক দিকগুলি হল—মঞ্চ, অর্কেস্ট্রা ও প্রে(াগৃহ, এই তিনটি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত(করা হল। এর ফলে এই তিনটি অংশের মধ্যে ঐক্য ও সংযোগ সাধন সম্ভব হল। পম্পেঈ, সেগাস্টা ও টিণ্ডারিসের স্থায়ী রঙ্গালয়গুলির বৈশিষ্ট্য ছিল রঙ্গমঞ্চ ও প্রে(াগৃহকে একটি সম্মিলিত ও একীভূত স্থাপত্যরূপ প্রদান করা। এই সংযুক্তি(করণ রোমান থিয়েটারের স্থাপত্যের সর্বাপে(া উল্লেখযোগ্য অবদান যা পরবর্তী রেনেসাঁ যুগে আধুনিক থিয়েটার গৃহের জন্মসূত্র হয়েছিল।

খৃষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে রোমান রিপাবলিক যুগ শেষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রোমান সাম্রাজ্য। এর পরবর্তী সময়ে ইংল্যাণ্ড থেকে পর্তুগাল, উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত শতাধিক রঙ্গালয় তৈরি হয়। এই সকল নতুন রঙ্গ মঞ্চ নির্মাণে রোমান আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। এমনকি ওই সকল স্থানে আগে যে সব রঙ্গমঞ্চ ছিল সেগুলিতে রোমান স্থাপত্যকে অনুসরণ করে পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। শুধু তাই নয় রোম অধিকৃত গ্রিসের রঙ্গমঞ্চকেও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল।

মঞ্চ ব্যবস্থায় রোমান থিয়েটারের অন্যতম মৌলিক অবদান, মঞ্চের সম্মুখ-পর্দার (আউলিয়াম - auleum) সংযোজন। এই পর্দার সংযোজন ঘটেছিল রোমান সাম্রাজ্যের যুগে, খৃষ্ট অব্দের প্রথম শতকে। এই পর্দাটি সম্ভবত মঞ্চ গৃহের সর্বোচ্চ দুই প্রান্তে কোনো ফ্রেমের সঙ্গে আটকিয়ে দেওয়া হত এবং তা অর্কেস্ট্রার সম্মুখে নামানো ও ওঠানো যেত।

ভিট্রুভিয়ুস অঙ্কিত দৃশ্যপটের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি স্কেনে ফ্রন্সে টাঙিয়ে দেওয়া হত। পেরিয়াকটোই-এর তিন দিকে বিভিন্ন প্রকারের দৃশ্যপট আঁকা থাকত, দৃশ্য পরিবর্তন বোঝাতে তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হত। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে মূলত তিন ধরনের অঙ্কিত দৃশ্যপট থাকত যথা—ট্র্যাজিক দৃশ্যপটে স্তম্ভ, পেডিমেন্ট, মূর্তি ও রাজকীয় বৈশিষ্ট সম্পন্ন নানা বিষয়, কমিক দৃশ্যপটে সাধারণ ঘর-বাড়ি, ব্যালকনি, জানালা ইত্যাদি এবং স্যাটুরিজ দৃশ্যপটে থাকত বৃ(, পাহাড় ও প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত গ্রাম্য বিষয়।

রোমান থিয়েটারের অনুষ্ঠান মূলত দিনের বেলাতেই অনুষ্ঠিত হত। ফলত আলোক সম্পাতের কোন সমস্যা ছিল না। তবে ছাদযুক্ত(মঞ্চ ও প্রে(াগৃহ মশাল বা প্রদীপ ইত্যাদির দ্বারা আলোকিত হত। আর এইরূপ আলোর দ্বারা সম্ভবত রাতেও অনুষ্ঠান হত।

রোমান থিয়েটারে টিকিটের প্রথাও চালু ছিল। এই সকল টিকিটের নিদর্শন রোম, পম্পেই ও অন্যান্য শহরে পাওয়া গেছে। টিকিটগুলি হাতির দাঁত অথবা হাড় দিয়ে তৈরি হত। এগুলি দেখতে মাছ বা ফলের আকৃতিতে হত। টিকিটের একদিকে থাকত ত্র(মিক সংখ্যা অন্যদিকে মুখোশ, মূর্তি ইত্যাদি অঙ্কিত তাকত। থিয়েটার ছাড়াও এ্যামফিথিয়েটার ও সার্কাসেও টিকিটের ব্যবস্থা থাকত।

রোমান থিয়েটার প্রধানত স্থাপত্য ও প্রকৌশলে অবদান রেখেছে অনেকে কিন্তু সামগ্রিক নাট্যকলাকে তারা অতি হীন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। এমন কি নাট্যকলার সাথে যুত্ত(ব্যক্তি(রা সমাজের কাছে সম্মান পাননি এবং তাঁরাও নাট্যকলাকে সুস্থ শিল্পকর্ম রূপে তুলে ধরতেও পারেননি। ব্যভিচার, (চিহীনতা, অ(ীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নিষ্ঠুরতা রোমান থিয়েটারের জগৎকে কলুষিত করে তুলে ছিল। এই পরিস্থিতিতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার করা নাট্যকলাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। খ্রিস্টান গির্জা নাটকে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা নাটক দেখা পর্যন্ত ঈ(রের ও খৃস্টধর্ম বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিল। কেবল খ্রিস্টান ধর্মযাজকরাই নয়, নাট্য কলার তথা নাট্যিক কর্মকৃতির বি(দ্ধে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সম্রাটরাও সেই সময় চার্চের পাশে অবস্থান করে রবিবার ও অন্যান্য পবিত্র দিনে যে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের একটি পরিহাস এই যে, যে ধর্মের কারণে নাট্যকলা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল সেই ধর্মই নাট্যকলার পুন(জ্জীবন দান করল। মাঝখানে কয়েক শত বছরের বন্ধ্যাত্ব ও অন্ধকার যুগ।

ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে মধ্যযুগ বলতে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের নাট্যের কাল ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগের নাট্যশৈলীকে আমরা তিনটি ভাগ করতে পারি, যথা—

১) গির্জার অভ্যন্তরে নাট্যানুষ্ঠান

২) গির্জার অঙ্গনে নাট্যানুষ্ঠান

৩) গির্জার এলাকার বাইরে লোকালয়ে নাট্যানুষ্ঠান

এই তিন পর্যায়ের নাট্যানুষ্ঠানে অবশ্যই বিষয় বস্তু রূপে থাকত খ্রিস্টধর্ম তথা যীশুর জীবন বৃত্তান্ত। একটা ল(ণীয় বিষয় হল এই যে, মধ্যযুগের নাট্যকলার ধর্মীয় নাট্যের উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে গ্রিকনাট্যের অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। গ্রিক নাট্যের মতো মধ্যযুগের নাট্যের উৎপত্তি ধর্মকে কেন্দ্র করে। অভিনেতারা নাট্য পরিবেশনাকে উপাসনা রূপে দেখছে, দর্শকরাও একই মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ ও উপভোগ করেছে। মধ্যযুগের নাট্যে কোনো বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী ছিল না, ছিল সামগ্রিক খৃষ্টীয় সমাজ। গ্রিক থিয়েটারের দর্শকদের মতো মধ্যযুগের দর্শকরা সকাল থেকে অধীর আগ্রহে অপে(া করত। তবে অমিলও কম নেই। মধ্যযুগের থিয়েটারে গ্রিক থিয়েটারের মতো ধ্রুপদী ভাবেও চেতনার অভাবে এই যুগের শিল্পকর্ম কালোত্তীর্ণ হয়নি। হালকা রসের উপাদান, মঞ্চে নৃশংস দৃশ্যের উপস্থাপনা, স্থূল রসিকতা ইত্যাদি মধ্যযুগের নাট্যকর্ম সেই যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

১৪৫৩ সাল রেনেসাঁর যাত্রাকাল রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। ওই সময়েই মুসলিমদের দ্বারা খৃস্টীয় বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটিনোপলের (বর্তমান ইস্তাম্বুল) পতন ঘটে। এই সময়ই খ্রিস্টান পণ্ডিতবর্গ গ্রিক জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে ইউরোপে চলে আসেন। ইতিপূর্বে ল্যাটিন সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় থাকলেও গ্রিক সাহিত্য ও শিল্পের সাথে পরিচয় ছিল না। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এর সাথে পরিচয় গভীরত্বর হয়। এই সময় থেকেই প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের নবজীবন ঘটতে থাকে। এই নবজীবন বা পুনর্জাগরণকে এক কথায় রেনেসাঁ বলা হয়। এই সময়ই মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক আদর্শ, বি(াস ও জ্ঞানের স্থলে এলো মানবতাবাদ, প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। তাই এই সময়কালটি রেনেসাঁ বা জ্ঞানচর্চার পুন(জ্জীবনের যুগ বলেও অভিহিত করা হয়।

ইটালিতেই প্রথম রেনেসাঁর প্রাণবীজ উদ্ভভ হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইটালির যুদ্ধ ভিত্তিক অর্থনীতি। একাদশ শতকের শেষ দশক থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে যে সুদীর্ঘকাল যে ধর্মযুদ্ধ হয় তাতে ইটালিয়ান ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে লাভবান হয় জাহাজ ব্যবহার ও অস্ত্র সরবরাহ করে প্রচুর ধন-সম্পদেরও অর্থের অধিকারী হয়। ইটালিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, তেমনই শিল্প ও বাণিজ্যের ও দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে, যার সুফল ইউরোপের অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। অতি অল্পকালের মধ্যেই রেনেসাঁর প্রেরণা ইটালি থেকে স্পেন, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময়ের পণ্ডিতদের মধ্যে নাটকের সাহিত্যাদর্শ এবং থিয়েটার স্থাপত্য ও কলাকৌশল সম্পর্কে আগ্রহ ল(করা যায়। একাধিক প্র্নের উদ্ভব হয় যথা—

১) নাটকের উদ্দেশ্য কী?

২) নাটক রচনার কোনো রীতি-নীতি আছে কিনা?

৩) কমেডি ও ট্রাজেডির মৌলিক পার্থক্য কোথায়?

এই সকল প্র্নের উত্তরের খোঁজে রেনেসাঁ যুগের পণ্ডিতবর্গ এ্যারিস্টটল ও হোরেসের রচনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত হোরেসের আর্সপোয়েটিকা বা আর্ট অব পোয়েট্রি ১৪৭০ সালে এবং এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স (রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) ১৪৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত ও নির্দেশিত আদর্শমালা দ্বারা রেনেসাঁ যুগের নাট্যসাহিত্য বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

অপরদিকে এই যুগে নাট্য স্থাপত্যকলার অগ্রগতিতে ১৪১৪ সালে ভিট্রুভিয়াসের লেখা ডি আর্কিটেকচুরা (দি আর্কিটেকচার) গ্রন্থটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি পুনরাবিষ্কৃতের পর ১৪৮৬ সালে মুদ্রিত হয় এবং ১৬০০ সালের মধ্যে তার তেইশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মধ্যযুগের নাট্যধারার সঙ্গে সঙ্গে আরো একাধিক নাট্যধারা প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল এন্ট্রিজ (Entries)। প্রাচীন রোমে বিজয়ী সেনাপতির বিরাট শোভাযাত্রা করে নগরে প্রবেশ অনুষ্ঠানকে এন্ট্রিজ বলা হত। রেনেসাঁ যুগেও এইরূপ অনুষ্ঠানের উদাহরণ আছে। এই সকল শোভাযাত্রার জন্য সুসজ্জিত শকট, অস্থায়ী আর্চ বা তোরণ, টাওয়ার, অস্থায়ী মঞ্চ ইত্যাদি তৈরি হত। পথমধ্যে নির্মিত আর্চের ভিতর দিয়ে শোভাযাত্রা অতিত্র(ম করত।

অস্থায়ী মঞ্চ কেবল এন্ট্রিজ উপলে(ই তৈরি হত না, রেনেসাঁ যুগে বহু অভিজাত ব্যক্তি(ও তাদের হলঘরে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে রোমান ধ্রুপদী নাটকের মঞ্চায়ণের ব্যবস্থা করতেন। এই অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চকে বলা হত থিয়েট্রাম (Theatrum / গ্রিক থিয়াট্রন থেকে থিয়েট্রাম, অবশেষে থিয়েটার)। এই থিয়েট্রাম বলতে নাট্যশালা ও প্রদর্শনীগৃহ উভয়কেই বোঝানো হত। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে রেনেসাঁ যুগের শু(তে প্রথম অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েট্রাম কোথায় নির্মিত হয়েছিল।

হলঘরের মঞ্চকে বল(ম মঞ্চ (Ballroom stage) রূপে অভিহিত করা হত। কারণ অভিজাত ব্যক্তি(দের এই হলঘর বলডান্সের জন্যও ব্যবহৃত হত। অবশ্য, থিয়েট্রাম থেকে বল(ম মঞ্চ অনেকটাই ভিন্ন। বল(মে অভিজাতদের নাচ ব্যতীত নানা রকমের পশুর মুখোশ পড়া অভিনেতা কৌতুক অভিনয় করত, হলের মাঝখানে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা একটি চারকোনা মঞ্চে। বল(ম মঞ্চের উৎপত্তি করে কোথায় হয়েছিল তা নিশ্চিত জানা যায় না।

দৃশ্যপটের ব্যবহার কবে কোথায় হয়েছিল এই নিয়েও সংশয় রয়ে গেছে। রেনেসাঁ যুগের জনৈক এক লেখক কার্ডিনাল রাফায়েল রিয়ারিও-র প্রভূত প্রশংসা করেছেন এই মর্মে যে, সম্ভবত ১৪৮৪ থেকে ১৪৮৬ সালের মধ্যে একটি ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গনের উপস্থাপনায় তিনি মঞ্চকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন। লেখক এটাও উল্লেখ করেছেন যে কার্ডিনালই প্রথম অঙ্কিত দৃশ্যপটের ব্যবহার করেছিলেন। তবে ওই দৃশ্যপট যে নাটকের স্থান ও ঘটনার পরিপ্রে(তে যথার্থ ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিনা, সেই বিষয়ে প্র§ রয়ে যাচ্ছে। কারণ ওই যুগে বহু বিখ্যাত চিত্রকর প্রাসাদ হলের অভ্যন্তরের জন্য চিত্রাঙ্কন করেছেন, যেগুলির সাথে ওই হলে অভিনীত নাটকের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৪৮৬ সালে ফেরারা-র ডিউক এরকেলি দ'এস্টের পৃষ্টপোষকতায় প-উটুসের মেনায়েকমি নাটকটি বহিরঙ্গে প্রযোজিত হয় এবং তাতে পাঁচটি দূর্গবিশেষ গৃহ সহ কাঠের মঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছিল। আরো জান যায় যে মঞ্চে একটি মাস্তুল ও বৈঠাসহ জাহাজ আনা হয়, তাতে দশজন লোকও ছিল। ১৪৯১ সালে মেনারেকমি পুনরায় হলঘরে মঞ্চস্থ হয়, তাতে শিল্পী নিকোলো ডেলকোগো চারটি দূর্গের দৃশ্যরূপ অঙ্কন করেন। জানা যায় মিলানের রাজকীয় থিয়েটার ইল প্যারাডিসো নাটকের জন্য লিওনার্ডো দ্যা ভিঞ্চি ১৪৮৯ সালে একটি পর্বতশৃঙ্গের দৃশ্যরূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, যা কিনা দুই ভাগে বিভক্ত(হয়ে গিয়ে পিছনের আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্গকে উন্মোচিত করেছিলেন। ওই সময় শুধু লিওনার্ডো নয়, রাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো প্রমুখ শিল্পীরাও কোর্ট থিয়েটারের জন্য দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন।

রেনেসাঁ যুগের চিত্রকলায় পরিপ্রে(তের (perspective) আবিষ্কার চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এক বিপুল ও বহুমুখী সম্ভাবনা সৃষ্টি করল, থিয়েটারের দৃশ্যপটের (ত্রেও এর প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিল। চিত্রকলায় পরিপ্রে(ত ঠিক কবে, কখন বা কার দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগেই এর ব্যবহার ল(্য করা যায়। তারপর থেকেই চিত্রশিল্পে পরিপ্রে(ত এক বিপ-ব স্বরূপ গণ্য হতে থাকে।

থিয়েট্রামে বা হলঘরে ব্যবহৃত দৃশ্যপটের সূচনা থেকে প্রসিনিয়াম আর্চ মঞ্চের স্থাপনা পর্যন্ত দৃশ্যপট, কারিগরী যন্ত্রাদি, নাট্যগৃহ প্রভৃতি বহু বিষয়ে পরী(া-নিরী(া হয়েছে। ত্রিশ বছরের কম সময়ের ব্যবধানে (১৪৮৬ থেকে ১৫১৪) মঞ্চ উপস্থাপনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেল। মধ্যযুগের টুকরো টুকরো হাউসের বিন্যাস থেকে পাশাপাশি সংবদ্ধ হাউস যা কিনা একটি ইউনিট রূপে প্রকাশিত হল। সেখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে র(ত অথচ গভীরতা বিহীন দৃশ্যপট এবং সবশেষে প্রে(ত ও গভীরতা সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থায় মঞ্চের পিছনে অঙ্কিত দৃশ্যপটের আগমন ঘটল।

এই সময়কার অন্যতম মঞ্চ ও দৃশ্য-পরিকল্পক ছিলেন সেবাস্টিয়ানো সার্লিও। পে(জির শিষ্য সার্লিও নিজেও একজন স্থপতি ও চিত্রকর ছিলেন। ভিট্রুভিয়াসের বক্ত(ব্য বি(-ষণ করে ১৫৪৫ সালে তাঁর আর্কিটেকচুরা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে তিনি প্রাচীন নাট্যগৃহ এবং তার সমসাময়িক কালের নাট্য উপস্থাপনা সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত(করেন। কী ভাবে একটি থিয়েটারগৃহ নির্মাণ সম্ভব ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা রূপায়ণ হতে পারে সেই বিষয়ে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

১) নাট্যগৃহ ও মঞ্চ মূলত আয়তকার (rectangular) হলঘর, যার একদিকে মঞ্চ ও মঞ্চের উল্টোদিকে দর্শকদের বসবার আসন। রোমান নাট্যগৃহ 'কোভিয়া' (Cavea) অনুসরণ করে সার্লিও দর্শকদের বসবার আসন ব্যবস্থা করেছিলেন।

২) ভিট্রুভিয়াসের বর্ণনা অনুসারে তিনি তিন প্রকারের সেটিং-এর ব্যবহার করেছেন যথা— ট্র্যাজিক, কমিক ও স্যাটুরিক। সার্লিও-র ট্র্যাজিক সেটে ছিল বড় বড় রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, কমিক সেটে ছিল সাধারণ গৃহ এবং স্যাটুর ছিল পাহাড়-পর্বত, কুটির ও বৃ(শ্রেণীর দৃশ্যাবলি।

৩) সার্লিও মূলত রোমান সময়কালের অভিনয় প্ল্যাটফর্মকেই অনুসরণ করেছেন। যার আকার দর্শকদের সম্মুখে অপ্রশস্ত অভিনয় এলাকা সম্পন্ন সমতল মঞ্চ। এই অপ্রশস্ত অভিনয় এলাকার পিছনেই স্থাপিত হল ঢালু প্ল্যাটফর্ম, পেছন দিকে কিছুটা উঁচু সামনের দিকে ঢালু। মঞ্চ স্থাপত্যের ইতিহাসে যাকে রেইকড (raked stage) নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

সার্লিও রেইকড প্ল্যাটফর্ম বা স্টেজ সম্পর্কে 'দি লিভিং স্টেজ গ্রন্থে' বর্ণনা করেছেন যে, সেই যুগের সেটিং-এর অঙ্কিত দৃশ্য ত্রিমাত্রিক পরিপ্রে(তের (three dimensional perspective) ভ্রম সৃষ্টি করত। উইং-এর উপরের দিকটা বাঁকা করে কাটা থাকত এবং তাতে যা আঁকা থাকত, তাতে এমন ভ্রম উদ্রেককারী পরিপ্রে(ত (false perspective), যাতে দিগন্ত রেখাই পিছনে ও নীচের দিকে হেলে গিয়ে সর্বপশ্চাতে অঙ্কিত দৃশ্যপটের বিলুপ্তি বিন্দুতে (Vanishing point) মিলিয়ে যেত। সার্লিও ভ্রম উদ্রেককারী পরিপ্রে(তকে যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ রূপদান করার জন্যই রেইকড স্টেজের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। আমাদের মঞ্চের শব্দ ভাণ্ডারে আপস্টেজ (up-stage) ও ডাউন স্টেজ (down-stage) শব্দ দুটি সার্লিওর রেইকড স্টেজ থেকেই এসেছে। তার কারণ রেইকড স্টেজে মঞ্চের পিছন দিকটা উঁচু ও সামনের দিকটা নিচু। এই প্রকার ঢালু মেঝে সম্পন্ন মঞ্চ আজও ইউরোপের অনেক পুরোন থিয়েটার দেখা যায়।

রেনেসাঁ যুগের ইটালির প্রথম উল্লেখযোগ্য স্থায়ী নাট্যগৃহ ভিসেঞ্জা শহরের অলিম্পিক একাডেমির উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত টিয়াট্রো অলিম্পিকো (Teatro Olimpico)। রোমান ক্ল্যাসিক্যাল রীতি অনুসরণে তৈরি এই কাঠের নাট্যগৃহটি আজও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ১৫৮০ সালের ২৩ মে দ(স্থপতি আনড্রিয়া প্যালাডিও এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজ শু(করেছিলেন। কিন্তু ওই বছরই আগস্ট মাসে তিনি মারা যাওয়া স্থপতি ভিনসেঞ্জো স্কামোজ্জি এর দায়িত্ব গ্রহণ করে নাট্যগৃহটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন ১৫৮৪ সালে। এর পরের বৎসর ১৫৮৫ সালের ৩রা মার্চ ইটালিয়ান ভাষায় সোফোক্লেসের ঈডিপাস মঞ্চায়নের দ্বারা টিয়াট্রো অলিম্পিকের উদ্বোধন হয়।

সাবিওনেটার থিয়েটার সম্ভবত স্থপতি গিয়ামবাতিস্তা আলেওত্তিকে প্রভাবিত করেছিল। সাবিওনেটা থেকে কুড়ি মাইল দূরে পার্মার প্রিন্সের নির্দেশে প্রাসাদ অঙ্গনে টিয়াট্রো ফার্নেসের (Teatro Farnesse) পরিকল্পনা করেন। তিনি মঞ্চে একটি মাত্র তোরণ রাখলেন। অডিটোরিয়াম হলে সেই সময়ের মতো করে অ(র্ধ) রাকৃতি আসন (raised seats) বিশিষ্ট গ্যালারির মতো দর্শকাসন তৈরি করলেন। প্রায় তিন হাজার দর্শক এখানে বসতে পারত। মঞ্চ ও দর্শকাসন সারির মধ্যে অনেকটা জায়গা নিয়ে অর্কেস্ট্রা তৈরি করলেন, যেখানে নানা প্রকার অনুষ্ঠান হত। এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে, কোনো একটি অনুষ্ঠানে নৌকা ভাসানোর জন্য সমগ্র অর্কেস্ট্রা জল দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টিয়াট্রো ফার্নেসের মঞ্চ স্থাপত্যে প্রথম স্থায়ী প্রসিনিয়াম আর্চ ব্যবহার হল। আর্চের পিছনে বড়ো বড়ো আকারের দৃশ্যপট পরিবর্তনের জন্য ফ্ল্যাট উইং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। এতদিন পর্যন্ত আর্চ বা তোরণের সামনে অভিনয় হত, টিয়াট্রো ফার্নেসের মঞ্চে আর্চের পিছনে অভিনয় করা শু(হয়। প্রসিনিয়াম যেমন প্রশস্থ, তেমনই মঞ্চের গভীরতাও বৃদ্ধি পেল। ১৬১৮ সালে (মতান্তরে ১৬১৯) পার্মার টিয়াট্রো ফার্নেসের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এইখানে প্রথম দিকে কোনো সম্মুখ পর্দা ব্যবহার করা হয়নি। প্রসিনিয়াম আর্চের এই বিবর্তন শুধুমাত্র মঞ্চ স্থাপত্যের জন্য হয়েছিল এমনটা নয়, অভিনয় রীতির পরিবর্তনের কারনেও ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আর্চের সামনে অভিনেতারা যথেচ্ছ বিচরণ করত। আর্চের পিছনে অভিনয়ের ফলে এবার আমরা প্রসিনিয়াম ফ্রেম পেলাম। অভিনেতাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ মঞ্চ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। রেনেসাঁ যুগের এই প্রসেনিয়াম আর্চের বিবর্তন আমাদের নাট্যশিল্পকে অনেক বেশি বাস্তববাদী করে তুলল।

ইউরোপে গ্রীস ও রোমান নাট্যচর্চার থেকে রেনেসাঁ পর্যন্ত নাটকে মঞ্চ স্থাপত্যর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যসজ্জারও বিকাশ ঘটতে থাকে। এই ত্র(মবিকাশ আমাদেরকে বাস্তববাদী মঞ্চসজ্জার দিকে নিয়ে যায়। এই যাত্রার মঞ্চ স্থপতি ও চিত্রশিল্পীদের অবদান রয়েছে। ১৫৫১ সালে শিল্পী সেবাষ্টিয়ান সার্লিও শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর একটি বই-প্রকাশ করেন। এই বইয়ের একটি অধ্যায় ছিল বিপ-বোত্তর ইটালীয় রঙ্গমঞ্চে মঞ্চশিল্পের আলোচনা। ১৬৬১ সালে এই বইটি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ হয়। এরফল স্বরূপ ইংল্যাণ্ডের মঞ্চ শিল্পে বিশেষ করে দৃশ্য সংযোজনার (ত্রে, শিল্পী সার্লিও-র বই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আজকের সময়ে প্রচলিত সহজ বহন যোগ্য হাল্কা গঠনের দৃশ্যপটের ব্যবহার করে, কোথায়, কখন বা কার দ্বারা প্রথম শু(হয়েছিল তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৬৩০ সালের বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে গ্যালি-বিবিয়েনা পরিবার, ইনিগো জোন্স ও পীরানীজের নাম পাওয়া যায়। এই সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মঞ্চের দৃশ্যপটের প্রাধান্যের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই পর্যায়ের শেষের দিকে বাস্তববোধ ফোটানোর আগ্রহে অতিশয্য, দৃশ্যপরিকল্পনাকে আলোকচিত্রের মতো সর্বাঙ্গীন নিখুঁত করতে গিয়ে, মঞ্চসজ্জা প্রচণ্ড জটিল করে তোলা হতো যে, অভিনেতার অভিনয়ের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে উঠতো। গর্ডন ত্রে(গ ও এডল্ফ আপিয়া এই অতিশয্যকে সরিয়ে প্রয়োজন অনুপাতে মঞ্চসজ্জা করে অভিনেতার অভিনয়ের জন্য জায়গা করে দিলেন। আধুনিক মঞ্চসজ্জার ইতিহাসে এই দুইজন পথিকৃত। নাটকের দৃশ্যসজ্জা গড়ে তুলবার জন্য কতগুলি বিশেষ বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়।

১) চিত্র সৃষ্টির দিক নাট্যশিল্প একটি দৃশ্য-শ্রাব্য শিল্প মাধ্যম। দর্শক নাটক দেখতে ও শুনতে আসেন। অর্থাৎ একটি অন্ধকার রাত্রির দৃশ্যে একটি চরিত্র হোঁচট খাচ্ছে—এই দৃশ্য মঞ্চায়িত করবার সময় যত কম আলো ব্যবহার করিনা কেন, আলো এমন উজ্জ্বলতা এমন রাখতেই হয় যাতে একদম শেষ প্রান্তের দর্শক ও দেখতে পায়। ফলত এই আলোর মাঝে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কল্পনা অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও করে থাকে। রঙ্গপীঠের অর্থাৎ মূল অভিনয় স্থলের তিন দিকের দৃশ্যপট ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা থাকে, কিন্তু একদিক মুক্ত(থাকে, যাকে আমরা মঞ্চ মুখ বলে থাকি। অর্থাৎ চতুর্থ দেওয়ালটি অনুপস্থিত। দর্শক যেন চুপিসারে এই চতুর্থ দেওয়াল সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছেন। ফলত নাট্য প্রযোজকদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে এই চিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে স(ম হওয়া। এবং যার মধ্যে দিয়ে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে একটি সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২) সঠিকতার দিক নাটক অনুসারে ঘটনার স্থান ও কাল সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে দৃশ্যপটের মাধ্যমে। এটা শুধু দর্শকদের জন্য নয় অভিনেতার জন্যও প্রয়োজন হয়। একটি দৃশ্যে এক অভিনেতা একটি পুড়ে যাওয়া প্রাচীন রাজবাড়ীতে নিজের অতীতকে দেখতে পাচ্ছে বা একজন পর্বতারোহীর আরোহন পর্ব দেখাতে হলে উপযুক্ত(পটভূমি প্রয়োজন হয়।

৩) দৃষ্টি বি(প যে কোনো নাটকের ঘটনাবৈচিত্রের প্রয়োজনে দৃশ্যসজ্জায় বৈচিত্র আসতে বাধ্য। বিচিত্র দৃষ্টিকোন, বিচিত্র বর্ণসমারোহ, বিভিন্ন প্রকার বস্তুর সমাহার, আলোক চিত্রনের বৈচিত্রের তারতম্য, এই সবই আসে নাটকের প্রয়োজনে। কিন্তু ল(্য রাখতে হবে এই বৈচিত্র যত সুন্দর, যতই কৌশলপূর্ণই হোকনা কেন, অবাঞ্ছিত সময়ে এটি দর্শকদের চিত্তবিভ্রম তথা দৃষ্টি বি(প ঘটাতে পারে। একটি জাঁকজমক পূর্ণ রাজসভার দৃশ্যে এত নিখুঁত মঞ্চসজ্জা হল, যে দর্শক অভিনেতাদের ভুলে গিয়ে শুধু মঞ্চসজ্জায় মনোনিবেশ করে বসল। এটা একেবারেই কাম্য নয়।

৪) প্রাধান্য আরোপ   মঞ্চের বিশেষ বিশেষ স্থান নাটকের ঘটনা প্রবাহের দাবীতে প্রাধান্য লাভ করে। দরজা, জানালা, আসবাবপত্র এমনকি একটি ছোট ফুলদানীও এই জাতীয় প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। এই বিষয়ে দৃশ্য পরিকল্পক তথা প্রয়োজককে খুবই যত্নবান হতে হয়।

৫) মনস্তাত্বিক আবেদন   সার্থক দৃশ্যসজ্জার মধ্যে দিয়ে নাটকে স্থান-কালের সঙ্গে নাটকের মনস্তাত্বিক দিকটিও প্রকাশিত করা হয়। অধিকাংশ ৫(ত্রেই তুলনামূলক বিষয় বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয়। নাটকের কোনো চরিত্রের নিঃসঙ্গতা বোঝাতে ফাঁকা মাঠ বা ওই মাঠে একটি পাতা ঝড়া গাছকে দিয়ে ওই চরিত্রের মনস্তত্ব প্রকাশ ঘটানো হয়ে থাকে। অনেক ৫(ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উপমার সাহায্য নেওয়া হয়।

৬) পরিবেশ সৃষ্টি   নাট্য পরিবেশনায় দৃশ্যসজ্জা সাধারণ ভাবে ব্যবহার করা হয় দৃশ্যপট, পর্দা এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলিকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'দৃশ্যসজ্জা' বলতে আমরা অভিনয় চলাকালীন অভিনেতাকে ঘিরে থাকা যাবতীয় বস্তুর সমাহারকে বোঝায় এর মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা, আলো এমনকি সঙ্গীতের প্রয়োগকেও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। দৃশ্যসজ্জা কথাটির এই ব্যাপক অর্থকে গ্রহণ করলে, দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজনীয়তা বলতে বোঝাবে নাটকের ঘটনাপ্রবাহের জন্য উপযুক্ত(পরিবেশ সৃষ্টি। নাটকের মুখ্যভাব যা অভিনেতার কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তাকে বর্ণ, রেখা, বস্তুর গুণাগুন, ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটানোই, পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান ল(্য।

৭) পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা   দৃশ্যসজ্জার দ্বারা যেকোনো নাট্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে এই পরিবেশ সৃষ্টি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলি যথাত্র(মে— ক) ঘটনার স্থান ও কাল নির্দেশ, খ) চরিত্রের তথা নাটকে অন্তর্নিহিত ভাবটিকে প্রকাশ করা, গ) সামগ্রিক ভাবে একটি দৃষ্টিনন্দন পশ্চাৎপট সৃষ্টি করা।

এই দৃশ্যসজ্জা নাটকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এই প্রকাশভঙ্গীগুলি নানা প্রকারের হতে পারে, যথাত্র(মে—

১) বাস্তবানুগ

২) ইঙ্গিতধর্মী

৩) ভাবধর্মী

৪) বিন্যাসধর্মী

এই দৃশ্যসজ্জা প্রকাশের সময় মঞ্চশিল্পীকে বিশেষভাবে কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা স্মরণে রাখতে হবে। বিষয়গুলি হল যথাত্র(মে— ক) আকর্ষণ, খ) প্র(পণ, গ) সরলতা, ঘ) ব্যবহারোপযোগিতা, ঙ) সম্ভাব্যতা, চ) ঐকতান।

পরিশেষে বলতে হয়, ভালো দৃশ্যপট তৈরি করতে বিভিন্ন বিষয়কে স্মরণে রেখে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। যেকোনো নাটকের অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি একটি সৃজনশক্তি(র পরিচায়ক হয়। তবে নিশ্চয় ল(্য রাখতে হবে, দৃশ্যপট যেন নাট্য ঘটনা প্রবাহের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার না করে, তার অনুগামী হয়ে চলে।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র—নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-১

নাট্যকলা, অভিনয়কলা অনুশীলন ও পাঠ

বিন্যাসক্রম :

- ৪০৪.২.১.১ : প্রস্তাবনা
- ৪০৪.২.১.২ : সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য
- ৪০৪.২.১.৩ : দেশজ নাট্য
- ৪০৪.২.১.৪ : ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য
- ৪০৪.২.১.৫ : নাট্যকলার বিবিধ প্রকরণ
  - (ক) অঙ্গরচনা
  - (খ) আলোক পরিকল্পনা
  - (গ) পোশাক পরিকল্পনা
  - (ঘ) মঞ্চ পরিকল্পনা
  - (ঙ) মঞ্চ নকশা
  - (চ) মঞ্চসঙ্গীত
- ৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

■ ৪০৪.২.১.১ : প্রস্তাবনা

নাট্যকলা যেকোন ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সামনে কোন ক্রিয়া উপস্থাপনকেই 'নাট্য' বলা যেতে পারে। এটি শিল্পমাধ্যমের (পারফর্মিং আর্ট) একটি শাখা। দর্শক বা শ্রোতার জন্য যেকোনো পরিবেশনাকে (পারফর্মেন্সকে) নাট্যকলা হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও পারফর্মিং আর্ট হিসেবে নাট্যকলা বিশেষভাবে জোর দেয় সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সৃষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকের ওপর। একটি পরিবেশনাকে নাট্যধর্মী বা নাটকীয় বলা যেতে পারে যদি তা বাস্তবানুগ মায়া বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এই দুইটি বিস্তারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায় যে নাট্যকলার অস্তিত্ব ছিল মানবসভ্যতার প্রত্যূষকালেও, কারণ গল্প বলার একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত প্রবণতা প্রতিটি মানুষে বিদ্যমান। সূচনাকাল থেকেই নাট্যকলা অনেকরকম রূপ বা প্রকার ধারণ করেছে; প্রয়োগ করেছে অনেক রকম কথা, দেহভঙ্গি, গান, নাচ, দৃশ্য বা ঘটনা। দৃশ্যগ্রাহ্য কলাসহ (চিত্রাঙ্কণ, ভাস্কর্য ইত্যাদি) অন্যান্য পারফর্মিং আর্টগুলোকে নাট্যকলা একত্রিত করেছে একটিমাত্র সমন্বিত শিল্পের প্রকারে। উল্লিখিত উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্ধারিত এবং লিখিত পাঠভিত্তিক, অথবা হতে পারে তাৎক্ষণিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমনকি এ দুয়ের মধ্যে থাকতে পারে অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। নাটক সৃষ্টিতে গঠন-কৌশল বিচারে দ্বন্দ্ব কোন অপরিহার্য উপাদান নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে বাংলাদেশের নাট্যরীতির ক্রমবিকাশ বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এবং এর সঙ্গে পরবর্তীতে কিছু মাত্রায় ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণ লক্ষণীয়। নাট্যকলার ক্রমবিকাশ তিন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে : সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য, দেশজ নাট্য এবং ইউরোপীয় রীতি প্রভাবিত নাট্য।

■ ৪০৪.২.১.২ : সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য

সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য প্রাচীন যুগ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাংলার বৃহদংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলে উত্তর গাঙ্গেয় আর্যসংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কারণে গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রগুলিতে এ সময় শিল্প-সংস্কৃতি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর ফলে উল্লিখিত নগরকেন্দ্রগুলিতে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যচর্চা বিশেষভাবে বিত্তবান শ্রেণির সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুথিগত সাক্ষ্য থেকেও এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী (৬ষ্ঠ শতক) রচিত সংস্কৃত নাটক লোকানন্দ-এর নাম উল্লেখ করা যায়। প্রস্তাবনাসহ এ নাটকটি চার অঙ্কে রচিত। লোকানন্দ সম্পর্কে ই-ৎসিঙ মন্তব্য করেন, ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যের সকল মানুষ গীত ও নৃত্য সহযোগে নাটকটি পরিবেশন করেন। এ থেকে নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমেয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা অথবা তার অংশবিশেষের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ সময় উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা, কনৌজরাজ যশোবর্মা এবং কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বাংলার অঞ্চলবিশেষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার হর্ষবর্ধনের নাগানন্দ এবং যশোবর্মার সভাকবি ভবভূতির মালতীমাধব নাটক এ সময় রচিত হয়। হয়তো রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই তখন এ সকল নাটক বাংলার প্রশাসনিক নগরকেন্দ্রগুলিতে অভিনীত হয়েছিল। এ ছাড়া কাশ্মীরী কবি কলহন রচিত রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পৌণ্ড্রনগরে কার্তিকেয়ের

মন্দিরে কমলা নামের সুন্দরী ও দক্ষ নৃত্যশিল্পীর অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ অভিনয় ভরতমুনিকৃত নাট্যশাস্ত্র (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) অনুসৃত ছিল। পালযুগের নাট্যচর্চা সম্পর্কে যে কয়েকটি পুথিগত সাক্ষ্য মেলে, তন্মধ্যে সতেরো শতকের তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য : (বিক্রমপুর) নগরে তিনি (আচার্য অনুপম সাগর) একটি উৎসবে নাট্য প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর ফলে তিনি সমাধি লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন ইহজগতে সব কিছুই মায়া।

সেন রাজারা সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত অভিনয়রীতির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা বিজয়সেন (আণুমানিক ১০৯৬-১১৫৯) এবং ভবদেব ভট্ট (রাজা হরিবর্মার মন্ত্রী) বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দেবদাসী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ঐতিহ্যানুসারে ধ্রুপদী নৃত্য ও গীতে পারদর্শী এ সকল দেবদাসী রাজদরবারের সভাসদবৃন্দের জন্য এবং মন্দির প্রাঙ্গণে জনগণের জন্য অভিনয় করতেন। এ যুগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে 'নট' (অভিনেতা) নামে একটি পৃথক বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হলায়ুধ মিশ্র রচিত ঐতিহাসিক কাব্য সেখশুভোদয়া সেন রাজসভায় নট ও নর্তকীর উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা-য় লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গন্ধর্ব নামের এক অভিনেতার অভিনয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। গোবর্ধন আচার্য রচিত আর্যাসপ্তশতীর ১৭৪ এবং ৫৩৮ সংখ্যক শ্লোকে 'অভিনয়', 'যবনিকা', 'নর্তকী', 'নায়ক', 'নায়িকা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, সেন রাজদরবারে সংস্কৃত নাট্যচর্চার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

লোচন পণ্ডিত রচিত সঙ্গীতবিষয়ক রাগতরঙ্গিণী (১১৬০) গ্রন্থে তম্বরুনাটক-এর উল্লেখ রয়েছে। তম্বরুনাটক সম্ভবত ১১৬০-এর পূর্বে রচিত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ছিল, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু এ যুগের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ (১২শ শতক)। জয়দেব এখানে তৎকালীন জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের বিষয়বস্তুটিকে 'নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ' নামক সংস্কৃত নাট্যকাঠামোর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ফলে এমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে বাংলার দেশজ নাট্যে 'নাটগীত' নামক এক জনপদ নাট্যরীতির প্রচলন ঘটায়। গীতগোবিন্দ এবং আর্যাসপ্তশতী লক্ষ্মণসেনের রাজদরবারে দেবদাসী কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অভিনয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। বারো খণ্ডে রচিত গীতগোবিন্দে তিনটি চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ ও সখী) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এগুলি তিনজন অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পী দ্বারা উপস্থাপনা করা যেতে পারে (যেমন মণিপুরী রাসনৃত্যে এখনও করা হয়), কিংবা একজন শিল্পী দ্বারাও উপস্থাপিত হতে পারে। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনায়ও অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পিগণ গীতসহযোগে আঙ্গিক অভিনয়যুক্ত নৃত্য পরিবেশন করতেন। দুটি গীতের মাঝে কখনও কখনও সূত্রধারের আবির্ভাব ঘটত বিশেষ কোন অংশ কাব্যে বর্ণনা করার জন্য, যেমন কখনও অভিনীত ক্রিয়ার অংশ বর্ণনার জন্য, কখনও সেই ক্রিয়ার ওপর মন্তব্য করার জন্য, কিংবা চরিত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অথবা তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনা রীতির সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য উপস্থাপন রীতির বৈশিষ্ট্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু নেপালি রাজদরবারে অভিনীত সঙ্গীত-নাটকসমূহের উপস্থাপন রীতির সঙ্গেও গীতগোবিন্দ উপস্থাপন রীতির আশ্চর্য মিল রয়েছে। তেরো শতকের কোন এক সময় সাগরনন্দী সংস্কৃত ভাষায় নাটকলক্ষণরত্নকোষ রচনা করেন। এতে একাধিক নাটকের নাম দেখা যায়, যেগুলির কোন পুথিগত অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু রত্নকোষের অস্তিত্ব এবং এতে নাটকের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রচলন ছিল।

ত্রয়োদশ দশকের প্রথমার্থে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলায় সংস্কৃতি নাট্যচর্চার ধারা ব্যাহত হয়। পরবর্তী কিছুকাল কেবলমাত্র হিন্দু রাজ্যে ও হিন্দু সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধারার চর্চা ক্ষীণ অবস্থায় অব্যাহত থাকে।

চৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য রূপগোস্বামী তিনটি সংস্কৃত নাটক (বিদগ্ধমাধব-১৫২৪, ললিতমাধব-১৫২৯, দানকেলিকৌমুদী-১৫৪৯) এবং একটি নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ (নাটকচন্দ্রিকা) রচনা করেন। চৈতন্যশিষ্যদের দ্বারা কমপক্ষে আরও তিনটি নাটক রচিত হয়; রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং গোবিন্দদাসের সঙ্গীতমাধব। রূপগোস্বামী এবং রামানন্দ রায় রচিত নাটকসমূহ সবই কৃষ্ণকাহিনীভিত্তিক। এ সকল নাটকের মধ্যে কেবল জগন্নাথবল্লভ অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায়। সতেরো শতকে গোবিন্দদাসের নাটক ছাড়া সবই বাংলায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদগুলির কোনটি অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায় না।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩) সংস্কৃত নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রের অসমাপ্ত চণ্ডী নাটকে (১৭৬) সংস্কৃত উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটি 'মহিষাসুর বধ' শীর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যানভিত্তিক। কাব্যাকারে রচিত এ নাটকটির সংলাপদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এটি সম্পূর্ণরূপে গীত-আকারে পরিবেশনের জন্য রচিত, যদিও নাটকটি কখনও অভিনীত হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একই বৈশিষ্ট্যের অপর একটি নাটক বিদ্যানাথ বাচস্পতি রচিত চিত্রযজ্ঞ ১৭৭৭/৭৮ সালে অভিনীত হয়েছিল।

আধুনিক যুগ উনিশ শতকে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল (১৮৪৮) ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (১৮৪৯) উল্লেখযোগ্য। বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আধুনিক যুগে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচনাও করেন। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চানন তর্করত্নের অমরমঙ্গল (প্রকাশিত আনুমাণিক ১৯১৩), কালীপদ তর্কাচার্যের নলদময়ন্তীয় ও সামন্তকোদ্ধার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর কীর্তিবিলাস-এ নান্দী, সূত্রধার ও নটীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত প্রথম মঞ্চায়িত বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত কুলীনকুলসর্বস্ব (রচনা ১৮৫৪, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৭) নান্দী, সূত্রধার ও নটী ব্যবহারের কারণে সংস্কৃত ঐতিহ্যের নিকট ঋণী।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত নাট্যরীতি সমসাময়িক সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণের ক্ষেত্রে দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য বাংলা নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় এ সময়ের সাহিত্য জগতের পুরোধা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা নাট্যে ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত আধুনিক নাট্য সৃজনের ক্ষেত্রে সার্বিক ভূমিকা পালন করেন।

■ ৪০৪.২.১.৩ : দেশজ নাট্য

দেশজ নাট্য সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য থেকে ভিন্ন দেশজ নাট্যধারা সবসময় জনগণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি তাদের দ্বারাই সৃজিত ও লালিত। তবে সংস্কৃত নাট্যের সূক্ষ্মতার সৃজনশীলতা দ্বারা এটি সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলায় উদ্ভূত সকল প্রকার নাট্যরীতিকে দেশজ নাট্য আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যা সাধারণত লোকনাট্য হিসেবেও পরিচিত। দেশজ নাট্যের কলাকুশলিবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, যন্ত্রশিল্পী এবং পুতুল নাচিয়ে। এঁদের অভিনয় উপস্থাপনায় কেবল গদ্য সংলাপ নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, বচন (সংলাপাত্মক কাব্য/গীত এবং বর্ণনাত্মক গদ্য/কাব্য/গীত)। বাংলাদেশের দেশজ নাট্য বিভিন্ন

বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছে, যাকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : বর্ণনাত্মক, নাটগীত, অধি-ব্যঞ্জনাত্মক এবং শোভাযাত্রামূলক ও তদুদ্ভূত অভিনয় উপস্থাপনা।

বর্ণনাত্মক রীতি বর্ণনাত্মক নাট্যে কথক (গায়েন) একাই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনা করেন এবং নাট্যক্রিয়া অভিনয় করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গদ্য, পদ্য ও গীতের মিশ্রণে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর দোহারবৃন্দ, যাঁরা ধুয়া ধরেন এবং বাদ্যযন্ত্র বাজান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথক গানের সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশন করেন। কোন কোন ধর্মীয় অভিনয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি হাতে চামর ব্যবহার করেন। চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনিক অলঙ্কার প্রয়োগ করেন। তাঁর এই রূপদান সার্থক করার জন্য কখনও কখনও তিনি তাঁর মূল পোশাক ইষৎ পরিবর্তন করেন এবং কিছু দ্রব্যসম্ভার (property) ব্যবহার করেন।

চর্যাপদ বাংলায় বর্ণনাত্মক নাট্যের প্রাচীনতম সাক্ষ্য। খ্রিস্টীয় ৯ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত এই পদসমূহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চর্যাপদ উপস্থাপিত হতো। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নাথপন্থীদের মধ্যে বর্ণনাত্মক রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের ইঙ্গিত প্রদান করে। এ সকল অভিনয় উপস্থাপনা মৌখিকভাবে সৃষ্ট নাথগীতিকা অবলম্বনে পরিবেশিত হতো। নাথগীতিকায়। বিধৃত কাহিনীসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায় : (ক) নাথ সিদ্ধাচার্যদের উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর গুরু মীননাথকে জাগতিক বাসনার মায়াজাল তেকে উদ্ধার বিষয়ক এবং (খ) রানী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র (কিংবা গোপীচন্দ্র) বিষয়ক। ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনীকেন্দ্রিক বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির জন্ম এগারো শতকের কিছু পরেই, যখন এ কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আর গোরক্ষনাথ-মীননাথ বিষয়ক কাহিনীর অভিনয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন এক সময় প্রচলিত হয় বলে অনুমান করা হয়। সতেরো শতক কিংবা তার পরে অনুলিখিত ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্ম এবং তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনুমান করা হয় যে, বারো শতকে এ সম্প্রদায়ের উৎসব উদ্যাপনকালে মৌখিক কাহিনীভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হতো।

জনগণের মধ্যে এখনও এমন কিছু লোককাহিনী (যেমন : মধুমালার কেচ্ছা, সখীসোনা, মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা, শীত-বসন্ত কাঞ্চনমালা এবং মালতীকুসুমমালা) ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যেগুলির ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল বারো শতক কিংবা তার পূর্বে। এগুলির কাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছু কিছু কাহিনী এখনও বাংলাদেশে অভিনীত হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কাহিনীর কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন রায়মিত্রকৃত ঠাকুরমার ঝুলি উল্লেখযোগ্য। মূলত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য কাহিনী রচিত হয় তাদের সম্মুখে পরিবেশন ও শ্রবণের জন্য, পাঠের জন্য নয়। আর কোন কাহিনী মুখস্থ রাখার সর্বোৎকৃ,ট উপায় হলো তাকে ছন্দোবদ্ধ করা। সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালে ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনীসমূহ মৌখিকভাবে অন্ত্যমিলযুক্ত কাব্যরূপে রচিত এবং বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো।

দ্বাদশ শতকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এবং তেরো শতকে মুসলমান অভ্যুদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলার জনপদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম, নাথপন্থী ও ধর্মঠাকুর পূজারী সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানসমূহের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কর্তৃক আত্তীকৃত হয়, কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কিছু রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে একাধিক অভিনয় উপস্থাপনা

বাংলার লোকনাট্যে যুক্ত হয়। বিষয়বস্তুর বিচারে এ সকল অভিনয় উপস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আর্য দেব-দেবী পৌরাণিক বীরদের কাহিনী; (খ) মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত অনার্য দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কাহিনী এবং (গ) ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর ও সাধু পুরুষদের কাহিনী। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনীর ঐতিহ্য পূর্বের ন্যায় অব্যাহত ছিল, যা উপর্যুক্ত তিনটি ধারা দ্বারা অধিকতর পুষ্ট হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল গীতনির্ভর। অতএব, আলোচ্য যুগের সাহিত্য রচনা কেবলমাত্র পঠন ও বিশ্লেষণ নিমিত্তে রচিত সাহিত্য কর্ম নয়, বরং মৌলিক কারণেই তা নাটলিপি হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

আমরা জানি শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণে ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হয়। এই রচনা মধ্যযুগের ঊষালগ্ন থেকেই কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানের মৌলিক রচনা অবলম্বনে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনার ইঙ্গিত বহন করে। পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বাল্মীকিকৃত রামায়ণের অনুবাদ থেকেও সঙ্গত কারণেই অনুমেয় যে, তেরো ও চোদ্দ শতকে মৌখিকভাবে রচিত রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা বিষয়ক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ঘটেছিল।

ষোলো শতকের শুরুতে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাংলার দেশজ নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৫৭৬ কিংবা তার কিছু পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ খেতুরের মহোৎসব লীলাকীর্তন প্রবর্তন করেন। এর স্রষ্টা নরোত্তম দাস রাধা-কৃষ্ণের একেকটি লীলাভিত্তিক বিচ্ছিন্ন পদাবলি সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী তৈরি করেন। বাংলায় প্রচলিত বর্ণনাত্মক রীতির মাধ্যমে এ কাহিনী পরিবেশনার প্রয়াসই লীলাকীর্তন। নরোত্তম দাস বাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সংশ্লেষ ঘটিয়ে লীলাকীর্তনের অদ্বিতীয় সাঙ্গীতিক ধারা প্রবর্তন করেন।

বিজয় গুপ্ত রচিত পদ্মাপুরাণ (১৭৯৪) এবং বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসাবিজয় (১৪৯৫) পনেরো শতকে সর্পদেবী মনসাকে কেন্দ্র করে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে। এ থেকে যথার্থই অনুমিত হয় যে, লিখিত আকারে নাটলিপি রচিত হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ তেরো ও চোদ্দ শতকে বাংলায় মৌখিকভাবে সৃষ্ট কাহিনীসমূহ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো। ষোলো শতক থেকে মনসার কাহিনী অবলম্বনে বেশ কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। তন্মধ্যে নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণ (ষোলো শতকের প্রথম ভাগ) ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (সতেরো ও আঠারো শতকের সন্ধিকাল) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সকল লিখিত রচনা ছাড়াও এ সময়ে মনসামঙ্গল ভিত্তিক বেশ কিছু মৌখিক রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে রয়ানি গান নামে অভিনীত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের জানকীনাথকৃত অভিযোজিত রূপ উত্তরবঙ্গে 'পদ্মাপুরাণ গান' নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

ষোলো শতকে বেশ কিছু চণ্ডীমঙ্গল রচিত হওয়ায় এ যুগ চণ্ডীমঙ্গলের যুগ হিসেবেও পরিচিত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল (আনুমাণিক ১৫৫৬-৫৬) সর্বাধিক পরিচিত। কবি এখানে একাধিক ভণিতা ব্যবহার করেছেন যা থেকে স্পষ্টই অনুমেয় যে, তিনি স্বয়ং চণ্ডীমঙ্গল পরিবেশন করতেন। তাঁর ব্যবহৃত ভণিতা থেকে অভিনয় উপস্থাপনাকালে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে পারদর্শী যন্ত্রিদল (কলন্ত) এবং অভিনেতা নাটুয়)া-দের সহযোগিতা সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। অপর একটি অংশেও সুদক্ষ যন্ত্রিদল ও অভিনেতার সাহায্যে গীত, বাদ্য, নাট্য ও নৃত্য সম্বলিত অভিনয় উপস্থাপনার বর্ণনা রয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, ষোলো শতক থেকে চণ্ডীমঙ্গল বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত হয়ে আসছে।

চৈতন্যভাগবত (১৫৩৫-৩৬) কাব্যের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কিছু উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ষোলো শতকের প্রথমার্ধে মঙ্গলচণ্ডীর স্তুতিমূলক কাহিনীর বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত কাব্যটি আরও প্রমাণ করে যে, একই সময়ে বা তার কিছু পূর্বে মৌখিক রচনাভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা 'শিবের গীত' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গৃহাঙ্গনে একক গায়ের গীত, ডমরুবাদন এবং নৃত্য সহযোগে শিবের গীত পরিবেশন করতেন।

ইউসুফ-জুলেখার (১৩৮৯-১৪১০) আবির্ভাব বাংলা নাট্যে এক নতুন বৈশিষ্ট্য (পারস্য-আরবীয় প্রভাব) আরোপ করে। ১৪৭৪ সালে নবীজী (সঃ)-র জীবনকাহিনী ভিত্তিক চরিতকাব্য রসুলবিজয় রচিত হয়। এখানে হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যের সমান্তরাল কাহিনী নির্মাণের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বকীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত দুটি কাব্যই রচিত হয়েছিল মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এরই মধ্য দিয়ে ইসলামি মৌল উপাদান সম্বলিত বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সূচনা হয়। ষোলো শতক নাগাদ ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব ও উপকথার ওপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক পুথির আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে মকতুল হোসেন, কাশেমের লড়াই, কারবালা, জঙ্গনামা ইত্যাদি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যু এবং তাঁদের কাল্পনিক সৎ ভাই হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অপর কিছু পুথিতে (রসুলবিজয়, নবীবংশ এবং আমীর হামজা) পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী (সঃ)-র জীবনকাহিনী সম্পর্কিত বিবরণ এবং শেষে নবীজী (সঃ)-র জীবন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। পুথিগুলির রচনাশৈলী থেকে বোঝা যায় যে, এর অধিকাংশই বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হতো।

লোককাহিনী ও রূপকথা ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান মধ্যযুগে অব্যাহত থাকে। চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্যমতে ষোলো শতকের প্রথম ভাগে যোগীপালের গীত, ভোগীপালের গীত এবং মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটে দক্ষিণ-পূর্বের আরাকান রাজ্যে, যেখানে বাহরাম খান (ষোলো শতক) লাইলী-মজনু নামের ফারসি কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন তাঁর লাইনলী-মজনু। বাহরাম খানের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অন্তে বিষাদময় বিচ্ছেদ থাকায় এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুর্লভ নিদর্শন। আরাকান রাজদরবার মুসলমান কবিদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল (আনুমাণিক ১৬০৭-১৬৮০) রচনা করেন তাঁর কালজয়ী অবদান পদ্মাবতী (১৬৫১) এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯-১৬৬৯)। এ রাজসভায় রচিত সকল কাব্যের বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতা এবংকল্পনা প্রবণতা। আরাকান রাজসভার রচনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ?এগুলি সবই হিন্দি এবং ফারসি উৎস থেকে উদ্ভূত। ফলে বাংলা নাট্যে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি যুক্ত হয়। এ সকল রচনা বর্ণনাত্মক রীতিতে অভিনীত হয় এবং ধীরে ধীরে বাংলার সকল অঞ্চলের মুসলমান জনগণের অন্তর জয় করে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ মৈমনসিংহ-গীতিকায় সংকলিত কাহিনীসমূহের মৌখিক রচনাভিত্তিক অভিনয় অনুষ্ঠান পালাগান-এর আবির্ভাব ঘটে ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে।

নাটগীত নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানে কুশীলবগণ উত্তম পুরুষে চরিত্রাভিনয় করেন এবং অভিনয় চলাকালে সকল শারীরিক ক্রিয়া নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। চরিত্রবৃন্দ তাঁদের বাচিক অভিনয় নিজেরাই গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন অথবা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে দোহারবৃন্দের সহযোগিতায় সম্পাদন করেন। চর্যাগীত স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটগীত অতি পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কাহ্নপা রচিত গীত (চর্যাসংখ্যা ১০)-এ 'নাচই' (নাচিতেছে) এবং 'নড়-পেড়া' (নটগিরি) শব্দ দুটির ব্যবহার এবং বীণাপা রচিত

গীত (চর্যাসংখ্যা ১৭)-এ 'নাচন্তি' (নাচেন), 'গান্তি' (গান করেন) এবং 'বুদ্ধ নাটক' শব্দগুলির ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিব্বতি বৌদ্ধ বিহারের দেয়ালচিত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ (বীণাপা ও সরহপা) বাদ্যযন্ত্র হাতে চিত্রিত হয়েছেন। অপর তিন সিদ্ধাচার্য (মীনপা, ডোম্বীপা ও জলন্ধরীপা) অঙ্কিত হয়েছেন নৃত্যের ভঙ্গিমায়। নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকায় যে চর্যানৃত্য আজও পরিবেশিত হয় তার সঙ্গে সম্ভবত প্রাচীন বাংলার চর্যানৃত্যের মিল ছিল। উপর্যুক্ত সূত্র এবং তান্ত্রিক পুথিগত সাক্ষ্য (গুহ্যসমাজতন্ত্র) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পালযুগের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে অথবা মন্দিরে গুহ্য নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে সাধক/যোগী তাঁর সাধিকা/যোগিনীর সঙ্গে একত্রে তান্ত্রিক দেব-দেবীর বেশ ও মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করতেন। অপর সাধক/সাধিকা যন্ত্রসঙ্গীত ও চর্যাগীত/দোহা পরিবেশনের মাধ্যমে দোহারবৃন্দের ভূমিকা পালন করতেন। বীণাপা তাঁর বিখ্যাত চর্যাগীতে (চর্যাসংখ্যা ১৭) সম্ভবত এমন একটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনাকেই 'বুদ্ধ নাটক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ নাটগীতের ঐতিহ্য নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে অব্যাহত থাকে। নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনা যোগীর গান এবং যুগী পর্ব আজও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, ভীমসেন রায়ের গোর্খবিজয় ও শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (ষোলো শতক) কাব্য এবং বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় (১৪০৩) নাটলিপিটি প্রাচীনকালে নাথপন্থী নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথের সম্মুখে মাদলসহ নৃত্য পরিবেশন করেন।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের (১৪১৫-১৪৩৩) ভূমিকায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, গৌড়ের মুসলিম রাজসভায় নাটগীত অভিনয় উপস্থাপন সমাদৃত ছিল। যা হুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও (প্রকৃত পক্ষে ইয়েং ইয়াই শেংলান, ১৪০৮-১৪১১) মুসলিম রাজদরবারে নাটগীত পরিবেশনের বর্ণনা আছে। উল্লিখিত চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভোজসবা উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিতা সুদক্ষ গায়িকা ও নৃত্যশিল্পিগণ এ সকল নাটগীত পরিবেশন করতেন। আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রমাণ করে যে, তেরো শতকেই মৌখিক রচনাভিত্তিক নাটগীত জনগণের মধ্যে পরিচিত ছিল। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিন চরিত্রসম্বলিত এ সকল অভিনয় উপস্থাপনায় কুশীলবগণ গীত সহযোগে নৃত্য পরিবেশ করতেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় এ সকল পরিবেশনা একজন কুশীলব কর্তৃক তিনটি চরিত্রে রূপদানের মাধ্যমে অথবা তিনজন কুশীলবের সাহায্যেও উপস্থাপন করা যেত এবং এগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনীত হতো। চৈতন্যবাগবতের মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষোলো শতকের নাটগীত উপস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যাবৃন্দ অভিনীত এ উপস্থাপনায় রুক্মিণী, রাধা, সুপ্রভা, বড়াই, কোটাল, নারদ প্রভৃতি চরিত্র রূপায়িত করা হয়। এক অংশে রুক্মিণীকে এবং অপর অংশে রাধাকে ঘিরে উপস্থাপনার বিষয়বস্তু রচিত। চৈতন্যের অনুসারী ভক্তবৃন্দ ছিলেন এই উপস্থাপনার দর্শক এবং তাঁরা অভিনয়স্থানের চতুর্দিকে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সাজঘর ছিল কিছু দূরে অবস্থিত। আলোর উৎস হিসেবে মশাল ব্যবহার করা হয়েছিল। নাটগীত উপস্থাপনকালে একজন কুশীলব মশালহাতে অভিনেতাদের অনুসরণ করেন। ষোলো শতকে বৈষ্ণবদের মধ্যে আরও দুটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখ পাওয়া যায়; একটি শ্রীহট্টে (ষোলো শতকের প্রথমার্ধে), যা থেকে ময়মনসিংহের ঘাটু গানের উদ্ভব এবং অপরটি (ষোলো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) রাধা চরিত্রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট, যা শেখরী যাত্রা নামে পরিচিত হয়।

অধিব্যঞ্জনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা মুখোশ নৃত্য গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোশ নৃত্য দেখা যায়, তার উৎস কোচ নৃগোষ্ঠীর প্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠান। খ্রিস্টীয় নবম শতক নাগাদ পূর্ব ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কোচ মুখোশ নৃত্য আত্তীকরণ করে তাঁদের নিজস্ব মুখোশ নৃত্যের উদ্ভব ঘটান। বাংলার চৈত্রসংক্রান্তিতে সাংবৎসরিক উৎসবে এই

নৃত্য পরিবেশিত হতো। এই মুখোশ নৃত্য অষ্টমাত্রিক নৃত্য, মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ (কাঠমান্ডু উপত্যকা, নেপাল) এবং তিব্বতি বৌদ্ধ মুখোশ নৃত্যের সহেগ সম্পর্কযুক্ত ছিল। বারো শতকের শেষ নাগাদ যখন শৈব তন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ তন্ত্রকে প্রায় আত্তীকরণ করে ফেলেছিল, তখন একই সঙ্গে মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ ইত্যাদি শৈবতান্ত্রিক মুখোক নৃত্যে রূপান্তরিত হয়। বাংলার শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্য মুসলিম শাসনের কারণে ক্ষয় হলেও নেপালে কিন্তু তা অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। বাংলায় শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্যের অবশিষ্টাংশ কালী কাচ, মুখো নাচা সং যাত্রা ও গম্ভীরা উৎসবের মধ্যে আজও পরিদৃষ্ট হয়।

পটুয়া গান দুটি তথ্যসূত্র থেকে প্রাচীন বাংলায় পটুয়া গানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমটি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত (৭ম খ্রিস্টাব্দ) যেখানে যমপট্টিকার এ পরিবেশনা বিবৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সাঁওতাল পটচিত্র উপস্থাপনা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট যে যমপট্টিকার বিবরণ দিয়েছে সেটি হর্ষবর্ধন তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ প্রাপ্তির পর রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পথে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন কুশীলব পরিবেশিত এ উপস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছিল যমের চিত্রসম্বলিত একটি পট। বাংলার সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগের কারণে অনুমিত হয় যে, বাণভট্ট উল্লিখিত যমপট্টিকা বাংলায়ও পরিচিত ছিল। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে পট পরিবেশনের দুটি রীতি বিদ্যমান : একটি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক (কো রেয়াক কথা) এবং অপরটি মৃত্যুর পর মৃতের পরকালে যাত্রা বিষয়ক (চক্ষুদান পট)। উল্লিখিত পরিবেশনা রীতিদুটি বাংলায় প্রাচীন পটুয়া গানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মধ্যযুগে রাম, কৃষ্ণ, মনসা ও চণ্ডী বিষয়ক পটুয়া গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আঠারো শতক নাগাদ মুসলমানদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে গাজীর পটের মাধ্যমে। পীর গাজীর মাহাত্ম্য বিষয়ক গাজীর পট এখনও বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

পুতুল নাচ দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবে পুতুল নাচ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলায় পুতুল নাচের প্রাচীনতম পুথিগত সাক্ষ্য পাওয়া যায় ইউসুফ-জুলেখা কাব্যে। উল্লিখিত তথ্য থেকে এও অনুমেয় যে, এ সকল পুতুল ছিল সুতার দ্বারা পরিচালিত। সম্ভবত দেব-দেবীর কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে মৌখিক রচনার ওপর ভিত্তি করেই এই পুতুল নাচ পরিবেশিত হতো। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (১৫১৫-৫৬) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত (আনুমানিক ১৫৬০-৮০) সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ষোলো শতকে বাংলায় পুতুল নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তৎকালীন দেব-দেবীর জনপ্রিয়তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ষোলো শতকীয় পুতুল নাচ উপস্থাপনা ছিল কৃষ্ণ, রাম, মনসা, চণ্ডী ও চৈতন্য বিষয়ক বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সকলল পুতুল নাচই লৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত, দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক পুতুলনাচ এখন বিরল। বাংলায় প্রচলিত পুতুলনাচে সম্ভবত ইসলাম ধর্মীয় বিষয় কখনোই অনুপ্রবেশ করে নি।

শোভাযাত্রামূলক অভিনয় নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের দেবতুল্য সম্প্রদায় অধিকর্তার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা প্রচারের নিমিত্তে বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং সচল যানের উপর স্থাপিত 'ট্যাবলো' (নীরব ও নিশ্চল কুশীলব কর্তৃক রূপায়িত দৃশ্য) সহযোগে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে তার এবং তদুদ্ভূত উপস্থাপনাসমূহের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা দেশজ নাট্যের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ এই রীতির উপস্থাপনাসমূহে পূর্বে আলোচিত তিন রীতির উপস্থাপনার সম্মিলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, বাংলার জাতীয় নাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটে। ফা-হিয়েন দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণের সময় (৩৯৯-৪১৪) যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা থেকে জানা যায়

যে, কখন দ্যৈষ্ঠ মাসের আট তারিখে পাটলীপুত্রে এক জনপ্রিয় বৌদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় বৌদ্ধ মূর্তি সম্বলিত রথ ব্যবহৃত হতো। এই রথ পাটলীপুত্রের রাস্তায় গায়ক ও বাদকদের পরিবেশনা সহযোগে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। হিউয়েন সাঙ একই ধরনের উৎসব কনৌজ এবং এলাহাবাদেও দেখেছিলেন। হর্ষবর্ধন দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে এবং তাঁর মিত্র ভাস্করবর্মা ব্রহ্মার বেশে এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন জাঁকজমকপূর্ণভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হতো। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ই-ৎসিঙ বাংলার সমতট রাজ্যে (বৃহত্তর কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল) একই ধরনের শোভাযাত্রার বিবরণ রেখে গেছেন। এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ছিল। সেখানে দেবতার মূর্তিযুক্ত রথ থাকত এবং গীত, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও চরিত্রাভিনয় যুক্ত ছিল। এ সকল শোভাযাত্রার শেষে বৌদ্ধ বিহারে মুখোশ নৃত্য ও বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা পরিবেশিত হতো। নেপালে মৎসেন্দ্রনাথ যাত্রার ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বাংলার নাথপন্থীরা দশ অথবা এগারো শতক নাগাদ তাঁদের নিজস্ব শোভাযাত্রার প্রচলন করেন।

বারো শতকের প্রথম দিকে শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনাসমূহ ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঠাকুর বিষয়ক সাহিত্যকর্ম ও ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে প্রচলিত কৃত্য অনুষ্ঠান থেকে ধারণা হয় যে, বারো শতকে এই সম্প্রদায় ধর্মীয় উৎসবের (গাজন) আয়োজন করত এবং এর অন্তর্গত ছিল শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনা। এ সকল শোভাযাত্রার শুরুতে থাকত সোনালি পালকিতে স্থাপিত ধর্মঠাকুরের পাদুকা এবং তার পেছনে থাকত বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও গীত পরিবেশনরত ধর্মঠাকুরের অনুগামীরা। এ সকল শোভাযাত্রায় সঙের উপস্থিতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুখোশ পরে (অথবা মুখোক সদৃশ রঙ মেখে) এবং পৌরাণিক চরিত্রের সাজে পোশাক পরে সঙ ধর্মের গাজনে অংশগ্রহণ করত, আজযেমন করে। প্রাচীনকালের শোভাযাত্রায় সঙ সম্ভবত নৃত্যের মাধ্যমে পৌরাণিক কোন দৃশ্য উপস্থাপন করত। ধর্মঠাকুরের মন্দির থেকে এ সকল শোভাযাত্রা শুরু হতো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে ফিরে আসত মন্দিরে। সেখানে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো। বারো শতকের শেষ নাগাদ শৈবতন্ত্রের অনুসারীরা বৌদ্ধতন্ত্র ও ধর্মঠাকুরের অনুসারিবৃন্দের শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা আত্তীকরণ করে নেয়। বৎসরান্তে চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবে শৈবতন্ত্র অনুসারীদের শোভাযাত্রা বের হতো। এই শোভাযাত্রার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেব-দেবী, পৌরাণিক বীর, জীবজন্তু ও ভূত-প্রেতের সাজে আবির্ভূত হয়ে শিবের অনুসারিগণ গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতেন। এলাকার শিবমন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে এ সকল শোভাযাত্রা পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ করত এবং শেষে আবার ফিরে আসত মন্দিরে। মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় শুরু হতো কৃত্যানুষ্ঠান ও মুখোশ নৃত্য এবং রাতভর তা চলত। প্রাচীন কালের এ সকল অভিনয় উপস্থাপনার অবশিষ্টাংশ আজও শিবের গাজন, নীলের গাজন, সঙযাত্রা, অষ্টক যাত্রা ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় দৃষ্ট হয়।

সম্ভবত চৌদ্দ শতকে শাক্ত ধর্মের অনুসারিগণ শোভাযাত্রামূক অভিনয় উপস্থাপনা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী শারদীয়া দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে দশম দিনে বিসর্জনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে গীতকুশলী কুমারী ও বারাঙ্গনারা, নট এবং যন্ত্রিদল। অন্যরা রঙ-বেরঙের পতাকা বহন করবে এবং খৈ, ফুল, ধুলা আর কাঁদা ছড়াবে। বলা হয়েছে যে, কাললীলা প্রদর্শনে দেবী প্রীত হন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে অনুমেয় যে, মধ্যযুগের শাক্তশোভাযাত্রা শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে কোন এক ধরনের অভিনয় উপস্থাপনার আয়োজন করা হতো। পনেরো-ষোলো শতকে রচিত বামাকেশ্বরতন্ত্রে দেবী ভগবতীর সম্মানে বছরে ১৬টি শোভাযাত্রার বিধান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ষোলো শতক নাগাদ বৈষ্ণবদের মধ্যেও শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়ের বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন বিষ্ণুর সম্মানে বছরে ১২টি শোভাযাত্রা আয়োজনের বিধান চালু করেন। বৈষ্ণব শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনায় ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয় রথের উপর স্থাপিত বৈষ্ণব পুরাণাদির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যসম্বলিত ট্যাবলো। ভক্তগণ এই রথ টেনে বৈষ্ণব অধ্যুষিত এলাকা প্রদক্ষিণ করতেন। ব্যাপক জনসমর্থন অর্জনের জন্য চৈতন্য স্বয়ং শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে এ সকল শোভাযাত্রা সংকীর্তন নামে পরিচিত ছিল। এমন একটি সার্থক নগর সংকীর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যভাগবতে। সেখানে নবদ্বীপের কাজীর আবাস ঘেরাও করে তাঁকে জনগণের দাবি মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশে বৈষ্ণব শোভাযাত্রা এখনও প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল (১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত) এবং টাঙ্গাইল জেলার পাতরাইলে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলের কথা উল্লেখ করা যায়।

শোভাযাত্রা উপস্থাপনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে বৈষ্ণবদের, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে। পুরীতে বসবাসকালে চৈতন্য ও তাঁর অনুসারিগণ এক ধরনের নাট্য জনপ্রিয় করে তোলেন, যাকে ‘পরিবেশ নাট্য’ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদে বিবৃত এ ধরনের এক পরিবেশ নাট্যে চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামিগণ হনুমান ও তাঁর বানরবাহিনীর সাজে উৎসব স্থলে উপস্থিত হন, যেখানে পূর্বেই লঙ্কার দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা রামায়ণের একটি অংশ (লঙ্কার দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস) অভিনয় করেন। এ ধরনের আরও কিছু নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের শৈশব বর্ণনায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিত্যানন্দের বন্ধুগণ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় করেন বলে জানা যায়। চৈতন্যের মৃত্যুর পরও পরিবেশ নাট্য প্রচলিত ছিল। একটি পুকুরের মধ্যে মাচা তৈরি করে কালীয়দমন লীলা অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত চৈতন্যের জীবদ্দশায় পরিবেশ ও শোভাযাত্রামূলক নাট্য একত্রে পরিবেশনের রীতি চালু হয়, যার অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশের পাতরাইপ গ্রামে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলে দেখা যায়। একই ধরনের নাট্যাভিনয় সম্ভবত শাক্তধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা যে শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য উপস্থাপন করতেন তার নাম ছিল চণ্ডীযাত্রা। এসকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো : ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নাট্যদৃশ্যের প্রয়োজনে সৃষ্ট অভিনয়স্থলে একেকটি দৃশ্যের অভিনয় এবং অভিনেতাদের এক অভিনয়স্থল থেকে অন্য অভিনয়স্থলে গমনের সময় দর্শকবৃন্দের অনুসরণ। সাধারণত ধর্মীয় উৎসব কিম্বা মেলায় এ সকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য অভিনীত হতো। এভাবেই মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ-নাগ ধর্মসম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা (যার শেষে মন্দিরে/বিহারে বর্ণনাত্মক নাট্য ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যে (শোভাযাত্রাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্যবিশেষের অভিনয়) রূপান্তরিত হয়। বিবর্তনের এই দুই প্রান্তের যোগসূত্র ছিল শৈব তান্ত্রিক ও শাক্ত সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা রীতি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে পেশাদার অভিনয় দল বিভন্ন ধরনের কৃষ্ণলীলা অভিনয় শুরু করে। এ অভিনয় কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে নয় বরং নাট্যমণ্ডপ, গৃহাঙ্গন কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে কোন্ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কিংবা আয়োজকদের ইচ্ছানুসারে যে-কোনো দিন অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণত ‘কালীয়দমন যাত্রা’ নামে পরিচিত এ সকল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যাভিনয় নবদ্বীপের রাজসভার সংস্কৃত নাট্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কালীয়দমন যাত্রা ছিল মুখ্যত গীতাশ্রয়ী। দলের অধিকারী বৃন্দা (রাধার সখী) অথবা মুনি গোঁসাই (নারদ) চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং সূত্রধারের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট গদ্যে অথবা পূর্বে রচিত পদ্যে/গীতে অংশবিশেষ বর্ণনার মাধ্যমে সমগ্র

নাট্যক্রিয়া পরিচালনা করতেন। নাট্যের অপর অংশ অভিনীত হতো তাঁর ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে। সম্ভবত শিশুরাম অধিকারী (আনুমানিক ১৮শ শতক) ছিলেন এই অভিনয় উপস্থাপনা রীতির পথিকৃৎ. কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে একই সময়ে বাংলায় অপর কিছু অভিনয় উপস্থাপনা বিদ্যমান ছিল, যার সঙ্গে কালীয়দমনের কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যযাত্রা (চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে), চণ্ডীযাত্রা (চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে) এবং রামযাত্রা (রামায়ণ অবলম্বনে)। উনিশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভাব ঘটে ভাসানযাত্রার (মনসামঙ্গল অবলম্বনে)। মধ্যযুগের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের ঐতিহ্য তখনও অব্যাহত ছিল রাসযাত্রায়, যার বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসনৃত্য।

আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে কালীয়দমন যাত্রা জনপ্রিয়তা হারায়। এর পরিবর্তে আবির্ভূত হয় কৃষ্ণযাত্রা, যা এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত। কালীয়দমন যাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা উভয়ই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক হলেও পার্থক্য এই যে, কালীয়দমন যাত্রার অধিকারী-কথিত বর্ণনার পরিবর্তে কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণই সংলাপাত্মক এবং এর অধিকাংশই গদ্যে রচিত। একই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায় চণ্ডীযাত্রা এবং ভাসানযাত্রায়। কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা বিশ শতকের প্রথম দিকে লোপ পায়, কিন্তু ভাসানযাত্রার পরিবর্তিত রূপ এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।

শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত কলকাতার মতো শহরাঞ্চলে, গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এর পলে অপার্থিবের পরিবর্তে পার্থিব মূল্যবোধ এবং দেশজ ঐতিহ্যের পরিবর্তে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। উল্লিখিত পরিবর্তনের প্রভাবে উনিশ শতকের বিশের দশকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশজ নাট্যে আবির্ভাব ঘটে ‘নতুন যাত্রা’র। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে এর কাঠামোগত মিল থাকলেও উদ্দেশ্য ধর্মীয় ভক্তি জাগরণ নয়, কেবল বিনোদন; বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অমিল ব্যাপক. কারণ নতুন যাত্রা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অভিনীত হলেও এর গুরুত্ব ছিল দেবভক্তিতে নয়, বরং মানবিক আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টিতে। বিদ্যাসুন্দরের মতো নতুন যাত্রায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম মুখ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় এবং দেবলীলা উপলক্ষ মাত্র হয়ে যায়। নতুন যাত্রা পেশাদার দল কর্তৃক অভিনীত হতো। তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল গোপাল উড়ের (১৮১৯-১৮৫৯) দল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে নতুন যাত্রার রমরমা বাজার শেষ হয়ে গেলে ‘গীতাভিনয়’ কলকাতার দর্শকদের মন জয় করে নেয়। কৃষ্ণযাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ এবং ইউরোপীয় রীতিপ্রভাবিত বাংলা নাটকের করুণ রস এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গীতাভিনয় ধীরে ধীরে নৃত্য ও গীতের বাহুল্য হ্রাস করে এবং তার বদলে গদ্য সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ইউরোপীয় নাট্যের দ্বন্দ্ব-নির্ভর কৌশল অনুপ্রবেশ করে। তবে গীতাভিনয়ের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় হিন্দু পুরাণ থেকে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কারণে ক্ষণিকের জন্য হওে বাঙালি হিন্দু সমাজে দেশজ ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পুরাণাশ্রয়ী এবং ধর্মীয় প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম অভিনয় উপস্থাপনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় মূলত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গীতাভিনয় প্রভাবিত নতুন যাত্রার সংস্কারকৃত রূপ ‘পৌরাণিক যাত্রা’ নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পৌরাণিক যাত্রার বিষয়বস্তু মুখ্যত রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশ থেকে আহৃত।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে লক্ষ্য করা যায় জাতীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে জাগতিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হতে। দেশজ নাট্যে এর প্রতিফলন ঘটে ‘ঐতিহাসিক যাত্রা’ ও ‘স্বদেশী যাত্রা’র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক যাত্রার বিষয়বস্তু

আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে সংগৃহীত। স্বদেশী যাত্রা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় (যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশাত্মবোধ, উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন, জমিদারি শোষণ ইত্যাদি) উত্থাপন করেছে। অভিনেতা-পরিচালক মুকুন্দদাসের (১৮৭৮-১৯৩৪) তত্ত্বাবধানে স্বদেশী যাত্রা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। তাঁর সাফল্যে ভীত ঔপনিবেশিক সরকার তাঁর মাতৃপূজা (১৯০৫) নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল।

বিশ শতকের বিশের দশক থেকে যাত্রা রাজনৈতিক অঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সংকট প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এ সময় যাত্রা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নেয়। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যাত্রায় সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের প্রবণতা জন্মে। 'সামাজিক যাত্রা' নামে খ্যাত এ সকল পালায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উত্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিষয়টির সামাজিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগ প্রবণতাই সমধিক লক্ষণীয়।

■ ৪০৪.২.১.৪ : ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য

ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য ১৭৫৭ থেকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, যা বাংলার সকল ক্ষেত্রে বিশেষত জ্ঞানচর্চায় গুণগত পরিবর্তন আনে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট শহুরে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি ইউরোপীয় আদলে গড়ে ওঠে। প্রবল জীবনী শক্তির অধিকারী এই শহুরে ইউরো-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং তার ফসল ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যচর্চা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অ তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত দেশজ নাট্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশজ নাট্যের অনেক রীতির ভেতর ফসিলীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ইউরো-প্রভাবিত নাট্যচর্চা বেগবান হয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হন মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা দ্বারা পুষ্ট শহুরে বুদ্ধিজীবীরা।

বাংলার সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা দ্য প্লে হাউস (বা দ্য থিয়েটার) ১৭৫৩ সালে কলকাতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা নগরী আক্রান্ত হলে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্য নিউ প্লে হাউস (দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার)। ১৮০৮ সালে বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় শেক্সপীয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক। প্রথম অবস্থায় নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু শীঘ্রই এ রীতির পরিসমাপ্তি ঘটে বেং নারীশিল্পীরা অভিনয় শুরু করেন। একে একে অন্যান্য নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তন্মধ্যে চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯) এবং সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-১৮৪৯) ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিনে এবং পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব ক্রয় করেন। অবশ্য চৌরঙ্গি থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখানে মঞ্চস্থ হয় শেরিডান, গোল্ডস্মিথ ও শেক্সপীয়রের নাটকসহ তৎকালীন লন্ডনের অন্যান্য জনপ্রিয় ইংরেজি নাটক। এগুলির অভিনেতা, কলাকুশলী সকলেই ছিলেন ইংরেজ. সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বাঙালি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একজন বাঙালি

অভিনেতা ওথেলো নাটকে (১৮৪৮) নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এ মঞ্চেও শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইংরেজি থিয়েটারের এই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও স্থানীয় বাংলা নাটক উদ্ভাবনের পর থেকে সেগুলির গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

অনুকরণ, আত্তীকরণ ও গঠন হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাবিদ ও পর্যটক ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর ইউরোপীয় রীতিতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটি ছিল রিচার্ড জড্রেলের প্রহসন দ্য ডিসগাইজ-এর অনুবাদ এবং ২৫ ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) বেঙ্গলী থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। লেবেদেফ নিজেই তা অনুবাদ করেন। এ নাটকের প্রদর্শনীতে প্রবেশমূল্য অনেক বেশি থাকলেও নাট্যশালা দর্শকে পূর্ণ থাকত। এ থেকে নাট্য সম্পর্কে বাঙালি দর্শকদের আগ্রহের কথা জানা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ইউরোপীয় নাট্যচর্চা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল ও কলেজে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেক্সপীয়র অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে গৃহীত হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের ফলে ইউরোপীয় নাট্যরীতি আধুনিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ফলস্বরূপ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রভাবশালী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু ব্যক্তিগত নাট্যশালা। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-৬১) যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চ নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস। পাইকপাড়ার জমিদাররা তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার অর্কেস্ট্রা, মঞ্চ দৃশ্যাবলি, গ্যাস ও লাইম পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় নাট্য নির্মাণ কৌশলের কেবল অনুকরণ নয়, বরং তা আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃতি নাটকের প্রাধান্য লক্ষণীয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে শর্মিষ্ঠা (প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে এবং এর মাধ্যমে তিনি নাট্য জগতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন), পদ্মাবতী (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫), ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি কৃষ্ণকুমারী (প্রকাশিত ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন রচিত প্রহসনগুলি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারাল ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। একেই কি বলে সভ্যতা (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫) প্রহসনে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত অতি আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭)। সমাজের ভাল মানুষের মুখোশ অনেকটা প্রভাবশালী শ্রেণির ভণ্ডামি ও অসাধুতার স্বরূপ উন্মোচনই ছিল এর উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত তিনি যে সংস্কৃত নাটক থেকে বাংলা নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই সংস্কৃত নাটক তাঁর শেষ নাটক মায়াকাননের (১৮৭৪) ওপর পুনরায় প্রভাব বিস্তার করে।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬১) নাটকে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের নির্মম অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। বহুজনের বিবেচনায় নীলদর্পণ

প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ নাটক। এটি মেলোড্রামার অন্তর্গত হলেও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার চিত্র এখানে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও দীনবন্ধু আরও কয়েকটি নাটক রনচা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে পাগলা বুড় (১৮৬৬), শদবার একাদশী (১৮৬৬) লে জামাই বারিক (১৮৭১) প্রহসনগুলির জন্য তিনি হাসির জাদুকর হিসেবে পরিচিত।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তন দীনবন্ধু মিত্রের নীলপর্দণ নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬০-১৮৯২) সঙ্গে যুক্ত একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের উদ্যোগে কলকাতার একটি বাসভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়িভাবে এটি নির্মিত হয়। উল্লিখিত যুবকদের কয়েকজন পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটার তারকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন ইউরোপীয় নাট্য প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার নামে অপর একটি সাধারণ রঙ্গালয় আত্মপ্রকাশ করে, যা বাংলার ইউরোপীয় রীতির সর্বপ্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম মঞ্চায়ন মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাট্যকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার ইউরো-প্রভাবিত বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এই নাটকেই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে নারীরাই (জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) অভিনয় করেন। উল্লিখিত সাধারণ রঙ্গালয়সমূহে আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতি ব্যবহার করা হতো। ১৮৮৭ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে সর্বপ্রথম ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। অঙ্কিত উইংস ও ব্যাকড্রপ দ্বারা নাটকের স্থান নির্দিষ্ট করা হতো। নাটক রচনার ক্ষেত্রে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি, বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক ছিল আদর্শ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয় ছিল উচ্চকিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অতিমাত্রায় আবেগাশ্রিত। এ সময়কার নাট্য প্রযোজনাগুলিতে হালকা বিনোদনমূলক নৃত্য-গীত ও কিছু চটকদার কৌশল ছিল অপরিহার্য উপাদান।

সাধারণ রঙ্গালয় চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই একে ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পড়তে হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি গজানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনটি মঞ্চস্থ করার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর কিছু পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬ পাস হয়। এ আইনের মাধ্যমে সরকারবিরোধী ও প্রজাবিদ্রোহমূলক নাট্য প্রদর্শনী বন্ধ করতে পুলিশকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি আর রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী নাট্য প্রদর্শনীতে সাহস করে নি; এমন কি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যকন গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ, তখনও নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক। অনেক আন্দোলনের পর ২০০১ সালে বাংলাদেশে এই আইনের বিলুপ্তি ঘটে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। নাট্য ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যায় অসাধারণ অভিনেতা ও দক্ষ পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে। তিনি প্রায় সত্তরটি নাটক রচনা করেন, যার অনেকগুলিই পৌরাণিক কাহিনী ও সাধুজীবনী আশ্রিত এবং আকণ্ঠ ভক্তিরসে নিমজ্জিত। উদাহরণস্বরূপ চৈতন্যের জীবনভিত্তিক চৈতন্যলীলার নাম করা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র যেখানে ইউরোপীয় নাট্যের শরীর ও আত্মা দুই-ই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, গিরিশ ঘোষ সেখানে কেবল শরীর বেছে নিয়েছিলেন, যার আদর্শ ছিল শেক্সপীয়রের নাটক। কিন্তু গিরিশ ঘোষের আদর্শগত অবস্থান ও মানসিক প্রবণতা সম্পূর্ণভাবেই ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত আশ্রিত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে (যেমন : প্রফুল্ল ও সিরাজউদ্দৌলা) অবশ্য হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রভাব অনেকটা কম দেখা

যায়। গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে চরিত্র বিশ্লেষণ এবং অভিনয় ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ শতকের শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর দেশপ্রেমের বক্তব্য সম্বলিত নাটক অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ সময় তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়) নাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন, যদিও তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডি. এল. রায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি উত্তমরূপে আত্তীকরণ করে তা ব্যবহার করেন স্বজাতির কল্যাণে। ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ডি. এল. রায় স্বার্থকভাবে তাঁর দর্শকবৃন্দের আগ্রহ পৌরাণিক ভুবন থেকে ইহজাগতিক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে রানা প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), নূরজাহান (১৯০৮) এবং সাজাহান (১৯০৯)।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক ব্যতিরেকে আলোচিত সময়ে রচিত হয়েছে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক হাস্যরসাত্মক নাটক এবং গীতাভিনয় নাট্য। এ সময়ের অপর দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদেশি ভাষায় রচিত কিছু নাটকের সফল বঙ্গানুবাদ (শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার ও মলিয়েরের লা জেন্টিলহোম) এবং কতগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল বসু ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনেতা। বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর প্রহলসনগুলি তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যচর্চার সংমিশ্রণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ আরও অনেকের সমান্তরালে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এমন কিছু নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন যা দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যরীতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। মিশ্রণটি এতই সূক্ষ্ম যে এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীকী সাংকেতিক নাট্যরীতির উদ্ভব করেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশজ নাটগীত-রীতি এবং ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশলের সংমিশ্রণ। তিনি দেশজ নাটগীত থেকে বিপুল সংখ্যক গানের ব্যবহার এবং কার্যকারণের সূত্র ব্যতিরেকে নাট্যক্রিয়া নির্মাণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। অপরদিকে, দ্বন্দ্বভিত্তিক প্লট নির্মাণ-কৌশল এবং চরিত্র নির্মাণের কিছু সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় নাট্যরীতির কাছে ঋণী। রক্তকরবী (১৯২৬), মুক্তধারা (১৯২২) এবং অনেকাংশে অচলায়তনে (১৯২২) নাট্যদ্বন্দ্ব (জড় বস্তুর আধিপত্য ও মানবাত্মার নিরন্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা) নাটকসমূহের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রাজা (১৯১১) নাটকে যুদ্ধের পর চালিকা শক্তি হিসেবে নাট্যদ্বন্দ্ব অস্তিত্বহীন এবং ডাকঘর (১৯১২) নাটকে তা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের ওপর নাটগীত-রীতির প্রভাব তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ দিকে আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শেষ বর্ষণ, বসন্ত (১৯২৩), নটরাজ, ঋতু, রঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩১), শ্রাবণ গাঁথা (১৯৩৪) ইত্যাদি রচনায় নাটকীয় উপাদানের অভাব এত স্পষ্ট যে, অনেকে এ সকল রচনা নাটক হিসেবে স্বীকার করেন না। অবশেষে চিত্রাঙ্গনা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামায় (১৯৩৯) যখন তিনি সার্থকভাবে নাটগীত-রীতি প্রয়োগ করেন এবং নাট্যদ্বন্দ্বের ব্যবহার হ্রাস করে রস সঞ্চারে মনোযোগী হন, তখন দেশজ নাট্যরীতির প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্চে বাস্তববাদী অনুকরণের প্রয়াসকে পরিহার করতে সংকল্পবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ দর্শক-অভিনেতার মধ্যে নিবিড় বন্ধন সৃজনে সক্ষম উন্মুক্ত যাত্রা আসরের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসেবে মাত্র কয়েকবার মঞ্চায়ন করা হলেও সাফল্যের মুখ দেখে নি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল প্রথমবারের মতো প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে সফলভাবে মঞ্চায়ন করা সম্ভব।

সমাজ সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদমূলক নাট্যধারা এ ধারার নাট্যচর্চার কাল বিশ শতকের বিশেষ দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং নাট্য জগতের দুই বলিষ্ঠ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থবিরতা আসে। বিশের দশকে সে স্থবিরতা কেটে গেলে বাংলা নাট্যজগতে দেখা যায় বিপুল পরিবর্তন। সামাজিকভাবে নাটক অভিজাত শ্রেণির নিকট শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই নাট্যকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে-সকল পৌরাণিক নাটক টিকে যায়, সেগুলির কেন্দ্রস্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ। অন্যদিকে টিকে যাওয়া ঐতিহাসিক নাটকে অতিরঞ্জিত বীরগাথার পরিবর্তে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নাট্যকাররা অধিক মনোযোগী হন। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্য কাঠামো অপসৃত হতে থাকে এবং ইবসেন ও বার্নাড শ প্রবর্তিত নাট্য কৌশল সে স্থান অধিকার করে। এ সময়ে প্রযোজনা রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) প্রবর্তিত অভিনয়রীতি গিরিশ ঘোষের তুলনায় অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় (ensemble acting), মঞ্চচিত্রের (stage picture) অর্থপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং অনাড়ম্বর ভাবভঙ্গি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বাস্তব জীবনের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনার প্রতি অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালে বাংলা নাট্যের আলোকসজ্জা এবং সেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন সতু সেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝের সম্মুখে স্থাপিত বাতির (ফুট লাইট) ব্যবহার হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মাথার উপরে স্থাপিত নির্দেশাত্মক (directional) আলোক ব্যবস্থা। অঙ্কিত ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হয় বক্সসেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কালসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে অর্কেস্ট্রার ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নাটকের গান ও নাচের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তীকালের 'সখীদল' ক্রমশ মঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে, যার ওপর ন্যস্ত হয় অভিনয়, আলো, সেট, পোশাক, সঙ্গীত ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব।

এ কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এবং আরও কয়েকজন। মন্মথ রায় ১৯২৩ সালে মুক্তির ডাক নামের একাঙ্কিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলির প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও তিনি ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। ভাগবতপুরাণ থেকে গৃহীত কাহিনী অবলম্বনে তিনি কারাগার (১৯৩০) নাটক রচনা করেন, যেখানে কংসরূপী ঔপনিবেশিক সরকারের অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে কৃষ্ণকে তুলে ধরা হয়েছে। কারাগার এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় এটিকে নিষিদ্ধ করতে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর গৈরিক পতাকার জন্য। যখন দেশব্যাপী চলছিল ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগপ্রবণ ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাংলা নাট্যে শচীন্দ্রনাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সমাজ সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন, যার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো পরিহার করে তিনি নাট্য চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন। সে সময়কার নিরীক্ষাধর্মী নাটক ঝড়ের রাতে (১৯৩১) শচীন্দ্রনাথ নারী মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেন এবং নারীর মুক্তি সমর্থন করেন।

বিধায়ক ভট্টাচার্য জনসমক্ষে অবতীর্ণ হন তাঁর সামাজিক নাটক মেঘমুক্তির (১৯৩৮) মাধ্যমে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পরিবর্তনশীল সমাজে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং এই শ্রেণির পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব চিত্রায়ণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর নাটকের মধ্যে মাটির ঘর (১৯৩৯), বিশ বছর আগে (১৯৩৯), রক্তের ডাক (১৯৪১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্মথ, শচীন্দ্রনাথ এবং বিধায়কের উপর্যুক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে এ সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবসতার বিশ্লেষণী মূল্যায়ন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। রঙ্গালয়সহ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিতেও এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এ সময়কার নেতৃস্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাতায় উদ্বুদ্ধ লেখক-শিল্পিবৃন্দ 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' (১৯৩৬) ও 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর (১৯৪২) মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩) শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর কিছুকাল পরে বাংলা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় এবং এর পলে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এ তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা বিজন ভট্টাচার্য রচিত নবান্ন নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ঘটমান বাস্তবতার প্রতিফলন এবং অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নবান্ন নাটক নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এ নাটকটি সমাজে নাট্যকর্মী/শিল্পীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নাট্যকলায় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা যুক্ত করে। এর ফলে কলকাতার নবান্ন-পরবর্তী নাট্যকলায় গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার উন্মেষ ঘটে এবং এতে নাট্যকর্মিগণ তাঁদের কাজে সামাজিক-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ এ দুটি বিষয়কে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় সাধারণ রঙ্গালয়ে এই ধারণা আর্থিকভাবে অলাভজনক হওয়ায় তাঁরা সবাই নাট্যকর্ম থেকে অর্থগ্রহণে বিরত থাকেন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

■ ৪০৪.২.১.৫ : নাট্যকলার বিবিধ প্রকরণ

(ক) অঙ্গরচনা :

অঙ্গরচনা এক ধরনের শিল্পকর্ম, যার মাধ্যমে চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চেহারার পরিবর্তন ঘটানো হয়। অঙ্গরচনাকালে শিল্পীকে চরিত্রের জাতি, বয়স, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হয়। অঙ্গরচনার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : ক. ত্বকের ওপর কৃত্রিম আলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে বিদূরিত করা; খ. মুখমণ্ডলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা এবং গ. শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।

থিয়েটার অঙ্গরচনার গুরুত্ব প্রাচীনকালেই অনুভূত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা যেমন অন্য দেহে স্থান লাভ করে পরভাব প্রাপ্ত হয়, সেরূপ অভিনেতাও বর্ণ বেশ দ্বারা সজ্জিত হয়ে অন্যের অর্থাৎ নাট্য-চরিত্রের অনুকরণ করে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গরচনার মাধ্যমে অভিনেতা চরিত্রানুযায়ী ভিন্ন রূপ, গুণ, অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আধুনিক থিয়েটারেও অঙ্গরচনার গুরুত্ব অনেক; এর পলে শিল্পীর অভিনয়-সাফল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারে উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ (তৈলজাতীয় পদার্থ) ও খনিজ পদার্থ থেকে সংগৃহীত রঙের সাহায্যে অঙ্গরচনা করা হতো। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে Leichner নামক একজন জার্মান অভিনেতা অঙ্গরচনার জন্য নির্দিষ্ট রং আবিষ্কার করেন। তৈলজাতীয় পদার্থের সঙ্গে রঞ্জক দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলে এই রংকে বলা হল 'তৈল রং' (grease paint)। এই রং আবিষ্কারের ফলে অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এর অল্পকাল পরেই মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-প্রযোজনার অন্য অনেক বিষয়ের মতো অঙ্গরচনায়ও পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়; এ ধারা আজও অব্যাহত।

(খ) আলোক পরিকল্পনা :

আলোক পরিকল্পনা থিয়েটার যখন উন্মুক্ত স্থান থেকে গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশ করে কিংবা দিবাকাল থেকে রাত্রিকালে প্রদর্শিত হওয়া শুরু করে, সেদিন থেকেই মঞ্চে কৃত্রিম আলোর প্রযোজনা দেখা দেয়। বাংলা থিয়েটার সূচনালগ্ন (১৭৯৫) থেকেই গৃহাভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। তখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও গ্যাসের আলো কিংবা বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কৃত হয় নি। ইউরোপ ও আমেরিকার থিয়েটারে যে আলো ব্যবহার করা হতো, তার উৎস ছিল মোমবাতি তৈল-প্রদীপ। বাংলা থিয়েটারের জনক লেবেদেফ এসেছিলেন রাশিয়া থেকে। সেখানে তখন মঞ্চালোকের উৎস ছিল মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ নাট্য-প্রযোজনায় (কাল্পনিক সংবদল) স্বদেশের অনুকরণে মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ ব্যবহার করেন।

বাংলা থিয়েটারে গতানুগতিক আলোক বিন্যাসরীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ১৮৯৭ সালের পর থেকে। ঐ সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ক্ল্যাসিক' থিয়েটার গঠন করে পেশাদারি থিয়েটার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রথম নাট্যোপযোগী আলো প্রয়োগ করেন। তিনি মঞ্চে রঙিন আলো ব্যবহার করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কলাকৌশলও সৃষ্টি করেন। মঞ্চে গ্যাস-লাইট প্রবর্তনের ফলে এসব করা সম্ভব হয়েছিল এবং গ্যাসের আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অমরেন্দ্রনাথ কিছু যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করেন। তিনি স্পট-বাতিও ব্যবহার করেন, যদিও বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া এ বাতি ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯০০ সালে স্টার থিয়েটারে প্রথম ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুতের আলো ব্যবহৃত হয়। এরপর ক্রমশ মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার ইত্যাদি মঞ্চেও ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চকে আলোকিত করা হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মঞ্চালোকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন করেন। পাদপ্রদীপের আলোয় পশ্চাৎপটে ছাড়া সৃষ্টি হয় বলে তিনি পাদপ্রদীপ বিলুপ্ত করেন। এ সময় মঞ্চে যথার্থ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়। শিশিরকুমারের নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে রঙিন আলোর যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রঙিন আলোর সাহায্যে চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক।

১৯৩১ সালে বাংলা থিয়েটারে যোগদান করেন বিশিষ্ট পরিচালক ও মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক শিল্পী সতু সেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোর প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আলো যে দৃশ্যের একটি অঙ্গ, মঞ্চচিত্র সৃষ্টিতে সহায়ক এবং নাট্য-উপস্থাপনাকে প্রকাশিত করে তুলতে সক্ষম সতু সেনের আলোক-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বাংলা মঞ্চের জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোকযন্ত্র নির্মাণ করে আলো প্রয়োগের মানকে উন্নত করেন। রঙিন ছায়া, মনস্তত্ত্বসম্মত আলো, মঞ্চচিত্র, মাত্রাবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবিস্মরণীয় অবাদন। এরপর তাপস সেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চালোকের গুণগত মান আরও উন্নত করেন।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে ফলোস্পট ও ফ্লাডলাইড ছিল প্রধান সূত্র। ১৯৫৬ সালে গ্রুপ থিয়েটার চর্চাভিত্তিক নাট্যদল ড্রামা সার্কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থিয়েটারে আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে 'কামাল ইলেকট্রিক' এবং 'কলরেডী' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার নাট্যমঞ্চে আলোকযন্ত্র সরবরাহের কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অবাবে আলোকসম্পাতের মান ছিল অত্যন্ত সাধারণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রুপ থিয়েটার চর্চা প্রবল ও বিস্তৃত হলে নাট্য-আঙ্গিকের অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি নাট্যমঞ্চে আলোর ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্লাড লাইট, স্ট্রিপ লাইট, বর্ডার লাইট/স্কাই লাইট, বেবি স্পট, মিডল সাইজ স্পট, বেবি মিরার স্পট, ফ্রেসনেল স্পট লাইট, স্টেপলেন্স স্পট, ইলিপ্সোডাইল স্পট, বিম, প্রজেক্টর, একটিং এরিয়া ফ্লাড, পেজেন্ট, আল্ট্রাভালোলেট ল্যাম্পসহ বিভিন্ন ধরনের লাইট। আর আলোক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পূর্বের যন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে 'ভেরিয়েবল ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ডিমার', 'ইলেকট্রিক ডিমার' ইত্যাদি।

(গ) পোশাক পরিকল্পনা :

পোশাক পরিকল্পনা অভিনয়ে পোশাকের প্রধান ভূমিকা হলো চরিত্রের বাহ্যরূপ চিত্রণ। শুধু অঙ্গরচনার দ্বারা চরিত্রের যথার্থ বাহ্যরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না; এজন্য চরিত্রানুযায়ী পোশাকের প্রয়োজন হয়। ঙ্গরচনার সঙ্গে চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করলেই চরিত্রের সার্থক বাহ্যরূপ পাওয়া যায়। চরিত্রের এই বাহ্যরূপ চিত্রণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়; সেগুলি হলো : নাট্যচরিত্রের দেশ, জাতি, স্থান, কাল, ধর্ম, পেশা, ঋতু, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ, বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, লিঙ্গভেদ, রুচি ইত্যাদি। বাস্তব জীবনে ব্যক্তির সঙ্গে তার পোশাকের কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চচরিত্রের সঙ্গে তার পোশাকের অসঙ্গতি মোটেই কাম্য নয়, কারণ এখানে চরিত্র ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। চরিত্রের বাহ্য বেং আন্তর রূপ প্রকাসে পোশাকের রঙেরও একটা ভূমিকা থাকে।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে পোশাককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, শ্বেত, বিচিত্র ও মলিন। বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠান ও মন্দিরে গমনের জন্য শ্বেতবস্ত্র; এছাড়া সেনাপতি, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, পুরোহিত প্রভৃতিরও পোশাক হবে সাদা; রাক্ষস, দানব, নাগ, রাজা ও বিলাসী চরিত্রের পোশাক হবে বিচিত্র এবং শোক-তাপ ও জ্বালা-জর্জরিত চরিত্রসমূহ, পাগল, মাতাল প্রভৃতির পোশাক হবে মলিন। মুনি-ঋষির চরিত্র গাছের ছাল কিংবা পশুর চামড়া দিয়েদেহকে আচ্ছাদিত করতে পারে।

আধুনিক থিয়েটারের পোশাককে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : ক. ঐতিহাসিক এ ধরনের পোশাক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির জন্য পরিকল্পিত হয়; খ. সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পোশাক; গ. সাংকেতিক যেসব বিষয় স্বাভাবিকভাবে বোঝানো যায় না, প্রতীক-সংকেত-রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের পোশাক ব্যবহৃত হয়; ঘ. কাল্পনিক এ ধরনের পোশাকব্যবহৃত হয় কাল্পনিক চরিত্র, যথা ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকেই নাট্যচর্চার যেমন বিকাশ ঘটেছে, তেমনি উন্নয়ন ঘটেছে পোশাক-পরিকল্পনায়ও। কিন্তু বাংলাদেশে নাট্যপ্রদর্শনীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে পোশাক-পরিকল্পনায় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ১৮৬১ সালে ঢাকায় মধ্যস্থ নীলদর্পণ নাটকে দেশিয় চরিত্রসমূহের জন্য সাধারণ পোশাক এবং ইংরেজ চরিত্রসমূহের জন্য

ইংরেজের পোশাক ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে মঞ্চস্থ নাটকসমূহে পোশাকের ব্যবহার পুরোপুরি চরিত্রানুযায়ী ছিল না।

তখনকার পোশাকের অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রসমূহের পোশাক। সামাজিক নাটকের পোশাক সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পোশাকের অনুরূপ। কখনও বা অনুমান ও কল্পনার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশক বা অভিনেতা চরিত্রের পোশাক নির্বাচন করত। তখন পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, ধর্ম, পেশা, বয়স ইত্যাদি তেমন বিচার করা হতো না।

এ সময় একই নাটকের একাধিক প্রদর্শনীর প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন নাট্যদল বিভিন্ন প্রযোজনার জন্য তৈরি করা পোশাক সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে সমস্ত নাট্য-প্রযোজনার পোশাক-পরিকল্পনা চরিত্র-উপযোগী ও প্রশংসিত হয়, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সৎ মানুষের খোঁজে, ম্যাকবেথ, ওথেলো, নূরুল দীনের সারা জীবন, কোরিওলেনাস, ইডিপাস, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল, তুঘলক, জমিদার দর্পণ, মা মধুমালা, কঞ্জুস, স্পার্টাকাস, রোমিও জুলিয়েট, বিষাদ-সিন্ধু, আন্তিগোনে ইত্যাদি।

(ঘ) মঞ্চ পরিকল্পনা :

মঞ্চ-পরিকল্পনা বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের মতো বাংলার রঙ্গমঞ্চও সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত নাট্যমঞ্চ এবং ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (আনুমাণিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের জন্য তিন ধরনের রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা ছিল : বিকৃষ্ট (আয়তাকার), চতুরস্র (বর্গাকার) এবং কনীয় বা ত্র্যস্র (ত্রিভুজাকার)। এগুলির প্রত্যেকটিকে আবার আয়তনের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে জ্যেষ্ঠা, মধ্য ও অবর। এ অনুযায়ী আয়তনের ভিত্তিতে রঙ্গালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট নয় প্রকার। নাট্যশাস্ত্রমতে, জ্যোষ্ঠ শ্রেণির রঙ্গালয় কেবল দেবতাদের পক্ষেই উপযোগী; কেননা, তাঁদের মানসসৃষ্ট অভিনয়ের কোন ভাব চেষ্টা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না৫ তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়েও তাঁদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু জাগতিক মানুষের পক্ষে অভিনয়ের সব কিছুই চেষ্টা দবারা সম্পন্ন হয়, তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে মানবসৃষ্ট অভিনয় যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হয় না৫ যে সংলাপ বা আবৃত্তি উচ্চারিত হয় তার নিঃসরণ যথাযথ হয় না। শ্রোতাদের শোনাবার জন্য অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর অত্যধিক বাড়াতে হয়, যে কারণে তা শ্রবণসুখকর হয় না; অভিনেতাদের মুখমণ্ডলের ভাব ও রসাশ্রিত অভিব্যক্তি দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে; গীত ও আবৃত্তি শোনাতেও অসুবিধা হয়। এসব কারণে জাগতিক মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী মধ্য ও অবর আয়তনের রঙ্গালয়; আবার মধ্য রঙ্গালয় নৃপতিদের এবং অবর রঙ্গালয় সাধারণের পক্ষে উপযোগী। শিল্পী ও দর্শক উভয়ের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ধরনের পরিমাপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র মধ্য (প্রধানত বিকৃষ্ট মধ্য) শ্রোণির রঙ্গালয়ের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ রঙ্গালয়ের মঞ্চ সমান দুটি অংশে বিভক্ত; সম্মুখভাগের অংশকে বলা হয় 'রঙ্গ' বা 'রঙ্গমণ্ডল'। পশ্চাদ্ভাগের অংশটি পুনরায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত, যার পশ্চাদ্ভাগ 'নেপথ্যগৃহ' এবং সম্মুখভাগ 'রঙ্গভূমি' বা 'রঙ্গমঞ্চ' নামে অভিহিত। নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমির মধ্যবর্তী অংশে একটি প্যানেলযুক্ত কাষ্ঠনির্মিত দেওয়ার ব্যবহার করা হতো, যা নানা শিল্পকর্ম দ্বারা সুশোভিত করা হতো। এই অংশকে বলা হয় 'ষড়দারুক'। ষড়দারুকের দুদিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমিতে গমনাগমনের জন্য দুটি দরজা থাকত এবং তাতে পর্দা ব্যবহার করা হতো।

রঙ্গভূমি দুটি অংশে বিভক্ত রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ; সম্মুখ অংশকে বলা হয় রঙ্গপীঠ এবং পশ্চাদংশ রঙ্গশীর্ষ। চরিত্রসমূহ মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে এবং মঞ্চ থেকে প্রস্থানের পরে রঙ্গশীর্ষে অপেক্ষা বা বিশ্রাম করত; এটি রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত অংশ; এখানে বাদ্যযন্ত্রসমূহও সংস্থাপিত হতো। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে থাকত দুটি 'মত্তবারণী'। মত্তবারণী রঙ্গপীঠ থেকে দেড় হাত উঁচু এবং এর চার কোণে থাকত চারটি স্তম্ভ; নাট্যক্রিয়ায় এগুলির ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক।

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যবনিকা বা পর্দার ব্যবহার ছিল, তবে তা মঞ্চের সম্মুখে নয়, রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী অংশে। নাট্যবহির্ভূত গীতসমূহ এর অন্তরালে গীত হতো এবং অভিনয়ের সময় এটি অপসারিত হতো। রঙ্গভূমির মেঝে হতো আয়নার মতো সমতল ও চকচকে।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বলেত এখন প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে বোঝায়। এর একদিকে থাকে মঞ্চ, যার তিনদিক ঘেরা ও সামনের দিকে খোলা। মঞ্চের দুপাশে থাকে ৮-১০টি উইংস, পেছনের পর্দায় থাকে দৃশ্যপট এবং সামনে মঞ্চমুখী দর্শকদের সারি। রিয়েলিস্টিক বা সাজেস্টিক সেট, প্ল্যাটফরম, সিঁড়ি ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা রঙ্গমঞ্চের ভেতরে ও বাইরে পরিবর্তন আনা হয়।

(ঙ) মঞ্চ নকশা :

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে ধরনের রঙ্গমঞ্চ চালু ছিল, ইংরেজরা সেই রঙ্গমঞ্চই বাংলায় নিয়ে আসেন। তাঁরা কলকাতায় যে নাট্যশালা গড়ে তোলেন, এদেশের রাজা-জমিদাররা তারই হুবহু অনুকরণ করেন। কলকাতার প্রথম বিদেশি রঙ্গালয় 'ওল্ড প্লে হাউস' এবং পরে 'দ্য ন্যু প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫) স্থাপনের পরিকল্পনা ও স্থাপত্যকর্মে সাহায্য করেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিফ। এরপর বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে লেবেদেফের আবির্ভাব ঘটে; তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫) ক্যালকাটা থিয়েটারের মঞ্চকাঠামো দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাদি নাট্য পরিবেশনায় বিশে, এক ধরনের মঞ্চ ব্যবহৃত হয়। চারদিক বাঁশ দিয়ে ঘিরে ওপরে কাপড়ের শামিয়ানা খাটিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। প্যান্ডেলের ভেতরে মাঝামাঝি জায়গায় চারকোণা বিশিষ্ট উঁচু কাঠের পাটাতন মঞ্চের কাজ করে; দর্শকরা এর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসন গ্রহণ করে। দর্শকদের পেছনে এক কোণে থাকে সাজঘর, যা অঞ্চলভেদে গ্রিনরুম নামেও পরিচিত; মঞ্চ ও সাজঘরে অভিনেতাদের যাতায়াতের জন্য একটি সরু পথ থাকে। মঞ্চের দুপাসে যন্তিদল অবস্থান নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত উভয় বঙ্গে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আদর্শে তৈরি রঙ্গমঞ্চ ও অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে নাট্যচর্চা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বড় রকমের কোন পরিবর্তন হয় নি।

(চ) মঞ্চসঙ্গীত :

মঞ্চসঙ্গীত মঞ্চে অভিনয়কালে নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের পরিস্ফুটন এবং নাট্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সঙ্গীত। অভিনয়ের সঙ্গে এই সঙ্গীতের সম্পর্ক ওতপ্রোত। নাটকের প্রকৃতি, চরিত্র, নাট্যরস ইত্যাদি অনুযায়ী এই সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে নাট্যঘটনা এবং চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের মনে আবেগ সঞ্চারিত হয়।

নাটকে এই সঙ্গীতের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাটকে ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়েও মঞ্চসঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। তখন নাটকে সঙ্গীতের গুরুত্ব বিচারে নাট্যশালাকে 'সঙ্গীতশালা' হিসেবেও অভিহিত করা হতো। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে এই সহগীতের নাম ছিল 'ধ্রুবা'। ধ্রুবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত : ১। প্রাবেশিকী চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশকালে গেয়; ২. আক্ষেপিকী বন্দিদশা, রোগাক্রমণ, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থায় গেয়; ৩. নৈষ্ক্রমিকী মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রমণকালে গেয়; ৪. প্রাসাদিকী উত্তেজিত দর্শকচিত্তকে শান্ত করার জন্য গেয়; এবং ৫. অ্তরা প্রধান চরিত্রগুলির বিপদ, উদাসীনতা ও ক্রোধের অবস্থায় গেয়। নাট্যবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সঙ্গীতের এই প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পায় এবং তার প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে।

বাংলা নাটক জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্কীতসমৃদ্ধ, যেহেতু পাশ্চাত্য ও সস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে দেশিয় যাত্রার সম্মিলনেই বাংলা নাটকের জন্ম। যাত্রার প্রাণই হলো সঙ্গীত। কথানাট্য (৯ম-১২শ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলায় জনপ্রিয় ছিল), গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও কৃষ্ণযাত্রায় সঙ্গীতের প্রয়োগ ও প্রচলন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যশিল্পকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করেছে। ষোড়শ শতকে বাংলায় প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রায় বাদ্যযন্ত্র কোরাস সমন্বয়েসঙ্গীতের যে ব্যবহার হতো, তার সূত্র ধরেই উত্তরকালের যাত্রার আবির্ভাব। প্রথম দিকের যাত্রানুষ্ঠানে অভিনয়ের মাঝে মাঝে কণ্ঠসঙ্গীতের যে প্রয়োগ ছিল, পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়। তবে পাশ্চাত্য নাটকের প্রবাবে যাত্রানুষ্ঠান শুরুর পূর্বে বেশ কিছুটা সময় সমবেত বাদ্য বাজানোর প্রথা পরবর্তীতে চালু হয়, যার নাম কনসার্ট। যাত্রার এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলা মঞ্চনাটকে গান ও আবহসঙ্গীতের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা নাটকে একক, দ্বৈত ও সমবেত এই তিন ধরনের সঙ্গীত ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। অভিনয়কালে বিশেষ কোন নাটকীয় মুহূর্তকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্যও নেপথ্য-সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে থাকে।

১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক কাল্পনিক সংবদলে মঞ্চসঙ্গীত সংযোজিত হয়। এরপর সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায় অভিজ্ঞানশকুন্তলে (বঙ্গানুবাদ)। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকে বারোটি গান গাওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময় থেকেই নাটকে গান সন্নিবেশের বাহুল্য দেখা যায়। তাঁর ১৩৭০টি গানের প্রায় সব কটিই নাটকের জন্যই লেখা এবং নাটকেই ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের শুরুতে এবং দৃশ্যশেষে একক বা দ্বৈত সহগীতের মাধ্যমে নাট্যরসকে ঘনীভূত করার চেষ্টা করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। নাটকে দেশাত্মবোধক গানের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটকে অসামান্য সব গানের প্রয়োগ করেন এবং নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে গানের ব্যবহারকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলির (শারদোৎসব, মুক্তধারা ইত্যাদি) অপরিহার্য অঙ্গ গান; গানের মধ্য দিয়েই তাঁর অধিকাংশ নাটকের মূল ভাব ব্যক্ত হয়েছে। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং সাধারণ নাটকেও প্রচুর গান ব্যবহার করে তিনি বাংলা নাট্যরীতিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকগুলি প্রধানত কলকাতার আদর্শই অ্সরণ করে।

স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের মঞ্চনাটকেও সঙ্গীতের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। তবে শিল্পীদের মধ্যে কেউ কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী না হলে সেক্ষেত্রে যন্ত্রের মাধ্যমে এই সঙ্গীত প্রক্ষেপিত হয়ে থাকে। কোন কোন নাটকে গায়ক এবং যন্ত্রিদল মঞ্চের পাশে উইংস-এর ভেতরে, কখনও মঞ্চের পেছনে বা সামনে যে-কোনো স্থানে বসে অভিনয়

চলাকালীন সময়ে পাত্র-পাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী গান, সুর ও শব্দ প্রক্ষেপণ করে। মঞ্চনাটকে সরাসরি ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি, ঢোল, খোল, নাল, করতাল, মন্দিরা, তবলা, হারমোনিয়াম, ড্রাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বহু নাট্যদল নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী রেকর্ডকৃত নানারকম সুর (আনন্দ, করুণ ইত্যাদি), গানের কলি, নানা রকম সাউন্ড এফেক্ট (পাখির ডাক, আযান, ঝড়, বজ্রপাত, ট্রেন, মোটরগাড়ি, ঘোড়ার দৌড়, বোমা, প্লেন, সমুদ্রগর্জন ইত্যাদির শব্দ) প্রক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহার করছে।

■ ৪০৪.২.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যকলা বলতে কী বোঝো?

২। বাংলা নাট্যকলার বিকাশ আলোচনা করো।

৩। বাংলা নাটকে দেশজ রীতির গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪। বাংলা নাটকে ইউরোপীয় রীতির প্রবর্তন কীভাবে ঘটে?

৫। নাট্যকলার বিবিধ উপকরণ বিষয়ে আলোকপাত করো।

■ ৪০৪.২.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ

৪। রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব—ড. জগন্নাথ ঘোষ

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-১

সংলাপের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক নাটক রচনার জন্য বিশেষ কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হয়। বিশেষত তাকে নাট্য-নির্মাণ কৌশল তথা বৃত্ত, উপবৃত্ত, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্যভাবনা, নাট্যদ্বন্দ্ব, নাটকীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে একটি সুন্দর মেলবন্ধনে নাট্যরচনায় অগ্রসর হতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ভূমিকা থাকে নাটকে। তবে সমস্ত কিছুকেই অতিক্রম করে যায় নাটকের সংলাপ। এ বিষয়ে বিতর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা নাট্যোপাদান সম্পর্কে সকল নাট্যতত্ত্ববিদ একইরকম মতামত পোষণ করেন না। ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগা ও যুক্তি-তর্ক ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ প্রয়াস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এখনও সকলে মিলে ঐক্যমতে পৌঁছনো যায়নি। তবে যেকোনো নাটকে সংলাপের গুরুত্বকে প্রায় সকলেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নাটকে সংলাপের প্রয়োগ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই গোটা নাটকই তো প্রায় সংলাপের আদলে গঠিত। অন্যান্য সাহিত্যের মতো নাটকে বর্ণনা বা বিবৃতির সুযোগ কম থাকে। তাই নাটকে শুধু সংলাপই মুখ্য। এখন যাকে আমরা নাট্যসংলাপ বলছি সেটি আসলে কী তা জানা দরকার। নাটকের প্লট বা বৃত্তকে গতিশীল রাখার জন্য নাটকে চরিত্র বা পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক উক্তিই হলো সংলাপ।

সংলাপ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারণার সঙ্গে কিছুটা প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্যের অ্যারিস্টটল তাঁর 'The Art of Poetry' গ্রন্থের কুড়ি থেকে বাইশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সংলাপ প্রসঙ্গে ভাষা, শব্দ ও রীতির বিশদ আলোচনা করেছেন। নাট্য-সংলাপে সেইসকল বর্ণ, শব্দ, শব্দাংশের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, বিভক্তি, কারক প্রভৃতি উপাদানের পরোক্ষ তাৎপর্য হয়ত আছে, তবে প্রত্যক্ষভাবে নাটকের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। নাট্যসংলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল দু-রকম শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—অর্থহীন উপাদানে গঠিত একক শব্দ এবং অর্থযুক্ত উপাদানে গঠিত যুগ্ম শব্দ। একই সঙ্গে তিনি প্রচলিত দেশী শব্দ এবং বিদেশী শব্দের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। সংলাপ অর্থে তিনি শব্দকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। স্পষ্টতই তিনি জানিয়েছেন যে-ক. ভাষার আদর্শ রীতি হচ্ছে স্বচ্ছ। প্রচলিত অথবা সার্থক শব্দ যেখানে ব্যবহৃত, সেখানেই রীতি স্বচ্ছ। তাঁর কথায়-

> "The perfection of Diction is for it to be atonce clear and not mean ... the Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i.e., strange words, metaphors, lengthened forms, and everything that devi- ates from the ardinary modes of speech"৮

খ. নানা ধরনের রীতি প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি রাখা জরুরী, অতিরিক্ত রূপকাশ্রয়ী ও শব্দের অপ্রচলিত বিরলতর ব্যবহার নাটকের ক্ষেত্রে সমীচীন নয়। গ. সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নাট্যসংলাপে রূপক প্রয়োগের দক্ষতা যা সরাসরি কারো কাছ থেকে শেখা যায় না, অভিজ্ঞতা দিয়ে ও বোধ দিয়ে অর্জন করতে হয়। অ্যারিষ্টটলের এই ভাষা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নাটক ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রই সমান প্রযোজ্য। বর্তমানকালেও তার যৌক্তিকতার এতটুকু ঘাটতি হয়নি। নাটকের প্লট বা বৃত্ত পরিকল্পনা ও নাটকের বিষয় থেকেই তার মূল রীতিটি নির্ধারিত হবে এবং সব ক্ষেত্রে সমুন্নত রীতিতে নাটক লিখিত হবে। এছাড়া রূপক প্রয়োগের সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর মতামত সব কালে সব যুগের নাটকের ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সংলাপকে "বৃত্তি" বলে উল্লেখ করেছেন। সে সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা আলোচনা করেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে "বৃত্তি"কে চার প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন যথা—ক. কৌশিকী খ. সাত্ত্বতী গ. আরভটি ও ঘ. ভারতী বৃত্তি।

কৌশিকী বৃত্তি সাধারণত শৃঙ্গার ও হাস্যরসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাত্ত্বতী বৃত্তিটি বীর, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। আরভট্টি ব্যবহৃত হবে রৌদ্র ও বীভৎস রসে এবং ভারতী বৃত্তি ব্যবহৃত হবে অন্যান্য সকল শ্রেণির রসের ক্ষেত্রে। এই চার শ্রেণির বৃত্তির মধ্যে অ্যারিষ্টটল যাকে সমুন্নত বা Grand style বলেছেন তার সঙ্গে সাত্ত্বতী রীতির মিল পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এর মধ্যেই চরিত্রের অধ্যবসয়, দয়া, ত্যাগ, শৌর্য এবং ঋজুতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতী মূলত মৌখিক রীতি। ভরতের মতে ভারতীর মধ্যেই করুণ ও অদ্ভুত রস সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমান। সেদিক থেকে কৌশিকীর মাধ্যমে মাধুর্য রসের আস্বাদন সম্ভব এবং আরভট্টির মাধ্যমে তোজোদীপ্ত রীতির প্রকাশ পায়।

সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথের মতে সংলাপ শব্দটির মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ভরতের "সাত্ত্বতী" রীতির ওপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। উক্ত রীতিকে চারটি পর্যায়ে আলোকপাত করেছেন তিনি-ক) উত্থাপক খ) সাংঘাত্য গ) সংলাপ ও ঘ) পরিবর্তন। বিশ্বনাথের মতে সাত্ত্বতী রীতিমধ্যস্থ এই সংলাপই নাটকের মুখ্য বস্তু। তাঁর কথায় "সংলাপঃস্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাব সমাশ্রয়" অর্থাৎ নানাভাবে ব্যঞ্জনাপূর্ণ গভীরোক্তিই হল সংলাপ। বর্তমানে উক্তি-প্রত্যুক্তি বোঝাতে যে "সংলাপ" শব্দটি ব্যবহৃত হয় তার মূল বিশ্বনাথের এই উপবিভাগ। উক্তির প্রয়োগগত দিক বিবেচনা করে বিশ্বনাথ একে নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে যে উক্তি অন্যের শোনবার নয়, তাকে "স্বগত"; সকলের শুনতে পাওয়া উক্তিকে 'প্রকাশ' অন্য চরিত্রের নিকট গোপন কোনো বিষয় যদি পিছন ফিরে বলা হয় তাকে 'অপবারিত'; তিনটি পতাকার মত হাত দিয়ে অন্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে অন্য সকলের কথার মধ্যে দুজনের পারস্পারিক আলাপচারিতাকে "জনান্তিক"; অন্য কোনো চরিত্র বা পাত্র না থাকলে কোনো অনুক্ত বিষয় শোনবার মত ভান করাকে 'আকাশ-ভাষিত' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নাটকের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা কি ধরনের ভাষা প্রয়োগ করবে এবং কখন করবে তার সুপরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর ওপর আলোকপাত করেই ভরত

চরিত্রকেন্দ্রিক সংলাপ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষিত উত্তম ও মধ্যম শ্রেণির পুরুষ পাত্রগণের ভাষা হবে সংস্কৃত, স্ত্রীলোকের ভাষা হবে শৌরসেনী প্রাকৃত। কিন্তু সঙ্গীত বা শ্লোকের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ভাষা হতে হবে মহারাষ্ট্রী। রাজার অন্তঃপুরবাসিনীদের ভাষা হবে মাগধী চেট। রাজপুত্রদের ক্ষেত্রে অর্ধ-মগাধী, বিদুষকের ক্ষেত্রে প্রাচ্য, ধূর্তগণের ক্ষেত্রে "অবন্তিকা", যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদের দাক্ষিণাত্যা, শক ও শবর শ্রেণির ক্ষেত্রে শবরী ভাষা ব্যবহারের প্রতি তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার এই বিভিন্ন রূপের প্রয়োগবিধি পদ্য রচনার দিকেই নির্দেশ করে বেশি। একথা ঠিক যে, ভরতের সময় নাটকে সচারাচর গদ্যসংলাপের প্রয়োগ-কল্পনা সমীচীন নয়। ভরত শুধুমাত্র শব্দ প্রয়োগের দিকেই নজর দেননি, ভাষা প্রয়োগের ছন্দ কেমন হবে তারও সুনির্দিষ্ট পন্থার উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে। নাটকের মূল বিষয় ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দুরূহ বা দুর্বোধ্য শব্দ বর্জন এবং দর্শকের বোধগম্য সুষম শব্দের প্রয়োগের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যার সঙ্গে অ্যারিষ্টটলেরও মিল পাওয়া যায়।

নাটকের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুজন মনীষীকে কেন্দ্র করেই নাটকের অগ্রগতি ঘটেছে বহুদূর পর্যন্ত। দুজনেই নাট্য-সংলাপকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষা থেকে পৃথক হবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যার হাত ধরে গ্রীক নটাক, রোমান নাটক এবং শেক্সপীয়রীয় নাটকেও পদ্য ভাষার ব্যবহার হয়েছে। ভারতেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই পদ্য-সংলাপের প্রচলন ছিল। কিন্তু নাটক নদীর মতই গতিশীল। কেননা, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। কারণ সমাজের বিচিত্র বিষয় নিয়েই নাটকের প্লট গড়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে প্রাত্যহিক জীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে এসেছে ভাষা। মানুষের চলমান বাস্তব জীবনের ছবি নাটকের মাধ্যমে উঠে আসছে বেশি। তাই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এই বাস্তবতাপ্রধান ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছে বহুল।

বিভিন্ন মনীষীরা সংলাপ ব্যবহারের যে নির্দেশিকা দিয়েছেন প্রয়োগগত দিক থেকে তাকে সম্পূর্ণ বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাত্ত্বিকেরা যে সময়ে তাঁদের নাট্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, সে সময় অতিক্রম করায় নাটকের সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। আমরা জানি সাধারণত নাট্যকারের উদ্দেশ্য নাট্যরচনা, তা সে যেকোনো পরিপ্রেক্ষিতে হোক না কেন। নাট্যকারকে থাকতে হয় নাটকের বাইরে বা মলাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাটক শুরুর পর থেকেই নাট্যকার অদৃশ্য হতে থাকেন। থেকে যায় শুধু তাঁর ভাবনাজাত ফসলগুলি। নাট্যকারকে সব কথা বলতে হয় নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের মাধ্যমে। নাটকে নাট্যকার নীরব, মুখর শুধু তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রী। নাটক যখন মঞ্চস্থ হবে তখন সেটি সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন বলে তখন নিজের দায়িত্ব নিজের কাছে এসেই পড়ে। সাহিত্যের অন্য শাখার বা উপন্যাস, ছোটগল্পে ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার তার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গেই চলবার সুযোগ পান। সেক্ষেত্রে চরিত্র যা সরাসরি বোঝাতে পারে না, সেগুলি গল্পকার বা ঔপন্যাসিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উপমা, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রয়োগ করে পাঠকের হৃদয়ে চরিত্রের ভাব-ব্যঞ্জনাকে বোঝাতে সক্ষম হয়। কিন্তু নাটক ও নাট্য-সংলাপের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তুলমূল্য বিচারে নাটক রচনা ও মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অথবা পাঠক ও দর্শকের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নাট্য-সংলাপকে কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলিও সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা জরুরী।

প্রথমত: সংলাপের প্রথম সমস্যা হলো প্রগতিশীলতা বা অভিসরণ। প্রতিটি দৃশ্যের সংলাপ তথা উক্তিগুলি শুধুমাত্র সেই দৃশ্যের নাট-পরিস্থিতিটিকেই পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তা নয়, ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: মঞ্চ উপস্থাপনার সময় দর্শকদের সঙ্গে নাটকস্থিত চরিত্রের পরিচয় ঘটানো। অর্থাৎ মূল ঘটনার সঙ্গে পাঠক ও দর্শককে উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যে বিভিন্ন বিবরণ বা কৌশলে পরিচয় ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে সেটি একেবারেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দৃশ্যসজ্জা ও সংলাপকে আশ্রয় করেই মূল প্রতিপাদ্যকে নাট্যকার বুঝিয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত: সংলাপ প্রয়োগের ঔচিত্যবোধ। মনে রাখতে হবে নাটকীয় সংলাপের সার্থকতা নির্ভর করে তার Efficiency in presenting and developing the situation of the play-র উপর। সংলাপের যে কৌশলগত উপস্থাপনায় নাটকীয় পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ ঘটে তাকেই সার্থক সংলাপ প্রয়োগ বলে। অর্থাৎ নাটকের ভাব, ভাবনা, চরিত্রের সঙ্গত প্রয়োগ প্রভৃতির সঙ্গে কাহিনী বা ঘটনার সামঞ্জস্যে নাটক অগ্রগতি লাভ করলেই এর উদ্দেশ্য সফল হয়। নাটকের সংলাপ একটি বিশেষ শিল্প, একে যত বেশি সজীব করে গড়ে তোলা যায় ততই নাটক সফলতা পায়। কিন্তু কাজটি যে কতটা কঠিন তা যেকোনো সফল নাট্যকার ও ব্যর্থ নাট্যকারেরাও বোঝেন। দর্শক বা পাঠকের সে দায় নেই। তারা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা ও মনোরঞ্জনের মাপকাঠি নিয়েই বেশি উদ্‌গ্রীব। নাট্যকার ভালো কি মন্দ সেই মৌখিক সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন নাটকের সাফল্য ও অসাফল্যের নিরিখেই। কথার পিঠে কথা সাজাতে গিয়ে বা চরিত্রের মনের কথা অথবা ঘটনার আরও বেশি বাস্তবতার ছবি ফোটাতে গিয়ে কিছু অবান্তর কথা এসে পড়ে। সেগুলি আসাটা স্বাভাবিকও বটে। তবে সেগুলিকে বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে বর্জন করবার কৌশলকে রপ্ত করতে শিখতে হয় নাট্যকারকে। অনেকেই সেটি পারেন না। নাট্য-সংলাপের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার সহজ উপায় বলার ধরন বা ভঙ্গিমার উপরই নির্ভর করে। প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চরিত্রোচিত কথাবার্তা বলার স্টাইলটকু বজায় রাখতে পারলে অস্বাভাবিকত্ব থাকে না।

চতুর্থত নাট্যশ্রেণি অনুযায়ী সংলাপের শব্দ চয়ন বা শব্দ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। কেননা সামাজিক নাটকের সঙ্গে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ও রাজনৈতিক নাটক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সংলাপের গঠন বা নির্মাণ-কৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেদিকে নাট্যকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর এই শব্দচয়ন ও সংলাপ নির্বাচনের উপর বিভিন্ন শ্রেণির নাটকের সাফল্য নির্ভর করে।

পঞ্চমত স্বাভাবিক গদ্য নাটকের সঙ্গে পদ্য-নাট্যের সংলাপের ধরন বা বৈশিষ্ট্য আলাদা হওয়া জরুরী। নাট্যকারের এই সমস্যাকে মাথায় রাখতেই হয়। কেননা, গদ্যে বাস্তব জীবনের যে সহজাত গতি তাকে নাট্যদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই নাট্যকারের অন্যতম কাজ। কাব্য-নাট্য বা নাট্য-কাব্যে অনেক বেশি কল্পনাধর্মীতা ও লিরিকের সুরমূর্চ্ছনার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাওয়া জরুরী। তার জন্য সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারের বিশেষ দক্ষতা দেখাতে হয়। সমাজে যতদিন যাবৎ বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার দাবী আজকের মত এত প্রবলভাবে দেখা দেয়নি, ততদিন পর্যন্ত কবিতাশ্রয়ী নাটকের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আজকের যুগের ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাট্যকারকে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকতে হয়।

ষষ্ঠত নাট্যগতি সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য সংলাপকে হতে হয় খুরধার। ঘটনা ও চরিত্রের প্রয়োজনে ও স্বাভাবিক সংলাপ যোজনায় যে স্বচ্ছন্দ চলিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রে চরিত্রের মুখে প্রসঙ্গ-ভিন্ন সংলাপ প্রয়োগে নাটকের গতি রুদ্ধ হয়। নাটকের মান বজায় থাকে না। দর্শক মনেও পরিতৃপ্তি আসে না। এই সমস্যাকে অতিক্রম করতে নাট্যকারকে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। সর্বোপরি একথাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকে নাট্যশ্রেণিগত সংলাপের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সমস্যা ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্য সংলাপের ঔচিত্যবোধ না থাকলেও নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সেক্ষেত্রে নাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিষয়টিকে যে কোনো মূল্যে পাঠক ও দর্শকের সামনে তুলে ধরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটকের সংলাপ আলোচনায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করা হবে। নাটক শুধুমাত্র কতগুলি চরিত্রের মুখনিসৃত উক্তি প্রতি-উক্তির সমষ্টিগত ফল নয়। তার বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে আরও কতগুলি বিষয়কে নাটকে ব্যবহার করতে হয়। যেমন-কবিতা, গান ইত্যাদি। এগুলি নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত হয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সরাসরি, আবার কখনও নেপথ্যে। কোনো বিশেষ ভাবকে বা রসকে অথবা কোনো বিশেষ ঘটনাকে অল্প সময়ে দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করবার উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহার হয়। নাট্যশিল্পের দিক থেকে এগুলি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে একটি বিশেষ নাট্য-সংলাপেরই অংশ। কেননা, কোনো চরিত্র বা ঘটনার গভীর বিষয় শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তখন তাকে আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য অথবা দর্শক মনের দীর্ঘ ক্লান্তিকে সাময়িক দূর করবার জন্য যখন গান বা সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটানো হয়, তা নাটককে আরও সমৃদ্ধ করে। ফলে তাকেও একটি বিশেষ শ্রেণির নাট্য-সংলাপ বললে ক্ষতি কি?

সমবেত সঙ্গীত থেকে বিবর্তনের পথে কথোপকথনের জন্য নাটকে গানের ব্যবহার ঘটেছে। তাছাড়া রসনিষ্পত্তির দিক থেকেও গানের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে সঙ্গীত বা গান নাট্যসংলাপের একটি বিশেষ উপাদান সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অনেকেই নাটকে গানের ব্যবহারকে বিশেষ পছন্দ করেন না। অনেকেই সঙ্গীতধর্মী নাটককে "মেলোড্রামা" বলে উল্লেখ করে থাকেন। একথা মানতেই হবে যে প্রত্যক্ষ সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকে গানের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় জলবায়ুতে নাটকে গানের প্রাধান্য এখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। বিশেষ করে বাংলা নাটকে গানের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। আজও সেই ধারা অনেকটাই বজায় আছে। গানের ব্যবহার নির্ভর করে নাটকের শ্রেণিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে। এখন কারণে-অকারণে সব শ্রেণির নাটকেই যদি গানের ব্যবহার করা হয় তাহলে, তার ঔচিত্য বজায় থাকে না। যার ফলস্বরূপ সে নাটক অনেক বেশি অসফল হয়ে পড়ে। কিন্তু সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন নাটক লেখা হবে তখন স্বাভাবিক কারণেই নাটকের সঙ্গীতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। কেননা, সমাজের বিভিন্ন সংস্কার, সাংস্কৃতিক লৌকিকতা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে হয়। সেদিক থেকে নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীত বা গানই নাটকের একটি বিশেষ শ্রেণির সংলাপ হয়ে ওঠে। কোথাও নাটকের মাধ্যমে একটি গোটা অঞ্চল বা সমাজের সুখ-দুঃখ প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে দেখা দেয় নাটকের গান। তাই কোনো নাটকে যদি স্বাভাবিক স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে সার্থক ভাবে গানের প্রয়োগ ঘটে, তাকে নিন্দা করার কোনো কারণ ঘটতে পারে বলে মনে হয় না।

পত্র ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ ৩

একক-২

সংলাপের গুরুত্ব

নাটকে সংলাপের সীমাহীন গুরুত্বের কথা যে কোনো নাট্যকার, নাট্যসমালোচক নাট্যতত্ত্ববিদ ও নাট্যাগ্রহী দর্শক ও পাঠকই স্বীকার করেন। নাটকে সংলাপের গুরুত্ব ঠিক কতটা একথা না বলে বরং বলা উচিৎ সংলাপই নাটক। কারণ সংলাপ ছাড়া নাটকে আর আছেইবা কী? নাট্যকারের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাকে যখন নাটকের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেন, তখন তাঁকে প্রায় সম্পূর্ণই সংলাপের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অন্যান্য সাহিত্যের মতো বর্ণনা বা বিবৃতির অবকাশ এক্ষেত্রে খুবই কম। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, নাট্যকার তাঁর যাবতীয় বক্তব্যই চরিত্রের সংলাপে প্রকাশ করতে পারেন না। নাট্যকারের যদি মনে হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সংলাপের উচ্চারণ করার ব্যাপারে কোনো একটি চরিত্র নির্ভরযোগ্য, তাহলেই তিনি তার জন্য সংশ্লিষ্ট সংলাপ রচনা করে নাট্যরূপ দেন। উপন্যাসের ভাষারীতিকে যেমন বর্ণনামূলক, কাব্যিক, নাটকীয় প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নাটকের সংলাপে সেরকম ভাগের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। নাটকের চরিত্র যে প্রকৃতির হবে সংলাপের প্রকৃতিও সেরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই কারণে একই নাট্যকারের লেখা নাটকের বিভিন্নতার ও চরিত্রের বৈচিত্র্যে সংলাপও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শেক্সপীয়রের “জুলিয়াস সীজার” নাটকে সীজার যে ভাষায় কথা বলে “ম্যাকবেথ” নাটকে ম্যাকবেথ সে ভাষায় কথা বলে না। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” নাটকে গোলোক বসু যে ভাষায় কথা বলে “সধবার একাদশী” নাটকে নিমচাঁদ সেই ভাষায় কথা বলে না, এটাই বাঞ্ছনীয়। আবার একই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের জন্য শব্দচয়ন বা ভাষা ব্যবহারও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, গোলক বসুর উদ্ধৃতি—

> “বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমিজমা কর্‍্যে গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরী স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়।”

এই উক্তির সঙ্গে ঐ নাটকের উড সাহেবের ভাষা ব্যবহারে নাট্যকার কত বেশি পৃথকভাবে গড়ে তুলেছেন তা আশা করি একটি উক্তির মধ্যে দিয়েই বোঝা যাবে—

> “তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোমদোরস্ত হোগা নেই।... জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম কুছু শুনা নেই তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বল নি-।”

নাটকের শ্রেণিচরিত্র এবং ভিন্নতায় সংলাপের যেমন পার্থক্য হয়, ঠিক তেমনি নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ীও চরিত্রের সংলাপ পাল্টে যায়। লঘু হাস্যরসের নাটকের সঙ্গে গুরু-গম্ভীর ট্র্যাজেডি নাটকের ভাষা বা রূপক

সাংকেতিক নাটকের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। এছাড়া নাটকে প্রাচীন কাল থেকে স্বগতোক্তির উল্লেখ থাকত। অর্থাৎ কোনো চরিত্র যখন তার মনের কথা নিজে নিজেই উচ্চারণ করে কাউকে না শুনিয়ে, তাকেই স্বগতোক্তি বলে। নাটকের যত বৈচিত্র্য এসেছে ও আধুনিক শিল্প-মাধুর্য যুক্ত হচ্ছে এই স্বগতোক্তির ব্যবহারও ক্রমশ কমে আসছে। এবিষয়টিও সংলাপের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সবদিক বিচার বিশ্লেষণে নাটকে সংলাপের গুরুত্বই যে মুখ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নাটকের মধ্যে নির্দিষ্ট কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সংলাপকে অন্যান্য নাট্যাংশ থেকে পৃথক করা যায়। যথা-

প্রথমত: নাটকের প্লট ও চরিত্রের সঙ্গে সংলাপের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকতে হবে। নাট্যবৃত্তের ক্রিয়াগত অগ্রগতি ও চরিত্রের ভাষ্যরূপে নাটকে সংলাপ বা ভাষা ব্যবহৃত হবে। অবাস্তব সংলাপ সর্বত্র বর্জন করতে হবে এবং তাকে হতে হবে প্রাণময় ও গতিসম্পন্ন। যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির নির্মাণ হবে সেই পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সংলাপের একটি সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সংলাপকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় গুণান্বিত হতে হবে। এর জন্য নাট্যকারের বিভিন্ন নাট্যকৌশল অবলম্বন করা জরুরী। কখনও বাক্যগত সুরের উত্থান-পতন, কখনও একই শব্দের একাধিকবার প্রয়োগ, কখনও গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনি, বর্ণসমাবেশ ইত্যাদির দিকে নজর দিতে হবে। একই স্থানে একজন পাত্রের মুখে অন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও দীর্ঘ সংলাপ বাঞ্ছনীয় নয়। বাক্যে ও শব্দে নাট্যশ্লেষের প্রয়োগ, নানান উপমা ও অলঙ্কারের প্রয়োগ ছাড়াও রূপকল্প সৃষ্টির সাহায্যে সংলাপকে প্রশংসাযোগ্য করে গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া কর্তব্য।

তৃতীয়ত: নাটকের সংলাপকে গতিনির্ভর, যথোপযুক্ত ও স্বাভাবিক করে গড়ে তুলতে হবে। আমরা জানি যে, পাত্র-পাত্রী বা নাটকে ব্যবহৃত চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে সংলাপ। তাই যে চরিত্রের মুখে যে সংলাপ বা নাটকীয় ভাষা ব্যবহৃত হবে তা যেন ঔচিত্যবোধ-এর সীমা লঙ্ঘণ না করে।

চতুর্থত: নাট্য-সংলাপ হওয়া উচিত তাৎক্ষণিক ও অন্যান্য সাহিত্য উপাদান থেকে বেশি প্রাণবন্ত। নাটকের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সংলাপের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ নাট্য-প্লটটি যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার জনপদ, সংস্কার, সংস্কৃতি, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, প্রথা, আচার-আচরণ প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদির একটি সুস্পষ্ট আভাস নাটকের সংলাপে ধরা পড়ে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পঞ্চমত: নাট্যদ্বন্দ্ব বা কোনো জটিল পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটে নাটকে। সেই প্রয়োজনীয়তাও স্বাভাবিক। আবার দুটি চরিত্রের মধ্যে যখন কোনো আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলে এবং একে অপরের উক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কথা বলবে তখন, সেই মুহূর্তের সংলাপকে গড়ে তুলতে হবে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও আবেদনবাহী। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটকে সংলাপের বৈচিত্র্য তুলে ধরাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

বাংলা নাটকে সংলাপ ব্যবহাবের সূত্রপাত উদ্ভবকাল থেকে বাংলা নাটকে সংলাপের ব্যবহার বিচিত্র পদ্ধতিতে হয়ে এসেছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সময়ের বাংলা নাটকে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংলাপের সেই সকল প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হলেও নাটকে সাফল্য এনে দিয়েছে, কখনওবা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সংলাপের সেই বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম পর্বের বাংলা নাটকে গদ্যভাষা ও পদ্যভাষার মিশ্রিত ব্যবহার দিয়ে মৌলিক নাট্যধারার সূচনা হয়। যেমন, জি.সি. গুপ্তের "কীর্তিবিলাস" তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" নাটক। উক্ত নাটক দুটিতে পদ্যের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি যথা

পয়ার ও ত্রিপদী পয়ারের ব্যবহার হয়েছে। সাধারণ পাঠক ও অভিনেতাদের পক্ষে তা অনেক বেশি আড়ষ্ট মনে হওয়ায় ক্রমশ তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। একই কথা গদ্যশৈলীর ক্ষেত্রেও বলা যায়। সেখানে সংস্কৃত তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এত বেশি যে, তা মঞ্চে সংলাপে রূপ দেওয়া খুবই মুশকিল ছিল। "ভদ্রার্জুন" নাটকে তারাচরণ শিকদার পদ্য বাক্যগুলিকে অনেকটা হ্রস্ব উচ্চারণ ও বাক্যগঠনের সমন্বয় আনার সচেতন প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এবিষয়ে উভয় নাটক থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরলে আমদের কাছে বিষয়টি অনেক স্পষ্ট হতে পারে। দ্বারকায় বসুদেবের শয়ণকক্ষে দেবকী ও বসুদেবের কথোপকথন—

> "দেব। হে বসুদেব, ভাবিতে ভাবিতে আমার জীবন গেল, একক্ষণের তরেও সুস্থ হইতে পারিলাম না। বসুদেব। আবার তোমার কি ভাবনা উপস্থিত হইল? আমি জন্মদুঃখিনী দুঃখের নাহি ওর। রোদনে রোদনে জন্ম নিশা হইল ভোর।। দুষ্ট কংস বদ্ধ করেছিল কারাস্থলে। হস্তপদ নিবন্ধন করিয়া শৃঙ্খলে।। ছয় পুত্র স্বহস্তে মারিল দূরাচার। পুত্র শোকে জরজর জীবন আমার।।"

উদ্ধতাংশটিতে কাব্যের পয়ার ছন্দ ও সাধু গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া সমগ্র নাটকটিতে গদ্য ও পদ্যের এই মিশ্র সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নাট্যকারের এছাড়া বিশেষ কিছু করবার ছিল না। কেননা, চলিত গদ্যের ব্যবহার শুধু নাট্যরচনার কোনো আদর্শ (বাংলা নাটকে) তাঁর সামনে ছিল না। যেটুকু মৌলিকতা দেখিয়েছেন নাট্যকার, তার জন্য নাট্যামোদী পাঠক ও দর্শক-সহ নাট্যরচয়িতারা তাঁর কাছে ঋণী। কেননা, মৌলিক বাংলা নাট্যরচনা তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়। বাংলা মৌলিক নাটকের অভাব ও "ভদ্রার্জুন" নাটকের রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাট্যকার "বিজ্ঞাপন" অংশে আক্ষেপের সুরে উল্লেখ করেছিলেন যে—

> "এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়াৎ নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীতের দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ।"

তারাচরণবাবুর নাটকটি কোনোদিন মঞ্চস্থ হয়নি। মঞ্চস্থ হবার সঙ্গত কারণও ছিল না। কেননা সেমসয় ইংরেজি নাটক ও নাট্যশালা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তাছাড়া সংলাপের খামতি নাটকটিকে মঞ্চের পিছনে রেখে দেয়। নাট্যকার নিজেও হয়ত সে সসম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই তিনি একে একটি পাঠ্য নাটক হিসেবে রচনা করেছিলেন। নাটকের "বিজ্ঞাপন" অংশে তিনি লিখেছিলেন—

> "বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার পরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছার আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সু-ভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিংবা অতি কঠিত শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমত নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থসৌন্দর্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল।"

নাট্যকারের এই উক্তির মধ্যে তাঁর নাটকের ব্যর্থতার ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সংলাপের সঠিক ব্যবহারের দ্বারাই যে একটি নাটক সম্পূর্ণতা পেতে পারে তারও ঈঙ্গিত দেন নাট্যকার তারাচরণ। কিন্তু কোনপথে তা সম্পূর্ণ বাস্তবে রূপ পেতে পারে তার কোনো সঠিক ভাবনা তিনি বার করতে পারেননি। বাংলা নাটকের উদ্ভবকালে হয়তো সেটি সম্ভবও ছিল না।

উদ্ভব যুগের মৌলিক বাংলা নাটক হিসেবে "কীর্তিবিলাস" প্রথম পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে লিখিত বিয়োগান্তক বা ট্র্যাজেডিমূলক নাটক। এটি রচিত হলেও অভিনয় ও নাট্যসাহিত্য হিসেবে বিশেষ কোনো কীর্তি স্থাপন করতে পারেনি। নাটকের সংলাপ সেই "ভদ্রার্জুন" নাটকের মতই পদ্য-গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত এবং গদ্য-পদ্য উভয়েরই ভাষাশৈলী প্রাচীনপন্থী। এছাড়া অতিরিক্ত স্বগতোক্তির প্রয়োগে নাটকের গতি আরও বেশি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু বাংলা নাটকের সংলাপ বিচার বা অন্য যে কোনো নাট্য-আলোচনায় "কীর্তিবিলাস"-এর প্রসঙ্গ এসেই যায়। তার ওপর আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে "কীর্তিবিলাস"-এর শিল্পগত বিচার-বিবেচনা করতে বসলে নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে মৌলিক বিচার করা হবে না। কেননা, ওই নির্দিষ্ট যুগের সময় ও চাহিদা অনুসারে সেটিই ছিল শ্রেষ্ঠ রচনা। পরবর্তীকালে সময়ের ধারা বেয়ে তার অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে আজকের নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই শুরুতে যে নাট্যরচনা ও সংলাপ রচনার ধারা সূচিত হয় তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া "কীর্তিবিলাসে"র আরও একটি দিক থেকে গুরুত্ব অনেক। সেটি হলো-বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই সূচনালগ্নে অন্ততপক্ষে একজন নাট্যকার ইউরোপীয় আদর্শের ট্র্যাজেডি রচনার কথা ভেবেছিলেন। অ্যারিষ্টটলের মতামতকে মান্যতা দিয়ে তিনি নাটকের 'ভূমিকায়' লিখেছিলেন-

> 'অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবত অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপীয়ার নামা ইংলন্ডায় মহাকবি লিখিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী।'

শুধু এই বিবেচনাতেই নাটকটির গুরুত্ব অনেক। পরবর্তীকালে প্রহসন ও সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় বাংলা নাটককে সংলাপ রচনায় অনেক বেশি সার্থকতা ও মৌলিকতা দেখিয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা তার ব্যাখ্যা করব। রামনারায়ণ প্রবর্তিত একই চরিত্রে কখনও সাধুভাষা কখনও চলিত ভাষার ব্যবহার মধুসূদন দত্ত গ্রহণ না করলেও দীনবন্ধু মিত্র গ্রহণ করেছিলেন। সংলাপগত দিক থেকে মধুসূদনের প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"-ই সবচেয়ে বেশি সার্থক। বাংলা চলিত রীতির অসামান্য ব্যবহার তাঁর প্রহসনগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্য জগতে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও শুধুমাত্র "পদ্মাবতী" নাটকে কলির মুখে কিছুটা অংশ ব্যতীত তিনি তাঁর কোনো নাটকে আর কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেননি। বিষয়টি তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ হলেও সাধারণ দর্শকদের কথা ভেবে তিনি সেই রীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই ছন্দের ব্যবহার নাটকের সাবলীলতাকে অনেক বেশি গতিহীন করে তোলে। তাই একে বর্জন করাই শ্রেয় বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যসাহিত্যকে শুধুমাত্র নাট্যমঞ্চের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে না চেয়ে তাঁর রচিত নাটককে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই সুবাদে 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' নাটকে মধুসূদন পরবর্তী অমিত্রাক্ষর সংলাপকে বহুল ব্যবহার করেছিলেন।

অমিত্রাক্ষর সংলাপের ব্যবহারের পরে ভাঙা অমিত্রাক্ষর সংলাপের ব্যবহার শুরু হয় রাজকৃষ্ণ রায়-এর 'হরধনুভঙ্গ' নাটকের মাধ্যমে। সমসাময়িককালে নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেই ধারাকে আরও বেশি সুদূরপ্রসারী করে তোলেন তাঁর "রাবণ বধ" নাটকের মাধ্যমে। ক্রমশ গিরিশের নাট্যরচনার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর সংলাপ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শক ও সাধারণ পাঠকবর্গও একে সহজেই মেনে নেন। এই শ্রেণির

নাট্যসংলাপকেই বলা হয় "গৈরিশ ছন্দ"। চৌদ্দটি অক্ষরে অমিত্রাক্ষরের পদ্য পংক্তিকে সীমিত না রেখে, তাকে ভেঙে সাজালে নাটকে অভিনয়ের বিশেষ সুবিধে হয়। এই ছন্দ তখন স্বাধীনতা পেয়ে আরও বেশি শ্রুতিমধুরতা আনে। এই ধারণা থেকেই গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকে ওই বিশেষ রীতিটিকে অবলম্বন করে অনেক নাট্যসংলাপ রচনা করেছেন। যেমন-গিরিশের 'রথ' অংশের প্রথমে মুদ্রিত কয়েকটি ছত্রে তৎকালীন বাংলা নাট্যসংলাপের ছন্দ ব্যবহারের অসম পংক্তির প্রবহমান ছন্দ নাট্যপ্রেমীদের কাছে সত্যই বিস্ময়কর লাগে-

> 'হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে, রহস্য রসের রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র-দেবী সরস্বতী বরে। কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে, যার যা অধিক আছে "তিরস্কার" কিংবা "পুরস্কার" দিও তাহা মোরে-বহু মানে লব শির পাতি।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকে সংলাপের আরও একটি ধারার সূত্রপাত হয়েছিল রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "বিক্রমাদিত্য" নাটকের মাধ্যমে। নাটকটি ছিল "পদ্য পংক্তি ধরনের গদ্য"-শ্রেণির। অভিনয়কলা ও অভিনেতা-অক্ষ্ম ভিনেত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ধারার সংলাপের সূচনা হলেও তা বাংলা নাটকে গৃহীত হয়নি। এভাবে বাংলা নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পদ্য-ছন্দগত সংলাপ ব্যবহারের দিকে নাট্যকারদের একটি বিশেষ ঝোক থাকলেও ধীরে ধীরে চলিত শুদ্ধ গদ্যের দিকে বাংলা নাটকের সংলাপ এগিয়ে গিয়েছে সহজাতভাবে। বাংলা কথ্য গদ্যরীতি আধুনিক বাংলা নাটকের সংলাপ হিসেবে সকল নাট্যকার দর্শক-পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নাটকের যত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে তার মধ্যে সংলাপ একটি। চরিত্র সকলের সিংহভাগ প্রকাশ ঘটে সংলাপের মধ্য দিয়ে। নাটককারের বক্তব্য প্রকাশের প্রধান সহায় এই সংলাপ। সর্বোপরি একটি নাটকের অন্তর্গত কাহিনীর অবয়ব তৈরি হয় এই সংলাপকে আশ্রয় করেই। তাই সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের গুরুত্ব সংক্রান্ত এই কথাগুলোকে মনে রেখে আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটকের সংলাপ। আমরা এই নাটকের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে নাটকের ও নাটককারের মূল বক্তব্য বুঝে নেবো। আমরা যদি চরিত্রগুলোর সামাজিক অবস্থান অনুসারে সংলাপকে বিশ্লেষণ করি তাহলে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে বক্তব্য তা মনে করি।

নাটকের বিষয় হ'ল উত্তরকূট ও শিবতরাই নামক পাশাপাশি অবস্থিত দুটি জনপদ। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তার রাজ্যের যন্ত্রবিশারদ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দায়িত্ব দেন মুক্তধারা ঝরনার ওপর বাঁধ বাঁধতে। এতে শিবতরাইয়ের প্রজারা জল না পেয়ে ক্রমে ক্রমে মারা যাবেন। যদিও শাসক হিসেবে যুবরাজ অভিজিৎ সেখানে নিযুক্ত। কিন্তু তাতে রাজার স্বস্তির চেয়ে চিন্তাই বেশি। কারণ অভিজিৎ শিবতরাইয়ের প্রজাদের খাজনা মকুব করে দেন। তাই রাজা যারপরনাই অখুশি। তাছাড়া শিবতরাইয়ের সাথে উত্তরকুটের একটা চিরকেলে বিরোধও আছে। রাজা রণজিতের পিতামহদের সময় থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে যাতে শিবতরাইয়ের পশম বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যেতে পারে। আসলে শিবতরাইকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আনতে চান রণজিৎ। এই কারণে জলের উৎস বন্ধ করে দেবার চেষ্টা। পঁচিশ বছরের চেষ্টায় যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হন। এই সাফল্য উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয় রাজ্যেরই উত্তরভৈরব মন্দিরের সামনে। বাঁধ বাঁধার এই খবর অভিজিৎ পান। তিনি জানতে পারেন ওই বাঁধের ত্রুটি। বিভূতির "এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত" করার জন্য যেদিন রাজা রণজিৎ উদ্যোগী হন সেদিন রাত্রে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দেন এবং নিজে সেই স্রোতে ভেসে যান। অভিজিৎ নিজের জীবন দিয়ে জীবনের চলমানতাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যান। এই হল নাটকের মূল বক্তব্য। এই সমগ্র বক্তব্য বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে যেভাবে উঠে এসেছে তা এবার আলোচিত হবে। তার

আগে আমরা যদি চরিত্রগুলোকে সামাজিক আধিপত্যপরম্পরা (Hierarchy) অনুযায়ী সাজাই তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমেই আছেন উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশের রাজা রণজিৎ। তিনি তার শাসন ব্যবস্থা সচল ও বাধাহীন করার জন্য মন্ত্রী, সেনাপতি, যন্ত্রবিদ, প্রহরী, দূত, পূজারী প্রভৃতি নিয়ে একটি সক্রিয় বৃত্ত তৈরি করে রেখেছেন। এরা শাসনযন্ত্রের মূলে। এরপর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন যুবরাজ অভিজিৎ, যুবরাজ সঞ্জয় এবং মোহনগড়ের খুড়ো মহারাজ। তৃতীয় তথা শেষ স্তরে রয়েছেন বটুক, ধনঞ্জয়, বাউল ও শিবতরাইয়ের প্রজা। জনতা, কঙ্কর, পথিক, কুন্দন, নরসিংহ, বনোয়ারি, শিক্ষক ও ছাত্রদল। এদের সকলের সমবেত সংলাপে গড়ে উঠেছে "মুক্তধারা"।

প্রথমেই উত্তরকুটের রাজা রণজিতের সংলাপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিভূতিকে তার মহান কীর্তির জন্য রাজা স্বয়ং তাকে সম্মানিত করতে উৎসবের আয়োজন করেছেন। উত্তরভৈরব মন্দিরের সামনে সন্ধেবেলা সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। তাই রাজা ঐ মন্দিরে যাওয়ার আগে পথের পাশে আমবাগানে শিবির স্থাপন করেছেন, সেখানেই প্রথম রাজার সংলাপ শোনা যায়। প্রথম সংলাপে তিনি বুঝিয়ে দেন তার মনোভাব। মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন-

> "শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু, মন্ত্রী, তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?"

পৃথিবীর সকল কালের সকল দেশের রাজার মতো বিরুদ্ধ স্বরকে বন্ধ করে দিতে চান এই রাজা। তাই বাকস্বাধীনতা হরণ করতে চান ধনঞ্জয়ের। এক সময় রাজার নির্দেশে ধনঞ্জয়কে বন্দী করা হয়। ঠিক একই কারণে খুড়ো মহারাজ তার কাছে "আত্মীয়রূপী পর"। কারণ খুড়ো মহারাজ যুবরাজ অভিজিৎকে সত্যের সন্ধান দেন। যা রাজার পক্ষে দুঃসহ। তবে রাজারাও অশনিসংকেত দেখলে প্রমাদ গণে। রাজা মন্ত্রীকে বলেছেন-"দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয়" রাজার মুখ দিয়ে যে সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে তাতে তাকে স্পষ্ট চেনা গেছে। তার অবস্থান অনুযায়ী সংলাপ সংযোজন করেছেন নাটককার তার মুখে। যন্ত্ররাজ বিভূতি তার প্রথম সংলাপে নিজের অবস্থান, মানসিকতা, উদ্দেশ্যকে চিনিয়ে দেন। অনেক প্রাণের বিনিময়ে বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাতে তার কোন অনুতাপ নেই। তিনি জানান-"তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।" রাজানুগ্রহে এই জাতীয় মানুষ দাম্ভিক হয়ে ওঠেন। তাই বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য যদি একটি জনপদের মানুষকে জল না দিয়ে তিলে তিলে মেরে ফেলাও হয় তাহলেও তার দম্ভ ঘোচে না। বরং অনেক বেশি ঔদ্ধত্য নিয়ে মন্তব্য করে বসেন- "বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোনচাষির কোনভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।" এবার বলা যাক অভিজিতের কথা। যুবরাজ অভিজিৎ তার সংলাপে প্রতি মুহূর্তে আমাদের এক রহস্যময়তার জগতে নিয়ে গিয়ে ফেলেন। নাটকের প্রায় শুরু থেকেই তার প্রসঙ্গ আছে। একেবারে শেষ পর্যন্ত তার উপস্থিতি। তার উচ্চারিত প্রথম সংলাপ থেকেই তিনি রহস্যময়তার জাল বিছিয়ে দিতে থাকেন। সঞ্জয় বুঝতে পারেন না কেন অভিজিৎ রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চান। উত্তরে অভিজিৎ জানান-

> "সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি।"

এই তো সেই রহস্যময়তা।

শেষ পর্যন্ত আলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন অভিজিৎ। মুক্তধারার বাঁধ তিনিই ভাঙেন। নিজের মৃত্যু দিয়ে প্রাণের প্রবাহকে রক্ষা করেন। চিরকালের মতো। ব্যষ্টির আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই আসে সমষ্টির বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি। অভিজিতের সংলাপ এ নাটকে একদিকে যেমন পরিণামমুখী তেমনি অন্যদিকে নাটক গঠনের প্রধান সহায়ক অর্থাৎ অভিজিতের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটককার একটা উৎকণ্ঠা তৈরি করেন ও তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখেন। যেখান থেকে রহস্যময়তারও সৃষ্টি। সব মিলিয়ে অভিজিতের সংলাপ নাটকের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে।

আমরা এবার দেখে নিতে পারি ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংলাপ। ধনঞ্জয় বৈরাগী রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটা সত্তা যেন। এই বৈরাগী যেন চারণকবির ভূমিকা নিয়েছেন নাটকে। তিনি জনচেতনা জাগিয়ে তোলেন সর্বদা। সত্য-মিথ্যের তফাৎ বোঝান নিজের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। প্রজাদের জ্ঞানের দৃষ্টি যাতে আচ্ছন্ন না হয় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর। তাই রাজার সামনে ভয়-ডরহীন ভাবে বলে চলেন-

> "ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।"

আবার রাজসিংহাসন সম্পর্কে এ সত্যও তিনি জানিয়ে দেন যে, রাজা হলেই রাজাসনে বসেন, রাজাসনে বসলেই রাজা হন না। আসলে সিংহাসন "তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাতজোড় করে বসা চাই।" ধনঞ্জয়ের সংলাপের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো কথায় কথায় গান গেয়ে ওঠা। সে গান একদিকে যেমন আনন্দের আবার অন্য দিকে প্রয়োজনের; তত্ত্বেরও। জনতা চরিত্রের সংলাপের কথা আলাদা করে বলতে হয়। এতই তার দ্যুতি যে সহজেই নজরে পড়ে। শিবতরাই ও উত্তরকূট উভয় প্রদেশের প্রজাদের মুখের সংলাপ খুবই প্রাণবন্ত। এবং তা প্রতিটি চরিত্রের "ইমেজ" যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছে। একটা উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক-

শিবতরাইয়ের জনতা :

> "১। দেখেছিস ভাই, কী চেহারা ঐ উত্তরকুটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি। বিধাতা গড়তে
>
> ২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা?
>
> ৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।"

উত্তরকুটের জনতা :

> "১। ও ভাই, ঐ-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।
>
> ২। কী করে বুঝলি?
>
> ১। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কিরকম অদ্ভুত দেখতে। যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।"

এর অতিরিক্ত আরো কয়েকটি ছোট অথচ সংলাপে উজ্জ্বল চরিত্রের সংলাপের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যেমন গুরুমশায়। তিনি একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের আক্ষ্ম

দর্শহীনতার শিক্ষা দিচ্ছেন। দ্বেষক মনোবৃত্তি তার মজ্জাগত। চরিত্রটি হাস্যকর হয়ে উঠেছে বটে নাটকে কিন্তু এক ভয়ানক অবক্ষয়কেই চিহ্নিত করেছেন নাটককার তার মধ্যে দিয়ে। তিনি উগ্র স্বাদেশিকতা (Chauvinism)-য় বিশ্বাসী। তাই বলেন-

> “নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকুটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।”

শিক্ষকের নীতিভ্রষ্টতা, ঔদার্যহীনতা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলদায়ক। সেই সত্যকেই তুলে ধরলেন এখানে রবীন্দ্রনাথ। আবার আলাদা করে চরিত্র বিশ্লেষণ না করেও শুধু সংলাপেই যে চরিত্রগুলোকে সহজেই শনাক্ত করা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হুব্বা ও কঙ্কর। প্রথমেই হুব্বার কথা বলা যাক। তিনি যাত্রাদলের গায়ক। তার কথার মধ্যে রস আছে যথার্থই। যেমন তিনি আন্দু অধিকারীর সম্পর্কে পথিককে বলেন-

> “অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ-ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না-সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও-না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।”

এবার কঙ্করের সংলাপ। লছমনের স্ত্রী অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাকে নন্দিসংকটের গড় আবার গাঁথবার জন্য জোর করে নিয়ে যেতে চায়। তাতে লছমন নিমরাজি হলে তিনি বলেন-

> “তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে-তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।”

আর আলাদা করে বলবার দরকার পড়ে না চরিত্রটি সম্পর্কে। এ ছাড়াও অম্বা ও বটুক চরিত্র দুটি নিজ নিজ সংলাপের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ এই নাটকের সংলাপ বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ সংলাপের মধ্য দিয়ে শ্রেণিচরিত্রগুলোকে যথার্থ ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি অনেকের অনেক সংলাপ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাধর্মী। কোন কোন সংলাপ আবার কাব্যধর্মী (বিশেষত অভিজিতের)। সর্বোপরি গতিশীল মনোহারী মন্ত্রস্বরূপ সংলাপ এ নাটকের প্রাণ।

পত্র ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ ৩

একক-৩

বাংলা সামাজিক নাটকে সংলাপের বৈশিষ্ট্য

বাংলা সামাজিক নাটকে সংলাপের বৈশিষ্ট্য ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সামাজিক নাটকে ব্যবহৃত সংলাপ।

সামাজিক নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য বিষয়টি নাট্যসংলাপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কেননা সেটি নাটকেরই একটি শাখা মাত্র। তাই নাটকের সংলাপই মূলত সামাজিক নাটকের সংলাপ একথা নিশ্চিত। তবে নাটকের শ্রেণিগত পার্থক্যে সংলাপেরও বিশেষ কতগুলি মৌলিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। আর তাই কোনোটি ঐতিহাসিক, কোনোটি পৌরাণিক আবার কোনোটি সামাজিক নাটক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র সংলাপের ভিত্তিতেই কোনো একটি নাটক তার ক্ষেত্রগত পরিচয় লাভ করে না। তার সঙ্গে নাটকের কাহিনী, দ্বন্দ্ব, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়গুলোও নির্ভর করে।

নাটকে সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকারকে বিশেষ কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রত্যেক দৃশ্যের পংক্তিগুলো শুধু সেই দৃশ্যের পরিস্থিতিটিকেই পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তা নয়, অধিকন্তু ভাবী পরিণতির দিকেও যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। যে ঘটনা থেকে সমস্ত ঘটনার বিস্তার ও ক্রমপরিণতি সেই ঘটনার সঙ্গে দর্শক বা পাঠকের পরিচয় করানো। উপন্যাসে লেখক নানা উপায়ে এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সোজাসাপটা বিবরণের মাধ্যমে আরম্ভ করতে পারেন। অথবা কাহিনীর মাঝামাঝি কোনো স্থান থেকে আরম্ভ করে অতীতকে flash back প্রক্রিয়ায় তুলে আনতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারকে যা করতে হবে তা সম্পূর্ণই পাত্র-পাত্রীর সংলাপকে আশ্রয় করে। সেক্ষেত্রে কাহিনী কৌতূহলকে অক্ষুন্ন রেখে পাত্র-পাত্রী চারিত্রিক সঙ্গতি ও ঔচিত্য বজায় রেখেই তা সম্পূর্ণ করতে হয়। নাট্যকার কখনও নাটকের পাত্র-পাত্রীকে শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন করবার জন্য ব্যবহার করতে পারেন না। তাদের সঙ্গে চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। এই কারণে নাটকে উপস্থাপনা একটা মস্তবড় সমস্যা। তবে কৃতী উপস্থাপকেরাই একমাত্র পরিস্থিতি ও চরিত্র উপযোগী সংলাপের মাধ্যমে সহজভাবে নাটকের পটভূমি ও ক্রিয়াভূমিকে আলোকিত করে তুলতে পারেন। অবশ্য বর্ণনা, স্বগতোক্তি, টিপ্পনী, আকাশভাষণ, নেপথ্যউক্তি প্রভৃতির অবতারণা নাটককে অনেকটা দুর্বল করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য উপস্থাপনায় এই দুর্বলতাগুলো অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনায় তাঁরা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

নাট্যকারকে মনে রাখতে হয় যে, সংলাপের সার্থকতা নাটকীয় পরিস্থিতি ও ক্রমবিকাশের সাফল্যের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সংলাপের যে প্রধান উদ্দেশ্য ভাব ও ভাবনাসম্পন্ন চরিত্রের সুষ্ঠু ও সঙ্গত রূপায়ণ

এবং সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর বা ঘটনার অগ্রগতি সাধন, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করা দরকার। তাঁকে আরও মনে রাখতে হয় যে, নাটকের নাটকীয় সংলাপ একটি বিশেষ শ্রেণির কথোপকথন এবং তাকে সজীব করতে হলে অবশ্যই কথোপকথনের সাধারণ ধর্মটিকে বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। এই ধর্ম যতটা বেশি বজায় থাকবে নাটকের সংলাপ ততটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই স্বাভাবিকত্ব আবার নির্ভর করে প্রধান দুটি বিষয়ের ওপর। একটি হচ্ছে বলবার বিষয় ও দ্বিতীয়টি বলবার ধরনের ওপর। বলবার বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় কথোপকথনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে কথা সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনবরত চলাফেরা করে। এরই সূত্র ধরে কথার মধ্যে অবান্তর কথাও এসে পড়ে। নাট্যকারের হাত-পা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বাঁধা না থাকলেও তিনি যথেচ্ছাচার করতে পারেন না। অবান্তর কথাগুলোকে তাঁকে বর্জন করতে হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেই অবান্তর কথাকেও নাট্যসংলাপ হিসেবে তুলে ধরবার প্রবণতা অনেক নাট্যকারের বিশেষ শ্রেণির নাটকে লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে নাট্যকার না চাইলেও যুগের চাহিদা ও নাটকের প্রয়োজনে সে কাজ করতে অনেকটাই বাধ্য হন বলা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকারদের সেটি করতে হয়েছে।

অপরপক্ষে বলার ধরন প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার সহজতম উপায় হলো বলার ভঙ্গি বা ধরন। পাত্রোচিত কথাবার্তা বলার স্টাইলটকু বজায় রাখতে পারলে স্বাভাবিকতা আপনা থেকেই চলে আসে। এমন কি কথ্যভঙ্গি থেকে দূরে থাকলেও ছান্দিক বাক্য প্রকাশ করেও পাত্রোচিত কথাবার্তা এবং বলার স্টাইল আমদানী করে অনেকটাই স্বাভাবিকতা আমদানী করা যায়। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ তার অন্যতম উদাহরণ। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক নাট্য-পরিণামই স্বাভাবিকতার অন্যতম দাবীদার। সার্বভৌম স্বাভাবিকতার দাবীর কথা মনে করলে বলতে হয় ভাবে, ভাষায়, আচার-আচরণে এবং গদ্য ও পদ্যের যথেচ্ছ ব্যবহারে নাটকে অস্বাভাবিকত্ব আসতে পারে।

দাবীর ভিত্তিতে নাটকে গদ্য সংলাপকেই সবচেয়ে বেশি মান্যতা দেওয়া হয় আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে। কল্পনা কাব্যের একটি প্রধান বিষয়। যতদিন তার প্রাধান্য ছিল, বিশেষ করে প্রথম যুগের নাটকে, ততদিন নাটকে কাব্যিক ভাব-ব্যাঞ্জনার প্রয়োগ স্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তার গুরুত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। আজকের সময়ে তাই গদ্য সংলাপ অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যতদিন বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার দাবী এতটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি ততদিন পদ্যবন্ধ এবং কবিত্বময় নাটককে আমরা সসম্মানেই সমাদর করেছি। কিন্তু আজ বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার চাহিদা অবশ্য পূরণীয় বলে মনে হয়। ফলে চাহিদার সঙ্গে ঔচিত্যবোধ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনার উপস্থাপনায় উক্ত অস্পষ্টতার আবরণ থাকার ফলে আমরা পদ্যে ততটা আপত্তি করি না বটে কিন্তু যে বাস্তব জীবন আমাদের সামনে রয়েছে সেই জীবনের উপস্থাপনায় ছন্দের ব্যবহার স্বাভাবিকতার পরিবর্তে কৃত্রিমতার আবহাওয়াই তৈরী করে। আমরা জানি কোনো সৃষ্টিই অকৃত্রিম নয়। প্রত্যেক রচনাই কম বেশি সংকেতাশ্রয়ী এবং কাব্যিক প্রকাশেই সংকেত বেশি সূচিত হয়। এ ধরনের যুক্তি দিয়ে পদ্য ও কাব্যিকতার দাবীকে বাঁচানোর জোরালো চেষ্টা করা হলেও নাটকে গদ্যের স্বাভাবিক সংলাপের দাবী ষোলো আনাই জোরালো। সংলাপের অগ্রগতি বোধ সহজেই যার দ্বারা জাগ্রত হয় সেটি নাটকের চালনা শক্তি। একটি নির্দিষ্ট গতিতে নাটকের চালনা শক্তি নির্মাণ করা জরুরী। সেক্ষেত্রে সংলাপকে সেই গতি নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে হয়। নাটকের সংলাপের পক্ষে গতি বা tempo একটি প্রধান গুণ। এছাড়া এমন অনেক নাট্যকার আছেন যাঁদের নাটকের নাটকীয় কৌতূহল, ঘটনা বা ভাবাবেগের চেয়ে সংলাপের গাঁথুনী

ও আকর্ষণের ওপরেই বেশি নির্ভরশীল। সেদিক থেকে সংলাপকে যেকোনো নাট্যকারের প্রধান হাতিয়ার বলা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেরই সে বিষয়ে পারঙ্গমতা ছিল। আর তাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সংলাপ রচনার বৈশিষ্ট্যেই অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করা যেত অত্যন্ত সহজেই। রামানারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ যে সব নাটক রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত নাটকগুলি সংলাপের গুণে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল দর্শকদের কাছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাটকের শ্রেণিগত বৈষম্যে সংলাপের বাঁধন বা গাঁথুনী অনেকটাই পৃথক হয়ে পড়ে। যেমন-সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে মনে রাখতে হয় যে, তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হতে চলেছেন সেখানে সমাজের অলিন্দে বসবাসকারী মানুষগুলোই প্রধান। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সংস্কার-সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি, চাল-চলন, আচার-আচরণ, ধর্মীয় অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, বিশ্বাস ইত্যাদির একটি সংমিশ্রণকে কেন্দ্র করেই তাকে নাটক রচনা করতে হবে। সেখানে সবই বাস্তব; কল্পনার স্থান সেখানে একেবারেই নেই। সমাজের মানুষ যে ভাষায় যে ভঙ্গিতে কথা বলে তাকে আশ্রয় করে সংলাপ রচনা করলে তবেই সাধারণ পাঠক ও দর্শক তা সাদরে গ্রহণ করবে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে নাট্যকারকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সমাজের মানুষ কোনসময়ে, কিসের পরিপ্রেক্ষিতে কোনভাষা বা কথা ব্যবহার করে সামাজিক নাট্যকারকে তা জানতে হবে।

সামাজিক নাটকের সংলাপ রচনায় যুগের হাওয়া সম্পর্কে নাট্যকার যেন অবশ্যই অবহিত হন। কেননা একটা সমাজ পরিবর্তন বা বিবর্তনের পথে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কার্যকলাপ, প্রকৃতির স্বাভাবিকতা ও খামখেয়ালীপনা, সভ্যতা-প্রগতির প্রভাব ইত্যাদি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সামাজিক নাট্যকারকে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং সংলাপ রচনার মধ্যে দিয়ে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যেতে হবে। কেননা প্রকৃতি বর্ণনা বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দেবার অবকাশ নাট্যকারের বিশেষ থাকে না। তাই ছোট্ট কলমের আঁচড়েই ঘটনার ইঙ্গিত চরিত্রের মুখে উচ্চারণ করাবার কৌশল জানতে হবে।

সামাজিক নাট্যকারদের সমাজ সংস্কারের একটি বিশেষ দায় থেকে যায়। সমাজের অন্তর্গত কোনো সমস্যা, কুসংস্কার, কোনো প্রতিবাদ, নীতিপ্রচার ইত্যাদির জন্য সমাজ মানসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। একই সঙ্গে সমাজ ও তার ব্যক্তি মানুষের জন্য সহমর্মিতা থাকা আরও জরুরী। একমাত্র তাহলেই সমাজ মনস্তত্ব বোঝা যাবে। আর তাকে নিজের মনের মধ্যে জারিত করে বাস্তব উপযোগী সংলাপ গড়ে তুলতে হবে। নাটকের পরিপাটি গঠনশৈলীর সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের উক্ত অভিজ্ঞান সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে এবং তার উপযোগী সংলাপ রচনার প্রধান চাবিকাঠি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাট্যকারদের সংখ্যা অনেক। সামাজিক নাটক রচিত হবার যথেষ্ট উপকরণ থাকার কারণেই এই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু অসংখ্য নাট্যকারদের ভিড়ের মধ্যেও বিশেষ কয়েকজন নাট্যকারের বিশেষ কয়েকটি নাটকই উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সামাজিক নাটক রচনা করে সাফল্য পেয়েছিলেন। তবে এই সাফল্যের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবু একই বিষয় নিয়ে একাধিক নাট্যকার একাধিক নাটক রচনা করেছেন বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম কয়েকটি সামাজিক নাটকে ব্যবহৃত সংলাপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা যাক-

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে মৌলিক বাংলা সামাজিক নাটকটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে নাটকের কাহিনী ও সংলাপের একটি বিশেষ প্যাটার্ন তৈরী হয়েছিল তার নাম 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই নাটকটি প্রকাশিত হবার মাত্র

দুই বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক বাংলা নাটকের অভাব ও নাটকে বাঙালিয়ানার প্রধান বৈশিষ্ট্যের দুঃখ মোচন হয়। নাট্যকার রামনারায়ণ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁর নাটক পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি সমাজে যে সংস্কারমুক্ত উদারতার বিকাশ ঘটেছিল, ইংরেজি শিক্ষিত না হয়েও তিনি সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সে যুগের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও বাংলা ভাষার অনুশীলনগত প্রয়োজনীয়তা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন।

বাংলা ভাষা বিষয়ে এত আন্তরিকতাবোধ সে যুগে মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যেই ছিল। বাংলা ভাষার প্রতি সেই অগাধ আন্তরিকতা নিয়েই তিনি এর সেবা করে গিয়েছেন। বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিও তাঁর সর্ব-সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাব ছিল বলেই সামাজিক নাটক রচনা এবং নাটকে সংলাপ রচনায় সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্য ও দর্শক অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকটি যেহেতু একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক, তাই সেই সামাজিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার স্বার্থেই এই নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে। এই নাটকে নাটকীয় সংলাপের ভাষা ব্যবহার করতে নাট্যকার বিশেষ সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের শ্রেণিগত চরিত্রের পার্থক্য থেকেই যেমন তার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টি রামনারায়ণের ছিল বলেই তিনি তাঁর নাটকেও সম্যক ব্যবহার করেছিলেন। এটা যে শুধুমাত্র সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ একথা বলা যায় না, কেননা বাংলার ভাষা সংস্কার-সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া একই সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন শ্রেণির ভাষা যেমন-সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশের ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে বাংলা ভাষাই কেবলমাত্র চরিত্রের বিভিন্ন পরিচয় অনুসরণে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রগুলির সূক্ষ্মতম পার্থক্যও নাট্যকারের দৃষ্টিতে অনুভূত হয়েছে এবং এদের ব্যবহৃত সংলাপের ভিতর দিয়ে তা রক্ষা পেয়েছে।

স্ত্রী চরিত্রের মুখে ভাষার যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে নাট্যকার রামনারায়ণ তাও উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্ত্রী চরিত্র যে একই ভাষা ব্যবহার করে না তাও নাটকে রামনারায়ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাদের মুখের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক 'নীলদর্পণ' নাটকে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করে সমাজের বাস্তব চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন, রামনারায়ণের মধ্যে দিয়েই বাংলা নাট্যসাহিত্যে সেই ভাষার ব্যবহার প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এমন কি গ্রাম্য ভাষার ব্যবহারগত দিক দিয়েও তিনি দীনবন্ধুর থেকে অগ্রজ ছিলেন। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের একটি অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। কুলপালকের কন্যাদের বিয়ে ঠিক হবার পর পাড়া প্রতিবেশিনীরা আসার পর ব্রাহ্মণীর সঙ্গে তাদের কথোপকথনের একটি অংশ নিম্নরূপ-

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল বাছা সকল, এসেছ, এসো এসো, আসবে বই কি; তোমাদের কর্ম, করবে করাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে; তোমরা না কল্লে কে করবে? জ্ঞাতি বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ও লো ঠানদিদি, বলি একি লো? মেয়েদ্দের বে দিতে বসেছিস, সব ফাঁকি জুকি ঘটাঘটি কইলো, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই ঘটা। কুলীনের মেয়ের বে ঘটাই ভার, আবার ঘটা পাব কোথা বোন। তবে তোরা এসেছিস এই ঘটাই ঘটা।

কামিনী। ওলো হেমলতা। জানিসনে বড় গিন্নীর সব ফাঁকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ও কথা কি বলতে আছে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা

'সকলে মিলেজুলে জল সইতে যা দেখি'। (কুলীন-কুল-সর্বস্ব, তৃতীয় অঙ্ক) 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে উচ্চ বর্ণের চরিত্র তথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সর্বত্রই কৃত্রিম বলে মনে হয় এবং সেগুলি একান্তই সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এর মধ্যে খুব বেশি অস্বাভাবিকত্ব কিছু আছে বলে মনে হয় না; তার কারণ, সে যুগের পণ্ডিতি বাংলার প্রভাবের কথা বাদ দিলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মূলত যে ভাষায় কথা বলতেন, তা যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অনাবশ্যক সংস্কৃতানুগ ছিল সে সম্পর্কে সকলেই অবগত। তৎকালীন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সংস্কৃত কাব্য-নাটক ও শাস্ত্রচর্চার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তাদের ব্যবহৃত মাতৃভাষায় অমূলক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং এর ভিতর দিয়েও নাটকের বাস্তবধর্মীতা খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হতে পারে নি। কিন্তু নাট্যকার যখন নিরক্ষর ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়েছেন, তখন তার মুখে সংস্কৃত ভাষা আদৌ ব্যবহার করেন নি। এই নাটকে উদরপরায়ণ নামে একটি স্বার্থান্বেষী লোভী, নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংলাপ থেকেই তা স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়। তা হলেও একথা সত্য যে, উদরপরায়ণ মূর্খ হলেও উচ্চ বংশজাত। সুতরাং সমাজ ও পারিবারিক সম্পর্কে তার ভাষা নিতান্ত গ্রাম্য কৃষকের ভাষাও হবার নয়। এ সম্পর্কে নাট্যকার অবহিত ছিলেন একথা প্রায় নিশ্চিত। সেই কারণেই তার বিদ্যার কোনো পরিচয় না থাকলেও কেবলমাত্র কূল-পরিচয় অনুসারে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন সেটাই এই নাটকের মূল উপজীব্য। স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে ভাষার দিক থেকে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ আরও অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে উচ্চবর্ণ তথা কুলীন ব্রাহ্মণের সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে—

কুলপালক। (স্বগত) "বিবাহ নির্বাহবিধির ঘটনা" সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সঙ্গ ত বটে। আমি বন্দ্যঘটীর কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূ ল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তায় আছি। দেখ আমার সংসার রাজ-সংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখ দেখি কি দৈববিড়ম্বনা কিছুতেই মনতুষ্টি হইতেছে না; কন্যাভারগ্রস্থ হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, "হস্বগৃহাঃ স্কুলপটা যবগোধূমশালিনঃ প্রলয়েহপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে।" ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কন্যাজন্মই গৃহস্থাশ্রমীর অশেষ ক্লেশদায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশ কুলীন সন্তানদিগের। প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা। আমার গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎপরম্পরা সম্পাদন করে। অধিকের কথা কি বলিব? (প্রকাশ্যে) আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতি মন্দ অতি মন্দ, এমন দেখি নাই,

(কুলীন-কুল-সর্বস্ব, প্রথমাঙ্ক, ইতি প্রস্তাবনা)

নিরক্ষর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তৎসম ও সমাসবহুল ভাষাকে ভেঙে অনেক বেশি সহজ করে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার রামনারায়ণ। সামাজিক নাটক হিসেবে তা অনেক বেশি সফল হয়েছে বলা যায়। যেমন-পঞ্চম অঙ্কে উদরপরায়ণের আচরণ ও কথায় যার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"উদর। আঃ মলো, এ মাগী বলে কী? ফলার কি কেউ কারু শেখায়। আমি আপনা হতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা আমার তেমন হল না। হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুছিয়ে

পাঠশালে পাঠাইস, তাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পড়লে কর্জ হয় জানিসনে? আমারও ঐরূপ কিছুদিন হয়েছিল, মা বাপ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ-বারোদিন প্রায় পাঠায়েছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভালো, সেই মা বাপ অমনি অক্কা পেল, আর আমায় পায় কে। তুই তেমনি এ ছেলেটার মাথা খেতে বসেছিস, ওকে নষ্ট করবি?-

(কুলীন-কুল-সর্বস্ব, পঞ্চম অঙ্ক)

যা ইচ্ছে। আমি ওরে নে যেতে পারব না।' উদ্ধৃতিটির মধ্যে দিয়ে একজন পেটক ব্রাহ্মণ পিতার ব্যক্তি স্বার্থ-সর্বস্বতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্ত্রী এবং নিজের সন্তানের প্রতি যার কোনো স্বহৃদয়তা নেই। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ তবু তার কথাবার্তা আর পাঁচজন উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ নির্বাচনের সার্থকতা এখানে সুস্পষ্ট। সংলাপ প্রয়োগের সার্থকতায় রামনারায়ণ তাই অগ্রগণ্য একথা অস্বীকার করা যাবে না। পরবর্তীকালে এই ধারার আরও সার্থক প্রয়োগ বিভিন্ন নাট্যকারের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

আধুনিক কালে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল-সর্বস্ব" প্রকাশিত হবার পূর্বে বাংলায় যে সব নাটক প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই সংস্কৃত কাব্য-নাটকের অনুকরণে গঠিত রোমান্টিক ধরণের রচনা বললে অত্যুক্তি হয় না। শুধুমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে বাস্তবের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের খণ্ডিত বস্তু বা বিষয়কে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার সমালোচনা করেছেন—বৃহত্তর জীবনের গভীরতর বিষয় তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। সমাজের গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু রামনারায়ণের নাটক অত্যন্ত বাস্তব জীবনাশ্রয়ী, সেখানে কেবল সমাজ অথবা ব্যক্তি জীবনের বাহ্যিক উপকরণই প্রধান হয়ে ওঠেনি। সুতরাং এই শ্রেণির রচনা কেবলমাত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ছিল না বললেই চলে। জীবনের গভীর সমস্যার সন্ধান করার দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার ফলেই এসেছিল তা নয়, পুঁথিগত বিদ্যা ও এদেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমন্বয়ধর্মী জ্ঞান থেকেও অনেকটা রপ্ত করেছিলেন রামনারায়ণ। আর তাই সংস্কৃত কাব্যধর্মীতা বা মধ্যযুগের বিপুল কাব্য সম্ভারের প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি তিনি। যার ফলে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে কাব্যধর্মী সংলাপ ধ্বনিত হয়েছে। মূলত এই শ্রেণির সংলাপ নির্বাচন পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতা ও নাট্যধর্মী রচনারই প্রভাব বলা যেতে পারে। এই নাটকে এরূপ সংলাপের ব্যবহার বহু। যেমন—ষষ্ঠ অঙ্কে জাহ্নবী ও শাম্ভবীর বিবাহ সম্পর্কিত কথোপকথনে গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পদ্য সংলাপের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

"জাহ্নবী। ছি! ছি! বলিসনে। বলিসনে। লজ্জা করে। হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে। বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে।। পোড়ামুখে আসে হাসি এ কথা শুনিয়া। কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া।। বাঁধিতে হইবে নাকি খোঁপা পাকা চুলে। দাঁত গেল মিশি কি ঘষিব দন্তমূলে।। আহ কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই। হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই।।" (কুলীন-কুল-সর্বস্ব, ষষ্ঠ অঙ্ক) 'কুলীন-কুল-সর্বস্বে' অনেক স্থানেই চরিত্রের স্বগত উক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সংলাপ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে স্বগত অথবা আত্মগত উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-'একোহপি ভাষতে' অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি একা কথা বলে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, হৃদয় থেকে উদ্ভুত উক্তিকেই আত্মগত বা স্বগত উক্তি বলা হয়। অর্থাৎ চরিত্র যখন একা থাকে এবং আপনা থেকেই হৃদয়ের কোনো ভাব ব্যক্ত করে তখনই তার উক্তি হয় আত্মগত উক্তি। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কুলপালকের মুখে, চতুর্থ অঙ্কে ভোলার মুখে, ষষ্ঠ অঙ্কে বিরহিপঞ্চাননের মুখে এই জাতীয় স্বগত উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বগত উক্তি বা আত্মগত সংলাপ ছাড়াও 'কুলীন-কুল-সর্বস্থ' নাটকে জনান্তিক উক্তি বা সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে। জনান্তিক উক্তিতে মজে অন্য অভিনেতা থাকে, কিন্তু সেই উক্তি তারা শুনতে পারবে না অথচ দর্শক শুনতে পাচ্ছে এভাবে বলা হয়ে থাকে। নাট্যশাস্ত্রে এই শ্রেণির সংলাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-'কার্যবশাদশ্রবণং পার্শ্বগতৈফ নাচিকং তৎস্যাৎ'-অর্থাৎ কার্যবশত পার্শ্বগত ব্যক্তির অশ্রুত উক্তিকেই জনান্তিক বলা হয়ে থাকে। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে শুভাচার্যের মুখে, চতুর্থ অঙ্কে ধর্মশীলের মুখে, ষষ্ঠ অঙ্কে অনৃতাচার্যের মুখে জনান্তিক উক্তি শোনা যায়, যথা-

'অধর্ম। কে হে তুমি বেতে আলিস্যির কথা বলচ? বে করতে কি আলিস্যি হয়? গেলেম-বে কল্লেম-যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম চললেম-আর কি? বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে?'

ধর্ম। (জনান্তিকে) তর্কবাগীশ। এই দেখ, এক মহাপুরুষ। (প্রকাশে) না তাহা নয়, আমি একটা কথার কথা কহিতেছিলাম; আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়।"

নাটকের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে বহু শাস্ত্রীয় শ্লোককে স্বরচিত শ্লোকে পর্যবসিত করে নাটকের সংলাপে ব্যবহার করেছেন। সেই শ্লোকগুলি শুনে বা পাঠ করে দর্শক ও পাঠকের মনে এক বারের জন্যেও এই শ্লোকগুলির প্রামাণ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। সংলাপ রচয়িতা হিসেবে এখানেই নাট্যকার রামনারায়ণের কৃতিত্ব।

ইহা কথাঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলের লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই,—

"দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে নিবাস শ্বশুর ঘরে মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ সদানন্দ পূর্ণ কলেবর।। গায়ত্রীর আক্যা বন্ধ

মুখে সদা বেরিগুড় তুড়ি দিয়া বলে ঘট

হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে। বড় ভক্ত পাঁচালিতে কে আটিবে বাচালিতে এই নয় গুণ লও গণে॥"

(কুলীন-কূল-সর্বস্ব, দ্বিতীয় অঙ্ক) 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকটির সার্বিকভাবে সংলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে সংস্কৃত সংলাপের নাট্য আদর্শকে নাট্যকার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেননি। কেননা নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংলাপের চারটি শ্রেণির ভাষা, যথা-অতিভাষা, জাতিভাষা, যোন্যন্তরী ভাষা সবটাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অতিভাষা দেবগণের, আর্যভাষা রাজগণের, জাতিভাষা সাধারণ মানুষের এবং যোন্যন্তরী ভাষা মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে বলে নির্দেশ করা আছে। সেক্ষেত্রে জাতিভাষাকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথা-সংস্কৃত ও প্রাকৃত। পরিব্রাজক, মুনি, শ্রোত্রিয়, দ্বিজ ইত্যাদির ভাষা সংস্কৃত। স্ত্রীলোক, নীচব্যক্তি, মাতাল প্রভৃতির ভাষা প্রাকৃত। নীচ জাতির ভাষাকে বিভাষা বলা হয়েছে। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভাষা যেহেতু বাংলা, সেহেতু এই নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে একথা একেবারেই বলা চলে না। কিন্তু সংস্কৃত শব্দবহুল এবং সমাসবদ্ধ পদযুক্ত ও সাধুক্রিয়াযুক্ত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার পর্যায়ে আলোচিত হতে পারে। এছাড়া সমাসহীন পদ, তদ্ভব শব্দযুক্ত পদ ও চলিত ক্রিয়া মিশ্রিত ভাষাকে প্রাকৃত শ্রেণির পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। সেক্ষেত্রে নাটকে কুলপালক, শুভাচার্য, ধর্মশীল বিরহিপঞ্চানন প্রমুখের ভাষা সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, উদরপরায়ণ, অভব্যচন্দ্র, বিবাহবণিক প্রমুখের ভাষা প্রাকৃত

শ্রেণির সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে এবং সংস্কৃত পণ্ডিত হবার সুবাদে তিনি এই শ্রেণির শব্দ বা ভাষা প্রয়োগে নাট্যসংলাপ রচনা করেছেন। কিন্তু এই শ্রেণির সংলাপ নাটকের গতিকে বিশেষ করে আধুনিক চলিতগদ্যে লেখা নাটককে শ্লথ করে দিয়েছে। এখানেও সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সৎ ও শিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অসৎ ও নীচ ব্রাহ্মণ চরিত্রের মুখের সংলাপ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও সফল হয়েছে "কুলীন-কুল-সর্বস্ব" নাটকে। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা মৌলিক সামাজিক নাটকে রামনারায়ণ যে বিচিত্র নাট্য-সংলাপের প্রয়োগ ঘটালেন তা পরবর্তীকালের বহু নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিল ও বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রামনারায়ণের পর প্রায় একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উমেশচন্দ্র মিত্র "বিধবা বিবাহ" নামে একটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সামাজিক আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, বিধবা বিবাহ আন্দোলন তার মধ্যে একটি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে এই আন্দোলনের পথকে প্রশস্থ করেন। যার ফলে তাঁকে সমর্থন করে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হন। সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মূলত মতাদর্শগত পার্থক্যই এর প্রধান কারণ ছিল। নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র লেখনীকে হাতিয়ার করে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হলেন এবং বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। তৈরী হল বাংলা প্রথম মৌলিক বিয়োগান্তক সামাজিক নাটক। এই নাটকটির একটি চরিত্র অবলম্বন করে তার রক্ত-মাংসের দেহের কামনা-বাসনা বিধবার জীবনে যে সুগভীর বেদনা তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। নাটকটির মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকার্যই সহায়তা পেয়েছিল তা নয়, তৎকালীন সমাজের বাস্তব রূপটি তার মধ্যে দিয়ে ভাষা পেয়েছিল। নাটকের সংলাপে সমাজ ও জীবন-দর্শনের গভীরতায় এটি যেমন বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে, তেমনি বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

"বিধবা-বিবাহ" নাটকে রামনারায়ণের ব্যবহৃত সংলাপের প্রভাব থাকলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং মেয়েলি বাস্তব সংলাপ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের ধরন প্রায় হুবহু একই রকম রয়েছে। মেয়েলি সংলাপ এই নাটকে অনেক বেশি বাস্তবোপযোগী হয়েছে তা নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাস্তে কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুরে রসবতী নাপতেনী ও সুলোচনার কথোপকথনে এই ধারা চোখে পড়ে-

"সুলো। হেঁলো রসবতি, ঐ বোসেদের বাড়ীর বারান্ডায় উটি কাদের ছেলে বসে আছে, দেখ দেখি, আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আহা। রূপ ত নয় যেন সোনার থালাখানি। ওকে চিনিস, ঐখানে রোজ বসে থাকে দেখতে পাই।

রস। (বারান্ডাভিমুখে চাহিয়া) হেঁগো ওঁকে চিনি, ওখানে আমি কাময়ে থাকি। উটি রমাকান্ত বসের ছেলে। ওগো ছেলেটির কথা যে মিষ্টি, বসে শুনতে হয়, এমন কখন শুনি নাই।"

সমাজকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র মিত্র যে আবেগপূর্ণ সংলাপ রচনা করেছিলেন তাতে পাঠক ও দর্শক হৃদয় কাতর না হয়ে পারে না। তাছাড়া বিধবাদের প্রতি সমাজকর্তাদের নিষ্ঠুরতাকেও আঘাত করতে ভোলেননি নাট্যকার-

সুলোচনা। রসবতী, তুই আমায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস তোর কথায় এতদিন বেঁচে আছি। বিয়ের কথা বলতেছিলি, পোড়া দেশে কতগুলিন না মলে আর কতগুলিন না হলে, রাঁড়ের বিয়ে কি সর্বাত্র চলবে? এই একটা

বিয়ে হচ্ছে, দেখিসদেখি এর কত গোল হবে। এক কর্তা বলবেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্তা বলবেন, এ বিয়ের বরযাত্রীদের একঘরে করা উচিত। ভাই এই সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা একবার ভুলেও ভাবেন না, যে বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্ছে। যারা কিছু না করে ধর্মকার্যে আছে, তাদের কেশটাত্ত তো ভাবতে হয়। তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল দেখি?' (বিধবা-বিবাহ, তৃতীয় অঙ্ক, অদ্বৈতর অন্তপুর)

"বিধবা বিবাহ" নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী। তা হ'ল এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রথম পাগল বা উন্মাদ চরিত্র এবং পাগলের উপযোগী সংলাপ রচিত হয়েছিল। নাটকের শেষাংশে পাগলাগারদে চিকিৎসক ও শ্যামাচরণের উপস্থিতিতে বাতুল বা পাগলের সংলাপ নিম্নরূপ-"চিকিৎসক। মহাশয়, যে সকল রোগীদের আরোগ্য হওনের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে এই ঘরে রাখিয়াছি। এই সকল বাতুলদিগরে বন্ধ করিয়া না রাখিলে অত্যন্ত দৌরাত্ম করে। বায়ুরোগের কি আশ্চর্য গতি, আপনি চাক্ষস দেখুন। (দ্বার মোচন করিয়া) ইহার মধ্যে একজন বড় আশ্চর্য বাতুল আছে, সে সর্বদা একটি স্ত্রীলোকের নাম করে। বাতুল। (উচ্চৈস্বরে) উ। উ! উ! উ! উ! উ! আমি চাঁদ ধরেছি। এই দেখ এই দেখ। বাতুল। হা। হা। হা। হা। হা। হা। আমার হাতে তারা আছে। তোরা কে কটা নিবি আয়। বাতুল। ও। ও। ও! ও। আগুন লেগে সব পুড়ে গেল, ধর ধর ধর। গেলুম গেলুম। বাতুল। তোরা সব কেন এখানে এলি, জানিসনে আমি একবার খুন করেছি। সব খুন করবো। সুলোচনা। সুলোচনা। সুলোচনা। (হাস্য) হি। হি। হি। হি!"

নাটকের শেষাংশের এই পাগল চরিত্রের অবতারণা কোনো মনস্তত্ব বিশ্লেষণের জন্য করা হয়নি বরং সে যুগের সামাজিক নাটকে পাপীর শাস্তি নির্দেশ করার দায়িত্ব থেকেই নাট্যকার এই চরিত্র ও তার উপযোগী সংলাপ নির্মাণ করেছিলেন।

সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক সংলাপ :

একটি মহতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল; তা হলো অবক্ষয়িত সমাজকে সংস্কার করবার উদ্দেশ্য। এই সংস্কারের তাগিদ অনুভূত হয় বাংলাদেশে বিদেশী শিক্ষার প্রসারকে হাতিয়ার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উইলিয়াম কেরীর প্রয়াসে বাংলা গদ্যের প্রণয়ন। পরবর্তীকালে ছাপাখানার প্রচলন ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রকাশ বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। এই পরিবর্তনকে হাতিয়ার করে বেশ কয়েকজন বাঙালি যুবক বিদেশী ইংরেজি শিক্ষার আদলে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। ফলে তাঁদের ভাবজগতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে একদল ইয়ংবেঙ্গল এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে। ফলে দেশীয় ও বিদেশী শিক্ষার মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীতা শুরু হয় এই যুগে। এই সুবাদে দেশীয় ও বিদেশী সংস্কারের তুলনার মাধ্যমে বিদেশী সংস্কারের যা কিছু ভালো এবং দেশী সংস্কারের যা কিছু মন্দ তাকে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা দেয়। শুরু হয় বাংলাদেশের ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন। এই সংস্কার আন্দোলনের যাঁরা পথিকৃত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যতম। সামাজিক নাটক ও তার সমোপযোগী সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রামমোহন রায় শুরু করেছিলেন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্র করে এবং বিদ্যাসাগর শুরু করেন বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ রদ, বহু বিবাহ রদ ও পণ প্রথার মত কু-প্রথা থেকে বাংলা ও বাঙালিকে মুক্ত করতে।

এঁদের সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে। এটি একটা সময় পর্যন্ত একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছিল। পরোক্ষে সমাজবদ্ধ প্রায় সকল শ্রেণির মানুষকে সামাজিক কু-সংস্কার ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষেত্রে অসামান্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সামাজিক নাটকগুলি এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে তদুপযোগী সংলাপ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সংলাপ রচনার দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং খুশি করতে সংলাপ প্রয়োগের বিভিন্ন কৌশলকে প্রয়োগ করেছেন তাঁরা। একই নাটকে গদ্য, পদ্য, সংস্কৃত, গদ্য-পদ্য মিশ্রিত, আবার প্রয়োজনে সমকালীন যুগবৈশিষ্ট্যের নিরিখে ইংরেজি সংলাপেরও যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এত সব হওয়া সত্ত্বেও একথা মনে রাখতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাট্যকারদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে অন্ধকারের থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া।

এর জন্য প্রধান যে ক'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে যুগ ও যুগমানসের আমূল পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, পণ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, মদ্যপান, পতিতাশক্তি, বাবুয়ানা, বিদেশী অনুকরণ-প্রিয়তা ইত্যাদি প্রধান। এই সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সামাজিক নাটকে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছিল এবারে আমরা উদ্ধৃতিসহযোগে সেগুলি তুলে ধরব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন বাংলা মৌলিক সামাজিক নাটকের উৎপত্তি হতে থাকে তখন নাট্যকারেরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নাটক রচনার কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো সেখান থেকে সংগ্রহ করতেন তাঁরা। একই সঙ্গে কাহিনীর বিষয়, প্রেক্ষাপট ও সমাজের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও রসদ সংগ্রহ করতেন সেইসব সাহিত্য থেকে। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রতিটি শাখা একে অপরের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সময়কার সেই প্রধান সমস্যাগুলোর কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যকারগণ শুধুমাত্র যে সেই সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন তা নয়, বরং তাঁরা বিভিন্ন প্রস্তাবমূলক প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করেছেন। যেমন তৎকালীন বিকৃত বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা কমলালয়"-এ লিখেছিলেন-

"চড়কের বীভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গাপূজার সময় বাইজি এনে মদ মাংস খেয়ে ফুর্তি করা (তত্ত্ববোধিনী মতে এই তিন দিন পাপের স্রোত প্রবাহিত হত), রাসযাত্রার সময় আমোদ-প্রমোদ মাহেশে স্নান যাত্রার সময় মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হৈ হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে দলে তামাসা দেখতে আসা, শক্তিদের বীভৎস বামাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার এবং অত্যাচার, তারকেশ্বরের মোহন্তের "স্বীয় ধর্মকর্ম সংস্থাপনার্থ" বেশ্যা রাখা, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড় সবই ধর্মের নাম নিয়ে চলত এবং কলকাতা বা বাংলার হঠাৎ নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদাতা। বাইরে ঠাঁট বজায় থাকলেও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শতাব্দী সূচনা থেকেই অন্তত কলকাতা অঞ্চলে নিষ্ঠা ও ভক্তির অভাব ফুটে উঠছিল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাতেই সমকালীন সমস্যাগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরকম অসংখ্য লেখায় একই বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হয়েছিল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাট্যকারদের নাটক ও সংলাপ রচনায় সহায়তা করে। সমাজের সমালোচনায় এরূপ অসংখ্য নেতিবাচক সাহিত্যিকদের মতামতে উৎসাহিত হয়েই নাট্যকারেরা নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হন। তাঁদের সেই সচেতন উদ্দেশ্য বহু নাটকের সংলাপ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন-মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগে নাটক

রচনা, বিশেষ করে সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে "প্রস্তাবনা" বা "বিজ্ঞাপন" অংশে নাটক রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাট্যকার মতামত দিতেন এবং নাটক রচনার সময় বিভিন্ন সংলাপের দ্বারা তাকে বাস্তবায়িত করতেন।

এবার আসা যাক চরিত্রকেন্দ্রিক সংলাপের প্রসঙ্গে। নাটকে অসংখ্য চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ কতগুলো চরিত্রের মাধ্যমেই সাধারণত বেশিরভাগ নাটক তৈরী হয়ে থাকে। যেমন, নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে সঠিকভাবে প্রদর্শিত করতে গিয়ে আসে অনেক পার্শ চরিত্র, শ্রেণি চরিত্র, জনতা চরিত্র, গৌণ চরিত্র, এমনকি কোনো কোনো নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রস্ফুটিত করতে কখনও কখনও প্রকৃতিও একটি চরিত্র হয়ে উঠতে পারে। চরিত্রের নির্মাণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য মনীষীরা অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, এখানে সে প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রকে রূপ দিতে তাদের সংলাপ কি রকম হবে তার একটি গতানুগতিক নিয়ম থাকলেও প্রয়োজনের নিরিখে ও সময় ও যুগের চাহিদা অনুসারে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে চরিত্রকেন্দ্রিক সংলাপ নির্মাণের একটি প্রথাগত নিয়ম দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য এসেছিল। সে সম্পর্কে আমরা এবার আলোকপাত করতে পারি।

বাংলা মৌলিক সামাজিক নাটকের উৎপত্তির প্রাকমুহূর্তে যে নাটকগুলো রচিত হয়েছিল, বিশেষ করে 'কাল্পনিক সংবদল', 'ভদ্রার্জুন', 'কীর্তিবিলাস', 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' ইত্যাদি সেখানে সংস্কৃত অনুকরণে সংলাপ যোজনা ছাড়া আর বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য সেটা সম্ভবত ছিল না কারণ বাংলা গদ্যভাষার প্রকৃত লিখিত রূপ তখনও তৈরী হয়নি। এদিক থেকে নাট্যকারদের ভাষা-প্রয়োগ বিষয়টি অনেকটাই সম্ভ্রম পাবার যোগ্য। "ভদ্রার্জুন" নাটকে চরিত্রকেন্দ্রিক ভাষাপ্রসঙ্গে নাট্যকার তারাচরণ শিকদার মহাশয় উল্লেখ করেছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার পরিহীনা এবং তাহার দারিদ্রাবাহারও শেষ হয় নাই।" এই রকম একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নাটকের আকর্ষণীয় সংলাপ রচনা সত্যিই দুষ্কর ছিল। 'কীর্তিবিলাস' নাটকেও সংস্কৃত পন্থায় সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ এবং গদ্য ও পদ্যের শৈলী প্রাচীনপন্থা, স্বগতোক্তির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ ইত্যাদি লক্ষ্যণীয়। 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' নাটকের ভাষা কোনো অংশেই নাটকোপযোগী হয়নি। দীর্ঘ পয়ার ছন্দের ব্যবহার, কৃত্রিম সাধুভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি এই নাটকের ভাষাকে অস্বাভাবিক ও উৎকট করে তুলেছে। চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। আর সেই কারণে চরিত্র চিত্রণ ও ভাষাপ্রয়োগ মানব জীবনের কোনো আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। চরিত্রগুলি যেমন সজীব হয়নি, তেমনি সংলাপ বা ভাষাও অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। এই ধারার প্রথম পরিবর্তন ঘটে বাংলা প্রথম মৌলিক সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের হাত ধরে। নাট্যকার একটি বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্যকে সফল করবার লক্ষ্যে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকটি রচনা করেন এবং চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনা করে বাংলা নাটকে সংলাপ ব্যবহারের বৈচিত্র্য সূচিত করতে সক্ষম হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটকে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে সামাজিক নাটকে কি কি ধরনের চরিত্রের আগমন ঘটেছে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হ'ল-শ্রেণিচরিত্রের সংলাপ। এটি আবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত; একটি উচ্চশ্রেণির চরিত্র, অন্যটি নিম্ন শ্রেণির চরিত্র। এর পরেই আসে পুরুষ চরিত্র ও নারী চরিত্র। এছাড়া সামাজিক নাটকে যেহেতু সমাজ সংস্কারের একটি মহতি উদ্দেশ্য থাকে তাই তাকে কেন্দ্র করে সৎ চরিত্র ও অসৎ ব্যক্তি চরিত্র এবং তাদের মুখে ব্যবহৃত সংলাপও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে চরিত্রের সংলাপ রচনার জন্য তার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচিবোধ ও সামাজিক

মর্যাদা বিষয়েও নাট্যকারকে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয়। সামাজিক নাটকে গ্রাম্যভাষা ও শিক্ষিতজনের ভাষার মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য সূচিত করে সংলাপ রচনা করতে হয়। যেহেতু সমাজের হিতার্থে সামাজিক নাটক তাই সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণির চরিত্রই সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে; নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের গুরুত্ব অন্যান্য ধারার নাটকের মত অতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না। চরিত্রের এই অবস্থানগত দিক থেকে সংলাপের গুরুত্বও নির্ধারিত হয়ে থাকে তা বলাই বাহুল্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক নাটকে উচ্চবর্গের চরিত্রের জন্য সংলাপ রচনা একটি প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত ছিল। এই যুগের বিশিষ্ট কতগুলি নাটকের সংলাপের দিকে নজর দিলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। "কুলপা। একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথ পরিশ্রান্ত ও দিনকরকিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়া প্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে। (কুলীন-কুল-সর্বস্ব, প্রথম অঙ্ক) "শ্যামাচরণ। আপনার ভ্রম কোন ক্রমেই দূর হবে না। আপনি বলতেছেন, বিধবারা ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃস্থির করুক, যারা সে রূপে মন স্থির করতে অক্ষম হবে তাঁদের উপায় কি করলেন? সেই নিয়ম উত্তম বলব দ্বারা তাবতের ক্লেশ নিবারণ হয়-দ্বারা তাবতের অভাব দূর হয়। যে সকল দেশে বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে তাবত বিধবারাই বিবাহ করে এমন নয়। যারা ইচ্ছা করে তাদের নিষেধক কোন নিয়ম নাই; এদেশে সেইরূপ হওয়াই উচিত।' "নবীন। আহা! বিধুমুখী কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল-ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর গুণে কি, সংসারের বার্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। "নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লান্টিন দেখয়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে-সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদেশে, কত বিদ্যাবিষারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরীর হস্ত অকালে মানব লীলা সংবরণ।

উপরিউক্ত সংলাপগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে উচ্চ শ্রেণির চরিত্রের জন্য যে সংলাপগুলি ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে তৎসম সমায়বদ্ধ পদের আধিক্য এবং অনেক বেশি জটিল ও প্রাণহীন।

সামাজিক নাটকে জনতা চরিত্রের সংলাপ :

বাংলায় "জন" শব্দের সমার্থক শব্দগুলো বলতে সমূহ, দল, গণ, লোক, সমষ্টি প্রভৃতিকেই বোঝায়। "জনতা" কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Crowd, Mob, Mass ইত্যাদিকেই বোঝায়। অর্থাৎ জনতা হচ্ছে একটি সাময়িক ও স্বল্পস্থায়ী গণসমাবেশ-যারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কোথাও সমবেত হয়। এরা কখনও সংগঠিত ও কখনও অসংগঠিত ভাবেও সাহিত্যের আঙিনায় উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু যেখানেই জনতার ভিড় সেখানেই এক বিপুল সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ঘোষিত হবার অবকাশ থাকে। একজন নাট্যকার কৌশলে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে সমাজ ও সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অনিবার্য প্রয়োজনেই নাট্যকার জনতা চরিত্রকে স্থান দিয়ে থাকেন।

বর্তমান কালের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগযন্ত্রণা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, মূল্যবোধের সঙ্কট, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, সামাজিক জটিলতা প্রভৃতির কারণে দেশের একটি বিরাট অংশের মানুষ একসঙ্গে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। আর এই ভাবনাকে আরও সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবমুখী করে তোলার জন্যই নাট্যকারেরা কলম ধরেছিলেন।

তৈরী হয়েছিল জনতা চরিত্র। এই চরিত্রকে রূপ দিতে গিয়ে এদের মুখে বিষয় ও কাহিনী অনুযায়ী উপযুক্ত সংলাপ রচনাও জরুরী হয়ে ওঠে। জনতার ভাষাকে জনজাগরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার লক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সামাজিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল সেদিন। নবজাগরণ ঘটেছিল বাংলা শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর। প্রত্যক্ষভাবে দেখতে গেলে যুগ যুগ ধরে বিপুল জনতার বিভিন্ন গণ অভ্যুত্থানে রাষ্ট্র, সমাজ ও ইতিহাসের পালা বদল ঘটেছে। তাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই জনতা চরিত্রের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়।

নাটকে জনতা চরিত্র যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না, সেহেতু তাদের সমষ্টিগত ভাবমূর্তি ও ভাষাই তাদের আসল পরিচয়। জনতায় যারা সামিল হয় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ শ্রেণির মানুষ। সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী শ্রেণির এই মানুষদের ভাষা হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের অনুষঙ্গে তাদের ভাষাও হয় অত্যন্ত বাস্তবের মাটি ঘেঁষা। কোনো রকম কৃত্রিমতার স্থান সেখানে নেই। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের থাকে একমাত্র তাঁরাই এই শ্রেণির চরিত্রের সার্থক রূপ দিতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটকগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র বারবণিতাদের ভাষা, নববাবু ও ইয়ংবেঙ্গলবাবুদের ভাষা, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনের হানিফ গাজি, ফতেমাদের ভাষা, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, রায়তগণ, পদী ময়রাণী প্রভৃতির সঙ্গে 'কুলীন-বুল-সর্বস্ব' নাটকের নারী চরিত্র, ধর্মশীল, তর্কবাগীশ প্রভৃতির একযোগে নাট্যোপস্থিতি একটি জমজমাট জনতার দৃশ্য। "প্রফুল্ল" নাটকের মাতালের ভাষাও জনতার সংলাপের আওতায় পড়ে। এবারে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত জনতা চরিত্রের সংলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হবো।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে যে সব চরিত্র আছে তাদের মধ্যে জনতা চরিত্র আছে অনেকগুলি। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মহিলাদের চরিত্রগুলি এবং তাদের কথোপকথনের দৃশ্যটি সমকালীন মহিলা জনতার দৃশ্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। সেখানে কৌলিন্য প্রথার কুফলে নারী জীবনের বঞ্চনার দিকটিকে উন্মোচিত করে। ব্রাহ্মণীর সোৎসাহে তার মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে নানান অভিব্যক্তি উঠে এসেছে এখানে

'ব্রাহ্মণী।

কোথা গেলে মেয়েরা সকল! জাহ্নবী, শাম্ভবী আর কামিনী কিশোরী।

এস এস কন্যাগণ সবে ত্বরা করি॥

যাই।

জাহ্নবী। শাম্ভবী। কামিনী। ব্রাহ্মণী।

জাহ্নবী। শাম্ভবী। কামিনী। ব্রাহ্মণী।

কেন মা?

ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা? ওগো, শুনে গো তোরা শুনে।

জাহ্নবী, শাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ

ওমা কি?

ওমা কেন ডাকলি?

ওমা কেন কেন কেন বাবা কি ডাকচেন? (পরমাহ্লাদে) এতকালে প্রজাপতি হল অনুকূল। ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল॥

শাম্ভবী।

(আশ্চর্যান্বিতা)

শাম্ভবীর "বে" এ যে অসম্ভব কথা।

কুলীন কুমারী মোরা ঘর পাব কোথা। বল্লাল বিহিত কুল অকুল সলিলে। পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥

চতুর্থ অঙ্কটিকেও জনতার দৃশ্য আছে। সেখানে ভোলার উক্তি পথচারী জনতার। এরপর তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ধর্মশীল, তর্কবাগীশ, অধর্মরুচি বিবাহবণিক, গর্ভবতী ইত্যাদি চরিত্র মিলে একটি জমাটি জনতা চরিত্রের দৃশ্য রচনা করেছে। এরা নিজের নিজের অবস্থানের দ্বারা তৎকালীন সামাজিক বাস্তব অবস্থাটির একটি পরিপাটি চিত্র হয়ে উঠেছে। কৌলিন্য প্রথার বিভিন্ন দিক নিয়ে এরা সরব হয়ে পরোক্ষে সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের অবহিত করেছে। পঞ্চম অঙ্কে ভোজন রসিক উদরপরায়ণের সংলাপের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের সাথে সাথে দারিদ্র্যের ছবিটিও স্পষ্ট হয়। একই সঙ্গে অভাব মানুষকে কতটা নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে তার পরিচয়ও আমরা পাই। একজন পিতা একটু ভালো খাবারের আশায় তার নিজের সন্তানকেও বঞ্চিত করতে পিছপা হয় না। এই ছবি অত্যন্ত রূঢ় হলে তৎকালীন সমাজের বাস্তব ছবিই বলা যায়। উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবাবিবাহ" নাটকেও জনতা চরিত্র আছে। এই শ্রেণির জনতা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তাঁর সামাজিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করেছেন। প্রথম অঙ্কে কীর্তিরাম ঘোষের বাড়ীতে মেয়েদের কথোপকথন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবার সংবাদে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করে। মূলত এই মহিলা জনতা চরিত্র উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের ফলপ্রসূতে সমাজে মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তারই প্রতিনিধিত্ব করে।

'পদ্মাবতী। তোদের পাড়ায় কোন গোল শুনতে পেয়েছিস?

বিদ্যুল্লেখা। কিসের গোল মা?

পদ্মাবতী। তা শুনিসনি, সে কেমন গো? এদেশে যে আর কোন কথা নাই, কেবল সেই কথাই হচ্ছে, তোরা শুনতে পাসনি?

বিদ্যুল্লেখা। না, মা কিছুতো শুনিনি।

রেবতী। (অঞ্চল ধরিয়া) কি বললি মা রাঁড়ের বে হবে, কবে মা? রাইকিশোরী। কি বললি কি বললি মা রাঁড়ের বে, কার আগে হবে মা?

পদ্মাবতী। বিধবার যে বে হবে তোরা তা শুনিসনি? সুলোচনা। ওমা! ওমা। কার সঙ্গে মা, কোথা থেকে, বাপের বাড়ি থেকে, না শ্বশুরবাড়ি থেকে? পদ্মাবতী। তোরা তো বড় উতলা গো, কথার উপর কথা কোস বলতে দিসনে, আগে শোন তার পর যা হয় তা বলিস।' চতুর্থ অঙ্কে বিশ্বেশ্বর বসুর বাড়িতে দিগম্বর সেন, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পড়শীরাও জনতা চরিত্রের এক একটি একক হিসেবে এই নাটকে উপস্থিত হয়েছে। দীনবন্ধুর মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকটি মূলত একটি সামাজিক গণ-অভ্যুত্থানমূলক নাটক। এই নাটকটিকে কেন্দ্র করেই বাংলা মৌলিক সামাজিক নাটকের জনতা চরিত্র সার্থক রূপ পেয়েছে এবং অবশ্যই তা নাট্যকারের বাস্তবোপযোগী

সংলাপ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। এই নাটকের জনতা চরিত্রের ভাষাই "নীলদর্পণ" নাটকের প্রাণসত্তা। নাটকটি বিদেশী শাসকদের সামাজিক উৎপীড়নের পটভূমিকায় রচিত। নীলকর সাহেবরা এদেশীয় সাধারণ কৃষকশ্রেণির ওপর নীলচাষকে কেন্দ্র করে যে নির্মম অত্যাচার, শোষণ, দমন-পীড়ন, নারী নির্যাতন করতো তারই এক করুণ বাস্তব কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত "নীলদর্পণ" নাটকটি। এরূপ একটি জ্বলন্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হবার ফলে সহজাতভাবে জনতা চরিত্র অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আমিন, পেয়াদা সাধুচরণ, রেবতী বৃহত্তর অর্থে জনতা চরিত্র। এই অঙ্কে এদের অসহায়তার চিত্রটি স্পষ্ট। গ্রামের সাধারণ মানুষ এরা। এদের সকলের সামনে রাইচরণকে নীলকর প্রেরিত লোকেরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ সমস্ত কিছু দেখে শুনেও তাদের নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। নিজেদের মধ্যে আলোচনাটুকুই আপাতপক্ষে শেষ সম্বল। এই অসহায়তার চিত্রটি নাট্যকার কৌশলে সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেন।

সামাজিক নাটকে হাস্যরসাত্মক সংলাপ :

জীবনে চলার পথে মানুষ যতগুলো বৌদ্ধিক উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যায় তার মধ্যে হাস্যরসের বোধ একটি অন্যতম স্থান দখল করে। এক এক মুহূর্তে মানুষের রসবোধের ভাবনাগুলো এক এক রকম হয়ে থাকে। সমস্তগুলো ক্ষণস্থায়ী একথা জেনেও মানুষ আনন্দ অনুভূতিকে স্থায়ী করে রাখতে চায়। বিভিন্ন জৈবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষ এই অনুভূতিগুলো থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হয়। আনন্দ উপলব্ধিরও অনেক মাধ্যম আছে, তার মধ্যে শিক্ষিত জনেরা সাহিত্য পাঠের মধ্যে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের আনন্দকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে সাহিত্যে হাস্যরস একটি অন্যতম বিষয়। রসিক লেখক হাস্যরসকে যখন শৈল্পিক কৌশলে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন তখন পাঠক হৃদয়ও অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই হাস্যরসের পর্যায়গুলি আবার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। ইংরেজিতে হিউমার, উইট, আয়রনি ও স্যাটায়ার এই চার শ্রেণির হাস্যরসের অস্তিত্ব প্রায় সকল তাত্ত্বিকেরাই স্বীকার করে থাকেন যার বাংলা পরিভাষাগুলো হতে পারে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, কৌতুক, ভাঁড়ামো, রঙ্গরস ইত্যাদি।

ইংরেজিতে হিউমার বলতে যা বোঝায়, তারই অনুসরণে সাহিত্যিক পরিভাষায় আমরা "হাস্যরস" শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। সাহিত্যে সহৃদয় ক্ষমাপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, বিচ্যুতি, আচরণের অসঙ্গতি ইত্যাদিকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়, তাকেই আমরা বিশুদ্ধ হাস্যরস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই হাস্যরসের মধ্যে একটু-আধটু ব্যঙ্গবিদ্রুপ, তির্যক কটাক্ষ থাকতে পারে, কিন্তু সেটি কখনই আক্রমণের রূপ না নেয়। সেই কারণেই বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের নির্মল আনন্দে অভিষিক্ত করে। কিন্তু সাহিত্যের দেশ-কাল-পাত্র ও উদ্দেশ্যের বিচারে তা সব সময় সঠিকভাবে পালিত হয় না। ড. অজিতকুমার ঘোষ "বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন—"হাস্য জলের উপরস্থিত ভাসমান বুদ্বুদের ন্যায়ই ক্ষণিক ও চলল, কিন্তু হিউমর জলের তলশায়ী প্রবল ঘূর্ণিপাক—স্থায়ী এবং দূরপ্রসারী। জীবনের প্রতি সমবেদনাশীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্রিত অনুভূতি এইগুলিই হইল হিউমারের বৈশিষ্ট্য।"

একজন আদর্শ humourist কখনই নিজেকে উচ্চমার্গে বিচরণশীল মানুষ বলে মনে করেন না। তিনি নিজেকে একাত্ম করে দেন তাদের সঙ্গে যাদের নিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করছেন। সেখানে লেখক ও পাঠক উভয়ই একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। নির্মল হাস্যরস প্রণেতা সমাজের নানান অসঙ্গতি, অনাচার ও বৈষম্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, কিন্তু কোথাও তিনি কাউকে আক্রমণ করেন না। কারও প্রতি তার বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় না এবং তার দৃষ্টি হয় অনেক বেশি উদার ও ক্ষমাপ্রসন্ন। একই সঙ্গে একজন আদর্শ humourist আপাত হাস্যরসের অন্তরালে মানব জীবনের গভীর বেদনার রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। উচ্চতর হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনের গভীর ক্ষতকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন-কিন্তু সেই ক্ষত নিরাময়ের দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না। দোষ, ত্রুটি, ক্ষত দেখিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ, কিন্তু সমাধান করা তাঁর কাজ নয়। নাটকের মধ্যেও এই নির্মল হাস্যরসের ধারা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয় অথবা কখনও একক হাস্যরসের উপাদান হিসেবেও নাটক রচিত হতে পারে। সে বিষয়ে আমরা উপযুক্ত স্থানে আলোচনা করব। তার আগে হাস্যরসের অন্যান্য উপাদান বা অন্যান্য ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে হয়। হিউমারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, বরং তারমধ্যে মিশে থাকে সহৃদয় মনের কারুণ্যের স্পর্শ। কিন্তু ব্যঙ্গরস বা Satire তীব্র বিদ্রূপাত্মক এবং নির্মমতার পরিচায়ক। এই শ্রেণির হাস্যরসে উপহাসের সুতীব্র জ্বালা প্রদাহের সৃষ্টি করে। Humour-এ যে উচ্চকিত হাস্যরসের পরিচয় মেলে স্যাটায়ার-এ তার পরিবর্তে ব্যক্তি বা সমাজকে আক্রমণ করে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের অব্যর্থ তীর নিক্ষেপিত হয়। এই শ্রেণির রচয়িতারা অনেক বেশি নির্মম হয়ে থাকেন। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে সমাজের অথবা ব্যক্তির অনাচার, ভণ্ডামী এবং লাম্পট্য। অনেক সময় তিনি সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটক ও নাট্যকারদের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা তার প্রমাণ পেতে পারি।

Wit বা বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরসে বুদ্ধির ক্ষুরধার দীপ্তি তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত ঝলসে ওঠে। বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক মাত্রই এই শ্রেণির রচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। Humour-এর সঙ্গে Wit-এর আবেদন বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষার কাছে। ফলে humour হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু, কিন্তু Wit সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে শুধুমাত্র শিক্ষিত ও মার্জিত শ্রেণির কাছে।

পত্র ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ ৩

একক-১

বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ

বিকাশ : কী রে কেমন আছিস সুব্রত?

সুব্রত : এই চলছে রে তুই কেমন আছিস বিকাশ?

বিকাশ : আর ভাই এত গরমে কেমন থাকবো বল।

সুব্রত : ঠিকই রে দেখেছিস তো কি হারে পৃথিবীতে ক্রমশ উষ্ণতা বেড়েই চলেছে।

বিকাশ : আজকাল পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি বেড়ে চলেছে যা একটি খুবই বড় সমস্যার কথা।

সুব্রত : মানুষের বাসস্থান হলো পৃথিবীর যা আজ অনেক বড় বিপদে আছে জানিস তো এই তাপমাত্রার বৃদ্ধিকে নাম দেওয়া হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

বিকাশ : হ্যাঁ, সেই ১৮০০ সাল থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রমাণে দেখা দিয়েছে যে এটি মানুষের কাজকর্মের কারণে হচ্ছে।কিন্তু শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হয়ে চলেছে। কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে যেটি আমাদের পৃথিবীর জন্য খুবই ক্ষতিকারক। ইউনাইটেড নেশন ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UN FCCC) এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বর্তমানে বাতাসে যেভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে চলেছে তা যদি কমানো না যায় তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে এর ফলে প্রচুর ধরনের ক্ষতি হবে।

সুব্রত : হ্যাঁরে গত কয়েক বছরের তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বেশি বেড়েছে গত শতাব্দীতে গড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছিল ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ শতাব্দীতে সেটা আরও ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬.৬৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা।

বিকাশ : পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেরু অঞ্চলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে সমুদ্রের জলের উষ্ণতা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে আর নিকটবর্তী স্থান জলের তলায় চলেও যাচ্ছে।

সুব্রত : এর ফলে পৃথিবীতে হ্যারিকেন ও ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বড় বড় নিম্নচাপের সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে প্রবল বন্যা বা খরা দেখা দিচ্ছে।

বিকাশ : শুধু কি তাই বিভিন্ন স্থানে দাবানল সৃষ্টি হতে পারে। সামুদ্রিক জীবের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। মানুষেরা বিভিন্ন রকম রোগের প্রকোপে পড়ছে। বিশেষ করে হৃদযন্ত্র বা শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা। এমনকি বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হচ্ছে বলা যেতে পারে যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এর ফলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে চলে যাবে।

সুব্রত : হ্যাঁরে জানি সবই বিশ্ব উষ্ণায়ন এত বেশি পরিমাণে বেড়েছে যে বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মানুষকে।

বিকাশ : সেটাইতো শিল্পায়ন নগরায়ন নির্বিচারে সবুজের ধ্বংস ও দূষণ বৃদ্ধিকারী প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে আর পৃথিবীর সমস্ত দেশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সুব্রত : এর জন্য তো দায়ী শুধু আমরাই রে।

বিকাশ : মানুষ তাদের আকাশচুম্বী চাহিদা পূরণের জন্য বিরাট অরণ্য কেটে ফেলে সেখানে শপিংমল বড় বড় পাঁচতারা হোটেল তৈরি করছে। এর সঙ্গে বড় বড় জলাশয় কে বন্ধ করে উঁচু উঁচু বহুতল কংক্রিটের বাড়ি তৈরি হচ্ছে ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য এয়ারকন্ডিশন ফ্রিজের মতো মেশিনসহ বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলেও বায়ুর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে।

সুব্রত : শুধুমাত্র বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে নয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড,মিথেন এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি তাপকে আটকে রাখে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।

বিকাশ : হ্যাঁ একদমই তাই সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক চাহিদার জোগান দেওয়ার জন্য বড় বড় কারখানার পাশাপাশি উড়োজাহাজ এবং জল জাহাজের ব্যবহার ও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। এর ফলে বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুব্রত : হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই এছাড়াও কোন কোন দেশে যখন দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চলে তখন যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের ফলে ও বায়ুর তাপমাত্রা বাড়ছে। আরেকটি বিষয় তো না বললেই নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ যানবাহনই বায়ুর তাপমাত্রা অন্যতম বিশেষ কারণ।

বিকাশ : জানিস তো সুব্রত আমি গত দিনে আনন্দবাজার সংবাদপত্রে পড়লাম পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তর মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে। ফলে উষ্ণতা বাড়ার বিষয়টি ব্যাপক মাত্রা ধারণ করেছে শুধু কি তাই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে প্রকৃতিও আজ ধ্বংসপ্রায় এর পথে।

সুব্রত : এইসব ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলি থেকে সভ্যতা এবং সমাজকে বাঁচাতে আমাদের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যেমন-ইকো ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে, আমাদের বেশি করে বৈদ্যুতিক চালিত যানবাহন ব্যবহার করতে হবে চেষ্টা করতে হবে মোটর চালিত যন্ত্রের ব্যবহার কম করে সৌর শক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো। সবুজায়নের দিকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে জলাশয়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রকৃত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বিকাশ : ঠিকই রে এগুলির পাশাপাশি প্রতিটি হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট কিংবা বাড়িতে গাছ লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। নয়তো সরকারকে অনুমোদন আটকে দিতে হবে।

সুব্রত : আবার বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হলো বায়ু দূষণ। প্রচুর পরিমাণে বায়ুতে গ্যাস নির্গত হয়। কলকারখানা থেকে যানবাহন থেকে এই দূষিত গ্যাস গুলি বাতাসে উষ্ণতা বাড়িয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়াচ্ছে। এই বায়ুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। আবার আমরা প্রচুর পরিমাণে কয়লা পেট্রোল জ্বালিয়ে থাকি যা প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ এবং বাতাসের উষ্ণতাও বৃদ্ধি করে থাকে। এই জ্বালানির পরিমাণ কমিয়ে অপ্রচলিত শক্তি অর্থাৎ জলশক্তি ,বায়ু শক্তি, জোয়ার ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই বিদ্যুৎ বা কারেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

বিকাশ : এছাড়াও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।কারণ জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে আসবে বন সংরক্ষণ করতে হবে। যে সকল বড় বড় বন কেটে কলকারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে সেই জায়গার বনগুলির সংরক্ষণ করতে হবে। বন সংরক্ষণের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

সুব্রত : নতুন করে সবুজ বা জলাভূমি ধ্বংস করা যাবে না বৃক্ষরোপন করে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানো যেতে পারে। কলকারখানাগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। গাড়ি কিংবা সমস্ত রকমের যানবাহন যেখান থেকে দূষিত গ্যাস বেরোয় সেগুলোর বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

বিকাশ : প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলে বিকল্প শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে এবং চাই সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা।

সুব্রত : সংযম আর দূষণ বিরোধী স্পষ্ট ভূমিকা এখন পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে।

বিকাশ : না হলে বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে মানুষ সভ্যতার কোন রেহাই নেই।

সুব্রত : জন্ম মৃত্যু হাসি কান্না নিত্য নাটের খেলা। মাটির পরে আঁকড়ে ধরে শুকনো পাতার দল। কালের চক্রে সৃষ্টি ধ্বংস প্রকৃতি করছে অবিচল।

সংলাপ :

নারীর অধিকার নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ রচনা।

রিয়া : মাধ্যমিক পাস করার পর তুই তো উচ্চ মাধ্যমিক পড়বি? আমার ভাই এই মাধ্যমিকে পড়াশোনা থমকে যাবে।

রিনি : দুঃখ করার কিছু নেই। আমারও তো এখন সেই একই অবস্থা। মা-বাবা এখন থেকেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

রিয়া : স্বাধীনতা শব্দের অর্থ শুধুমাত্র আকারেই বেড়েছে। নারীর ক্ষেত্রে তা বেশিরভাগ সময় সেসবের কোন অর্থই নেই।

রিনি : বলতো! এই পড়াশোনা নিয়ে কতটা এগোতে পারি আমরা।

রিয়া : আমাদের বাবা মাদের বোঝাতেই হবে আর তাদের মাথা থেকে সরাতে হবে তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার চিন্তাভাবনা।

রিনি : মনে আছে যখন আমরা নবম শ্রেণিতে শারদীয় উৎসবের 'স্ত্রী পত্র' অভিনয় করেছিলাম?

রিয়া : মনে নেই আবার সে সব কথা মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সত্যিকারের নারী স্বাধীনতা হদিস তো ওখানেই পেয়েছিলাম।

রিনি : আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীর স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। অতএব এবার আমাদের শপথ নিতে হবে যেমন করেই হোক পড়াশোনাটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

রিয়া : নারী স্বাধীনতা আসলে কি বলতো দেখি?

রিনি : এ প্রশ্ন যদি জনসম্মুখে করা হয় তাহলে বিজ্ঞজনদের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হবে।

রিয়া : নারীর অধিকার নিয়ে নারী স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার লোকের অভাব হয় না।

রিনি : তাহলে অভাবটা কিসের বলতো?

রিয়া : অভাব হচ্ছে উপলব্ধিতে উ নারী স্বাধীনতা যে কি তা উপলব্ধি করার মানুষের বড় অভাব।

রিনি : ঠিকই বলেছিস তুই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। বর্তমানে সমাজে দুই ধরনের জনগোষ্ঠী খুব তৎপর। এক ধরনের জনগোষ্ঠী উগ্রতার দোহাই দিয়ে নারী স্বাধীনতাকে কৌশলে ধ্বংস করার চেষ্টায় মত্ত। আরেক ধরনের জনগোষ্ঠী নারী স্বাধীনতার আড়ালে উগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত।

রিয়া : আমি বুঝি নারী স্বাধীনতা অর্থ হলো নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং নিজের সুস্থ চিন্তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারা।

রিনি : বিষয়ের জটিল এ না গিয়ে নারীবাদ নিয়ে একটা কথা না বললেই নয়। নারীবাদের সৃষ্টি নারীকে পুরুষের মর্যাদায় তুলে আনার জন্য বা নারী পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে এবং নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক অপরাধ কামানোর লক্ষ্যে।

রিয়া : কিন্তু নারীবাদী চেতনার মধ্যে দিনের পর দিন ধীরগতিতে স্থান করে নিয়েছে একটি শরীরকেন্দ্রিক চেতনা। যা নারীকে আবার শরীর মাত্র করে তুলেছে। কৌশলে অসম্ভব করে তুলেছে নারীর সত্যিকারের স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে।

রিনি : তুই আশেপাশে খেয়াল করলে দেখতে পাবি। বিভিন্ন সভা সমাবেশে কিছু মানুষ গলা উঁচু করে নির্দ্বিধায় নারী স্বাধীনতার কথা বলেন। নারীদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এই যে গলা উঁচু করে ভাষণ দেওয়া জনগোষ্ঠী তাদের কি বিশ্বাস! দিনশেষে তারাই যে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে ব্যর্থ।

রিয়া : সবচেয়ে দুঃখজনক, এটাই যে সেই লোকদেখানো বড় বড় কথা বলা গোষ্ঠীই ঘরে ফিরে নিজের স্ত্রী সন্তানকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টায় থাকেন।

রিনি : একজন নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে পরিষ্কারভাবে উঠে আসবে নারীর জীবন কতটা ভয়াবহ। এই ভয়াবহতার পেছনে যে কেবল পুরুষ সমান ভাবে দায়ী।

রিয়া : আমরা কথায় কথায় পুরুষের দোষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে কখনোই মুখ খুলি না। নারীবাদী হতে গিয়ে আমরা অনেকটাই পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছি। যা আসলে আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে শেখায়।

রিনি : কিন্তু নারীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, নিজেদের জায়গাটা নিজে চিনে নিতে শেখে, পুরুষের সাধ্য নেই নারীকে আটকানোর।

রিয়া : কিন্তু দেখ! নারীকে নিজের পরিবার থেকেই প্রথমত পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে অন্য পরিবারে গিয়েও নারীর সেই শিকলে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ভালো লাগুক আর না লাগুক সবকিছু কে সায় দিতে হয় তাকে।

রিনি : নারীর সাথে অন্যায় হলেও পরিস্থিতির কারণে মুখ বুজে সহ করে নিতে হয়। এর থেকেও বড় একটি কারণ হলো নারীরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল। দুর্বল জায়গা আঘাত করা মানুষের আজন্ম স্বভাব। অনেক নারী আবার অধিকার আদায় কিছুটা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাদেরকে দমানোর চেষ্টায় পুরো সমাজ যেন উঠে পড়ে লাগে।

রিয়া : আপনজনদের কাছ থেকে মুখস্ত বুলির মতো নারী শোনে মানিয়ে নেওয়ার কথা! এই যে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে এ যেন নারীর দোষ।

রিনি : আরেকটি মজার বিষয় হলো কি জানিস? সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভধারণের মত বিষয়টিকে সকল সমাজেই নারীর অসুস্থতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটাকে একটা লজ্জার বিষয় বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রিয়া : এখনো, আমাদের দেশে কোন মেয়ে গর্ভবতী হলে তার আত্মীয়-স্বজনরা লুকিয়ে লুকিয়ে কানে কানে খবর দেয় যে অমুক অসুস্থ।

রিনি : এছাড়াও তো গর্ভচাপে রাখা হয়, গর্ভধারণের কথা সহজে কাউকে প্রকাশ না করতে। যেন মনে হয় গর্ভধারণ করে মেয়েটি এক লজ্জাজনক অপরাধ কাজ করে ফেলেছে। অথচ মানব সমাজে গর্ভধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তার একচ্ছত্র অধিপত্য শুধু নারীর। দুঃখের বিষয় এটাই যে নারীরাও এই সত্য উপলব্ধি করতে এখনো ব্যর্থ।

রিয়া : আবার নাকি নারীকে বলা হয় মায়ের জাত। এই কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে আছে নারীকে সম্মান দেওয়া কিন্তু বর্তমানে এই মায়ের জাত শব্দটিকে পুঁজি করেও নারীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা দেখেছি।

রিনি : আবার দেখা যায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নারীকে বিভিন্ন সম্পর্কের নারী হয়ে যেতে হয়, কিন্তু আলাদা করে সে কোন জাত নয়। সে কেবলই একজন নারী। একজন মানুষ। কখনো অনেক নারী এবং পুরুষ ও মনে করেন নারী বিষয়ক যেকোনো আলোচনা অশ্লীল বিতর্কিত। নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলাও এই অশ্লীল বিতর্কের অংশ।

রিয়া : এরকম ধারণা থেকে বের হয়ে আসা সবচেয়ে জরুরী। মন-মানসিকতা স্বচ্ছ না হলে যতই আন্দোলন আর সভা সমাবেশ হোক না কেন, গলা ফাটিয়ে যতই নারী স্বাধীনতার কথা বলা হোক না কেন, দিনশেষে ফলাফল শূন্যই থাকবে।

রিনি : দেখ মন মানসিকতা স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুরুষের নয় নারীরও। নারীর বুঝতে হবে। নারীর স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করতে হবে এমন নয়। তবে সামনে বাধা আসবেই তা ভেবে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় নারীকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

রিনি : নারীকে নারীর মতো করে বাঁচতে দেওয়া উচিত। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীরও প্রথম পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ। অন্য সব মানুষের মতো নারীও নিজের ইচ্ছের, পছন্দের, ভালবাসার, সিদ্ধান্তের মানুষ।

উষ্ণায়ন ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ :

লব : কি করছিস বন্ধু?

কুশ : ভাবছি।

লব : কি এত ভাবছিস শুনি!

কুশ : ভাবছি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে। গতকাল একটি পত্রিকায় পড়লাম বিশ্বের তাপমাত্রা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খুবই সংকটের মুখে প্রতিপন্ন।

লব : হ্যাঁ রে ঠিকই বলছিস।

কুশ : দেখ গত শতাব্দীতে যে তাপমাত্রা ছিল তার তুলনায় বর্তমান শতাব্দীতে উষ্ণতা দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলেছে। আইপিসিসি এর মতে গত শতাব্দীর তাপমাত্রা বেড়েছিল ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই শতাব্দীতে সেটা আরো ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬.৬৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন।

লব : হ্যাঁ আর তার জন্য আমরা ও আমাদের এই মনুষ্য সমাজই দায়ী।

কুশ : হ্যাঁ, বর্তমানে বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণে বৃক্ষের নিধন। পৃথিবীজুড়ে প্রতিনিয়ত বিক্ষোচ্ছেদন করে যে হারে নগরায়ন শিল্পায়ন গড়ে উঠছে বা বনভূমি কেটে চাষ হচ্ছে তাতে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে আর তাতে করে বিশ্বের উষ্ণায়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লব : আমিও সেদিন একটি প্রতিবেদনে পড়েছি যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে নাকি বেশি বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস ছড়াচ্ছে এ কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়ছে তাতে করে পৃথিবীর উপকূল অঞ্চলগুলি সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ এবং সুন্দরবনের মতো নিচু দেশগুলি জলমগ্ন হবে।

কুশ : হ্যাঁ এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার।

লব : শুধু তাই নয় যে পরিমাণে কংক্রিট এর বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে ফ্রিজ,এসি ব্যবহার করা হচ্ছে আর তার থেকে যে CFC গ্যাস নির্গত হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত আমাদের ওজোন স্তরে ফাটল ধরাচ্ছে। আর এর ফলে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে সরাসরি এসে যেমন জীবজগতের মারাত্মক ক্ষতি করছে তেমনি বৃদ্ধি করছে তাপমাত্রা।

কুশ : হ্যাঁ তার সাথে সাথে কলকারখানা ধোঁয়া এবং যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে মানুষের শরীরকে ও মনকে দূষিত করছে।

লব : এছাড়াও আমরা যে প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহার করছি তার ফলে ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। আর সেই পলিথিন ড্রেন এবং বিভিন্ন নদী-নালায় জমে গিয়ে নিকাশী ব্যবস্থার সর্বনাশ করে জমে থাকা জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস সৃষ্টি করছে এবং উষ্ণতাও বাড়াচ্ছে আর এই পরিবেশ দূষণ পরিবেশবিদদের কাছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুশ : আর বর্তমানে কৃষকরা কৃষিকাজে নানা রকম কীটনাশক ব্যবহার করছে তারফলে মাটি ও জল দূষিত হচ্ছে আর সেটাও তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণের একটি অন্যতম কারণ।

লব : পৃথিবীর এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলেই তো ক্রমশ বেড়ে চলেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, টর্নেডো, দাবানল ,সুনামি। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঘটে যাওয়া সুনামির ভয়াবহ চিত্র আমাদের মনের স্মৃতিকোঠা থেকে মুছে যায়নি।

কুশ : হ্যাঁ আর অতিসম্প্রতি ২০২০ সালের ২৪ মে ভয়ংকর সুপার সাইক্লোন আমফানের বিধ্বংসী ধ্বংসলীলারও তো আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। আবহাওয়ার এইরকম পরিবর্তনের জন্যই তো বহু রোগের শিকার হচ্ছি আমরা।

লব : বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলেই আবহাওয়া ও ঋতুচক্রের পরিবর্তন ঘটছে তার ফলে দেখা দিচ্ছে কখনও অনাবৃষ্টি আবার কখনও অতিবৃষ্টি।

কুশ : হ্যাঁ তার ফলেই তো বিশেষত কৃষকদের জীবনে দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ বিপর্যয়। তারা ঠিক মত ফসল ফলাতে না পেরে পেটের তাগিদে মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছে।

লব : হ্যাঁ আমাদের গ্রামে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখেছি।

কুশ : তুই কি খেয়াল করে দেখেছিস বর্তমানে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ এবং তার আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

লব : হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

কুশ : হ্যাঁ কলকারখানা,যানবাহনের ধোঁয়া আর বিশেষ করে গ্রিনহাউস গ্যাস-এর প্রভাবেই ফুসফুস ও ত্বকে ক্যান্সার হচ্ছে।

কুশ : হ্যাঁ, আর বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই শতাব্দীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে যত মানুষের মৃত্যু হবে তা দুই বিশ্বযুদ্ধে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তার তুলনায় অধিক।

লব : আর এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অনাগত পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে আমাদেরই সচেতন হতে হবে।

কুশ : হ্যাঁ একদমই তাই।

লব : আর তার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে এবং গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। আর এসি ফ্রিজ এর ব্যবহার কমাতে হবে।

কুশ : হ্যাঁ আর শুধু আমাদেরকে সচেতন হলে হবে না এক্ষেত্রে সরকারি নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই অনুপাতে গাড়ির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এই গাড়িগুলোতে ব্যবহৃত ডিজেল পেট্রোল বায়ুকে যেমন দূষিত করছে তেমনি প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করছে গ্রীন হাউস গ্যাস। এই ডিজেল বা পেট্রোলের পরিবর্তে যদি আমরা সি.এন.জি গ্যাস গাড়িতে ব্যবহার করি তবে বায়ু দূষণ ও গ্রীনহাউস গ্যাসের হাত থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে পারি আর এই সি.এন.জি গ্যাস ব্যবহারের জন্য সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

লব : আর কলকারখানাগুলিতে জৈব গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে।

কুশ : আর কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বন্ধ করে জৈব সারের প্রয়োগ চালু করতে হবে। আর এ বিষয়েও সরকারি ফরমান জারি করা খুবই জরুরী।

লব : হ্যাঁ আর প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করে মাটি এবং জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আর তার সাথে সাথে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে সৌর প্যানেলের ব্যবহার বাড়াতে হবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। তবে আমরা একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশ অনাগত ভবিষ্যৎকে উপহার দিতে পারব।

কুশ : হ্যাঁ তাই ৫ জুন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করলেই হবে না, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে আগ্রহী করতে তুলতে হবে। "গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও" এই স্লোগানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই আমরা হয়তো আমাদের সেই আগের পরিবেশ ফিরে পাব।

লব : হ্যাঁ একদমই আমরা তাই করব।

কুশ : এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বারবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে। শোনাবো?

লব : হ্যাঁ শোনা তবে।

কুশ :

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোস্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রসী,
দাও সেই তপোবন পুন্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি..........।'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাট্যভিনয়ের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই ১৯৮৫।

২) অজিত কুমার ঘোষ, রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৯৪।

৩) অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং জানুয়ারি ২০০৫।

৪) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম খন্ড), আদিযুগ (১৭৯৫-১৯১২), এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০১০।

৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, (দ্বিতীয় খন্ড), আধুনিক যুগ (১৯০০-১৯৭০), এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৭১।

৬) চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, কলকাতা, জুন ১৯৮০।

৭) তপন মন্ডল, উনিশ শতক সামাজিক নাটক ও প্রহসনে নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া, ২০১০।

৮) দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়,নাট্যতত্ত্ব বিচার, করুনা সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০০৩।

৯) দর্শন চৌধুরী, উনিশ শতকের নাট্যবিষয়, গ্রন্থ বিকাশ, অক্টোবর ২০০৭।

১০) দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, এপ্রিল ২০০৩।

১১) দেবেন্দ্রনাথ সরকার, বাংলা নাটকে জনতা চরিত্রে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রথযাত্রা ২০১০।

১২) ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৩) প্রভাত কুমার দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদমন্দির, কলকাতা।

১৫) রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার, গণমন প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৫।

১৬) রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, মে ২০০৩।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

১) সংলাপ কাকে বলে? সংলাপের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

২) বাংলা নাটকে সংলাপের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩) একটি সামাজিক নাটকের উদাহরণ দিয়ে নাটকটির সংলাপ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪) একটি পৌরাণিক নাটকের উদাহরণ দিয়ে নাটকটির সংলাপ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫) বাস্তব কোন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সংলাপ সম্পর্কে তোমার অভিমত তুলে ধরো।

৬) একটি রাজনৈতিক নাটকের উদাহরণ দিয়ে নাটকটির সংলাপ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৭) বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৪

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৩

থিয়েটারের ভাষা : উৎপল দত্ত

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে নয়ের দশক পর্যন্ত একনাগাড়ে উৎপল দত্ত (জন্ম ২৯ মার্চ, ১৯২৯, মৃত্যু ১৯ আগস্ট, ১৯৯৩) যে নাট্যকর্মকাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা এক বিশ্বকর্মার মতোই। উৎপল দত্ত এমন একটি নাম যে নামের সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতি আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক, কবি, বাগ্মী, জাঁদরেল অভিনেতা। তিনি একাধারে প্রবন্ধকার। তিনি সু-সাহিত্যিক, তার্কিক হিসেবে ভীষণ পটু ছিলেন। গানের রাগ যেমন বোঝেন। চলচ্চিত্র অভিনেতা যেমন, তেমন পটু চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজেও। সব ছাপিয়ে তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী। বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্রে আস্থা রেখেছেন আজীবন।

উৎপল দত্ত ইংরেজি থিয়েটারের চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যচর্চায় মন দিয়েছেন। নাট্যকার শেকসপিয়ার ছিলেন তাঁর প্রেরণা। তিনি ছিলেন মনীষদৃপ্ত এক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। ঐতিহ্যকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর সৃষ্টিসাধনার অন্তরবিন্দুতে ছিল মার্কসবাদী চিন্তাধারার ক্ষুরধার উপাদান। তিনি জানতেন নিপীড়িত মানুষকে ভালোবেসে তার চিরমুক্তির সোপান তৈরিতে একজন স্রষ্টার অবশ্যই ইতিহাস, দর্শন ও তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান এবং মার্কসবাদের শিক্ষা থাকা দরকার। জীবনের প্রতিটি পর্বেই তাঁর প্রতিভা, প্রজ্ঞা, ইতিহাসবোধ, সমাজচেতনার হাত ধরে শিল্পের শাণিত হাতিয়াররূপে বারবার ঝলসে উঠেছে।

'আমি নিরপেক্ষ'—এই কথাটির মধ্যে একটি বিশেষ চাতুরি আছে, যা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত তাঁর জীবদ্দশায় এই চাতুরিতার পঙ্কিল পাঁকে আবর্তিত হননি। তাই তাঁর সদম্ভ ঘোষণা—'আমি নিরপেক্ষ নই। আমি রাজনৈতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। যেদিন থেকে আমি রাজনৈতিক সংগ্রামে আর অংশগ্রহণ করব না সেদিন শিল্পী হিসেবেও আমার মৃত্যু ঘটবে।' অর্থাৎ বিশিষ্ট নট, নাট্যকার ও আধুনিক থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ উৎপল দত্ত নিরপেক্ষ নাট্যকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের পাশে। প্রতি মুহূর্তে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। মানুষের বৃহত্তর অংশই উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়বস্তু। ফলে জাতীয় ও আর্নজাতিক স্তরের এমন কোনও ঘটনা নেই যা তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর প্রতিটি নাট্যসৃষ্টি ও প্রযোজনা কর্মের পিছনে রয়েছে সমসাময়িক জ্বলন্তপ্রশ্ন ও ঘটনাবলী। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ, সতীদাহ প্রথা, দেশভাগও গান্ধী হত্যা, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে তিনি নাটক লিখেছেন, লিখেছেন যাত্রা, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহান অক্টোবর বিপ্লব, ভিয়েতনাম, কিউবা,চিনও ফ্রান্সের বিপ্লব,জার্মানিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বিপ্লব ইত্যাদি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিশাল মনীষা, প্রগাঢ়পাণ্ডিত্য, বিশ্বরাজনীতি ও নাটকে অসামান্য দখল, ইতিহাসচেতনা ও সহজাত কৌতুকবোধতার নাট্যের শরীরে ছাপ ফেলেছে। ফলে আধুনিক থিয়েটারে তিনি হয়ে উঠেছেন এক দিকচিহ্ন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, জিওফ্রেকেন্ডালের ব্রিটিশ পেশাদারী দল ‘দি শেক্সপীয়রিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী’তে নাটক করার অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং গণনাট্য সংঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক রচনায় হাত দেন। ১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেবার সময় তাঁর উপলব্ধি ‘গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙ্গে গেল।’ পরবর্তীকালে তিনি গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক গণ্ডীর মধ্যে থাকলেন না। কিন্তু নিজেকে গণনাট্য সংঘের উত্তরাধিকার বলে মনে করতেন। গণনাট্য সংঘের বাইরে মার্কসবাদী দীক্ষা নিয়ে নাট্যকার পরিচালক, অভিনেতা সাংগঠনিক হিসেবে পাদপ্রদীপে আসেন। পরের বছরই তাঁর স্বপ্নের নাট্যদল ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ (এল. টি. জি) গড়ে তোলেন। চলচ্চিত্র শিল্প ও তারকাদের উত্থান-পতনের নেপথ্য কাহিনি নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গনাটক ‘ছায়ানট’। আর ‘অঙ্গার’ নাটকে চিনাকুড়ি কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের উদাসীনতা ও শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার মমন্তুদ কাহিনি তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এল. টি. জি.-র প্রযোজনায়, উৎপল দত্তের সুপ্রযুক্ত, মননশীল নির্দেশনায় ‘অঙ্গার’ অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাপস সেনের আলো, পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরঝঙ্কার এবং নির্মল গুহ রায়ের অসাধারণ মঞ্চ প্রযোজনাকে চূড়ান্ত সাফল্যে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লেখেন ১৯৩০-এর সশস্ত্র আন্দোলনের পটভূমিতে ‘ফেরারী ফৌজ’। অদ্বৈত মল্লবর্মনের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে নিয়ে আসেন। ভারতের নৌ বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে রচনা করেন ‘কল্লোল’। বিষয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে এ নাটক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। নৌবিদ্রোহ কংগ্রেসীদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করে সেসময়ে কংগ্রেসীরা ‘কল্লোল’ বন্ধের হুমকি দেয়। মিনার্ভা থিয়েটারে ‘কল্লোল’ চলাকালীন অনেকবার আক্রমণ চলে। উৎপল দত্তকে বিনা বিচারে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক করা হয়। তা সত্ত্বেও ‘কল্লোল’ পাঁচশত রজনী অতিক্রম করে। কারামুক্তির পর তিনি রচনা করেন ‘অজেয় ভিয়েতনাম’, ‘তীর’, ‘মানুষের অধিকারে’, ‘যুদ্ধং দেহি’, ‘লেনিনের ডাক’ ইত্যাদি নাটক। অবশেষে তাঁকে মিনার্ভা ছাড়তে হয় মূলত আর্থিক কারণেই। শুধু তাই নয়, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অনন্য গৌরবের অধিকারী লিটল থিয়েটার গ্রুপ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বাইরের রাজনৈতিক চাপে ভেঙ্গে যায়। ১৯৬৯ সালে ‘বিবেক নাট্য সমাজ’ নামে একটি নিজস্ব যাত্রাদল গড়ে তোলেন। মিনার্ভায় যেমন ‘অঙ্গার’, ‘কল্লোল’-এর প্লাবন বইয়ে ‘দিন বদলের পালা’কার হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন, তেমনি ‘রাইফেল’, ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’, ‘দিল্লীচলো’, ‘শোন রে মালিক’, ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’’ ইত্যাদি মঞ্চসফল যাত্রাপালা লিখে সাড়া লাগিয়ে দেন। এগুলিতে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা উন্মোচিত হয়। বিবেক নাট্য সমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে গড়ে ওঠে ‘পিপলসলিটল থিয়েটার’ বা পি. এল. টি. (১৯৭০)।

দ্য অ্যামেচার শেপিয়রিয়ানসথেকে কিউব গোষ্ঠী হয়ে লিট থিয়েটার গ্রুপ সৃষ্টি, পেশাদারি দক্ষতায় অপেশাদার নাট্য আন্দোলনকে মিনার্ভা থিয়েটারে তুলে নিয়ে পেশাদার নাট্যআন্দোলন পরিচালনায় এলটি জি-র দশকব্যাপী সাফল্য অর্জন। এল টিজিকে পিপলসলিটল থিয়েটারে রূপান্তর, ইংরেজি ক্লাসিকসথেকে কমিউনিজম প্রচারে উত্তরণ, গণনাট্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ, পথনাটক নিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ; বাংলা ধ্রুপদী নাটকের অভিনয় করতে করতে রাজনৈতিক লক্ষ্যে নাট্যকারে পরিণত হওয়া। পেশাদারি দক্ষতায় চলচ্চিত্রের অভিনয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন; বৈপ্লবিক থিয়েটারের দর্শন ও ভাবনাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে যাত্রাপালা রচনা ও পরিচালনায় অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি; বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলীর কাছে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবংবিধ পর্বতপ্রমাণ কাজের পাশাপাশি উৎপল দত্ত লিখে গেছেন তাঁর লব্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধ তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা-‘চায়ের ধোঁয়া’, ‘জপেন দা জপেন যা’।

জাতীয় বিশ্রদ্ধ রীতির নাট্যতর্ক, 'স্তানিশ্লাভস্কি থেকে ব্রেখট', 'শেপিয়ারের সমাজচেতনা', 'গিরিশমানস' জাতীয় নাট্যতর্ক বিশ্লেষণ, 'টুয়ার্ডস এ রিভোলিউশনারি থিয়েটার' জাতীয় আত্মজৈবনিক নাট্য নির্ণয় এবং মৃত্যুর অব্যবহিতকালে 'প্রতিবিপ্লব' ও 'আশার ছলেনে ভুলি' জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিখারের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। লেখালেখির ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের মূল ঝোঁক ছিল প্রবন্ধের দিকে। রম্যরচনার ফাজিল বা আত্মমগ্ন গদ্যের খেয়ালি ভাবুকের বদলে জাঁকিয়ে বসে প্রবন্ধ। একইসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর কলেজ জীবনের শুরু থেকেই। এমনকী তাঁর বাংলা প্রবন্ধের বিষয় পাশ্চাত্যের সংগীত এবং ইংরেজি প্রবন্ধের বিষয় বাংলা উপন্যাস হতে বাধেনি। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে বাস্তবতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রুশ কিংবা বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিতে বাস্তবতার সন্ধান করেছেন তিনি। সেই বাস্তবতার প্রসঙ্গে কখনও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন, কখনও রুশ সাহিত্যে তার অতি-সাম্প্রতিক পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে আবার বাংলাসাহিত্যের দিগন্তে তার ঊষালগ্ন প্রত্যক্ষ করেছেন কখনও বা প্রতীচ্যের রোমান্টিক সংগীতস্রষ্টারা তাঁর মন চুরি করলেও স্তানিশ্লাভস্কির সংগীতে হাতুড়ির ধাতব শব্দ তাঁর কান ফাঁকি দিতে পারেনি। একদিকে বিশুদ্ধ সংগীতকে তিনি এনেছেন নাট্যের অঙ্গনে এবং বস্তুবাদী রাজনীতির আলোয়। অন্য ধ্রুপদী সৃষ্টির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন সমকালীন সমাজবাস্তবের প্রেক্ষিতে। রাজনীতি যেটুকু আছে, থেকেছে নকশার মতো। তাঁর সৃষ্টির ঈশানকোণে মেঘের ডাক শোনা গেছে, কিন্তু প্রবন্ধ তাঁর বর্ষণের যোগ্য ক্ষেত্র নয়, তবু প্রাবন্ধিক উৎপল দত্ত নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রথম বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র উৎপলের প্রথম প্রবন্ধ ইংরাজিতে 'A Glance at Modern Russian Literature' প্রবন্ধটি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে। এছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হল 'বাস্তবতাও বাংলা সাহিত্য', 'Three Bengali Novelists' (জুলাই বিপ্লবঃ, 'সিম্ফনি" (জুলাই ১৯৪৭), 'The Scepticism of Bertrand Russel' (১৯৪৮), "Production Manifesto" (১৯৪৮), 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট অভিনয়ের স্মারকপত্র', 'Exultation' ('Four on Poetry') (১৯৪৯), 'Shakespeare and the Modern Stage' (The Sunday Statesman ২/৭/১৯৪৯)।

প্রথম প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উৎপল আধুনিক রুশ সাহিত্যের চরিত্র অধ্যয়ন করেছেন মূলত উপন্যাসের মাধ্যমে। সব মিলিয়ে মোট ছ-জন লেখকের দশটি উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন তিনি। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ম্যাক্সিম গোর্কি ('মাদার'), আলেকসেই তলস্তয় ('দ্য রোড টু ক্যালভারি') মিখাইল শলোকভ ('অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্রোজ ডোন'), ভাসিলি গ্রোসমান ('দ্য পিপলইম্‌মরটাল'), ভান্ডা ভাসিলেভস্কা ('দ্য রেনবো') এবং ইলিনয় এহরেন বুর্গ ('আউট অফদি কেটস উইদাউট পর্জিং আ ব্রেন')।

আমরা জানি কবি-সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রকর সবাই যে মাধ্যমে তাদের বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরেন সেই মাধ্যমের নিজস্ব ব্যঞ্জনা-অলংকার, ব্যাকরণ ও রীতি-নীতি আছে। কবিরা যেমন কথার পর কথা সাজান, ঠিক তেমনি চিত্রকর সাজান রং এবং গায়ক গাঁথেন তার স্বরের মালা। উদাহরণ স্বরূপ উৎপল দত্ত কবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

'আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতায়
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—

নীলকান্ত আকাশের থালা

তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।'[২]

একথা শোনা বা পড়ার সাথে সাথে আমাদের মন চলে যায় নিভৃতের দিকে, আর আবেগ আসে কথার জোয়ারে। এটা কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়। কারণ কবিতার ছত্রে ছত্রে আছে উপমা, ছন্দ প্রয়োগে মনের আবেগঘন মুহূর্তের বর্ণময় প্রকাশ।

কবির কবিতা লেখার মতো চিত্রকরের চিত্র রচনা প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত অবনীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি লিখলেন 'অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন পূর্ববঙ্গের ল্যান্ডস্কেপ। দেখে মন নিরুদ্দেশে উধাও হতে চায়। সেটাও শিল্পী দৈবভরসায় ছেড়ে দেননি। সমালোচকের বেরসিক চোখও ধরতে পারবে না কোনো ভুলনা ড্রয়িং-এ না বর্ণালিবিভঙ্গে। প্যাস্টেল আর ক্রেয়নের পশ্চিমি কায়দাকানুন সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছে, রয়েছে কমনীয়তা, প্যাটিনার ধাঁচ, রয়েছে ভেনিশীয় বর্ণচ্ছটা, ধূসর ছবিতে লাল ঘুড়িপশ্চিমি বৈচিত্র্যনীতি অনুসৃত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। আঙ্গিকের আইন মেনেছেন অবনীন্দ্রনাথ; সে-আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই ফুটিয়েছেন সীমানাহীনের চেহারা। আইনটাই তাঁর হাতে অস্ত্র।'

কবি, চিত্রকরের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক গায়কের কথা বলতে গিয়ে জানালেন যে ওস্তাদ যখন কেদারা গান, তখন তার তানের পর তানে আমরা চমৎকৃত হয়ে উঠি। কতরকমের গমক, কী বিচিত্র তার ভঙ্গি, কী অবশ্যম্ভাবী সম-এ এসে দাঁড়ানো। সেই সুরের মায়াজালে চোখের সামনে আমরা স্পষ্টতই যেন দেখতে পাই এক যুবতীকে, আলুলায়িত তার কেশদাম, পরিধানে যেন এক গৈরিক বসন। তাকে ঘিরে যেন সব সখীরা নাচছে। মহাদেবের আরাধনায় মগ্না যুবতীও যেন তখন নৃত্যরতা। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শঙ্খধ্বনি আর সখীদের পায়ে নূপুরের রিনিঝিনি। আমাদের যেন মনে হয় খাঁ সাহেব সমস্ত আইনকানুনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। কিন্তু না আইন মেনেই এখানে যেন বে-আইনের ভান করা হয়েছে। চরম নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই যেন বেপরোয়া, উদ্দাম অনিয়ম ফুটে উঠেছে। কবি, চিত্রকর ও গায়কের উদাহরণের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক একথায় জানান দিলেন যে তিনটে মাধ্যমের প্রকাশের মধ্যেই একটা ব্যাকরণ আছে। তাই সহজতই প্রশ্ন জাগে তাহলে থিয়েটারের নিয়ম কোথায়? থিয়েটারের কোনো নিজস্ব ভাষা আছে কি? কোথায় বা থিয়েটারের ব্যাকরণ আর তার অভিধান?

থিয়েটারে থাকেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, অর্থাৎ নাটকের সব কুশীলবেরা। তারা কথা বলেন, মঞ্চের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরা করেন, হাত-পা নেড়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে অভিনয় করেন। কিন্তু এই কুশীলবদের অঙ্গসঞ্চালনই যদি নাটকের মূল হয়, তবে নৃত্যবিদের মনে হতেই পারে যে তার শিল্পেরই 'বটতলা সংস্করণ হল থিয়েটার।'৩

এছাড়াও নাটকে আছে দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা, সঙ্গীতের ব্যবহার। নাটকের দৃশ্যসজ্জা দেখে থিয়েটারের সঙ্গে চিত্রকলার, এমনকি স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও নাড়ির যোগ অনুভূত হয়। আর আলোকসম্পাতে 'ভোলটেজ অ্যাম্পিয়ার-সার্কিট-ডিমার-স্টেপলেস আশ্রয় করে এসে পড়েছে নিছক বিজ্ঞান।'[৪] আর সঙ্গীতের মাধ্যমেও যেন আর একটি ললিতকলার আমদানি করা হয় থিয়েটারে। থিয়েটার তাই যেন বারোয়ারি। থিয়েটার যেন নানা শিল্পের সমন্বয়। প্রসঙ্গত কিছু প্রশ্ন সহজেই উঠে আসে। প্রাবন্ধিক উৎপল দত্ত লিখেছেন—

'কথা আর অঙ্গসঞ্চালনের সমন্বয় কি সম্ভব? দৃশ্যমান মঞ্চসজ্জা ও শ্রুতসংগীতের সমন্বয় কি সম্ভব? অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও রঙিন আলোর জাদু-একটা শুনছি, আর একটা দেখছি। এ দুয়ের সমন্বয় কি সম্ভব? এর জবাব যদি কেউ

না দিতে পারেন তবে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত থিয়েটারের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। সে এতগুলি শিল্পমাধ্যমকে গ্রহণ করেছে, মেলাতে পারে নি; চুরি করেছে, নিজের করে নিতে পারেনি; হজম করতে পারেনি। মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন একটিই। যা শুনছি আর যা দেখছিএ দুয়ের মিলন কি সম্ভব? এমন একটা ক্ষেত্র কি নেই যেখানে দৃশ্য ও সংগীত, নৃত্য ও কথা জাত না খুইয়ে একাসনে বসতে পারে?'

প্রসঙ্গত সংগীত ও চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ উৎপল দত্ত লেখেন দামোদর মালকোষের রূপ বর্ণনা করছেন আরক্তবর্ণো ধৃতরক্তযষ্টিঃ বীরঃ সুবীরেষু কৃতপ্রবীর্য্যঃ। মালকোষের রং লাল, হাতে রয়েছে রক্তবর্ণ যষ্টি। মালকোষের স্বরসমষ্টি থেকে একটা স্পষ্ট রঙের ঝিলিক খেলছে দামোদরের চোখে। রাগের ধ্যান-রূপটা কবিকল্পনা বলে ওড়াতে পারেন, রংটা পারেন না; তেমনিমধুমধ সারং কনকবর্ণা পীতবসনা। ভৈরবীও পীতবসনা। পণ্ডিত সোমনাথের চোখে বরাটি নীলাম্বরা। টোড়ি তুষারের মতো শুভ্র। বসন্ত নীলবর্ণ। বিলাবল শ্যামা। বামকেলি সোনালি। প্রায় প্রত্যেক রাগে প্রাচীন সংগীতরসিকরা আবিষ্কার করেছিলেন রং।

ইয়োরোপের পের কাস্তেল যে অকিউলার মিউজিকের তত্ত্ব দিয়েছিলেন তাও এই শব্দবর্ণ-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্‌ফনির প্রথম আলেগ্রো অংশ যে কালো আর নীল-এর সংমিশ্রণ, তাতে অনেক পণ্ডিতেরই আর কোনো সংশয় নেই। চাইকভস্কির লিটল রাশিয়ান সিম্‌ফনি প্রধানত হলুদের উপর আঁকা। বেঠোফোনের কোরাল সিম্‌ফনি উজ্জ্বল বেগুনি আর লালের আলোড়ন।

রেনে গীলেরে আধুনিক জ্যাজ (Jazz) সংগীত সম্বন্ধে বললেন—Il n'y a plus de perspective'—এ সংগীতে পার্স্পেকটিভ নেই ; দুরে-কাছে পারস্পরিক অনুপাত নেই। আধুনিক চিত্রকলায় বেন নিকসন অথবা জাঁ বাজেন-এর কাজের সঙ্গেই যেন তুলনা চলে Jazz-এর। এঁরা ছবি আঁকেন জ্যামিতিকে কেন্দ্র করে। সোজা সোজা রেখা টেনে গড়ে তোলেন অনেকগুলি এলোমেলো চতুর্ভুজ, ত্রিকোণ। উজ্জ্বল রং-এ ভরিয়ে দেন সেগুলো। মনে হয় আধুনিক সভ্যতার মানুষের ছন্নছাড়া জটিল মনস্তত্ত্ব এক লহমায় রূপ নিল সামনে। দূরে-কাছের কোনো তারতম্য নেই রাত্রে নিওন উদ্ভাসিত চৌরঙ্গির মতন দূরত্ব বা নিকটত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে; সবটা যেন একসঙ্গে খাড়া হয়ে এসে গেছে কাছে। জ্যাজ সংগীতের চমক লাগানো চিৎকারেও একই রূপরীতি আবিষ্কার করেছেন গীলেরে। মন্ত্র-সপ্তক আর তার সপ্তকের সব পার্থক্য ঘুচিয়ে, কাউন্টারপয়েন্টের নিয়মাবলি ভেঙে উড়িয়ে, যে-কোনো স্কেলে যে-কোনো স্বর ব্যবহার করে এক হৈ হৈ কাণ্ড সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিকলসনের স্টিল লাইফের মতোই কোথাও বাঁশির ফিকে সবুজ আর্তনাদ, কোথাও চেলোর কালো কালো ঝংকার, কোথাও ট্রাম্পেটের ক্যাটকেটে হলদে চিৎকার। সংগীত বাদ দিন-সামান্য স্বরবর্ণগুলির মধ্যেই র‍্যাঁবো খুঁজে পেয়েছেন এক একটা রং। তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের কবিরাও ভেবে দেখবেন অ বলতে একটা নিটোল শাদা পাওয়া যায় কিনা; আ বলতে এসে গেল একটু হলদে, একটু দুপুর রোদের ভাব। ই-র মধ্যে যেন গাঢ় রঙের আভাস পাচ্ছি; সবুজ নাকি ? উ আরো গাঢ়, প্রায় কালো। রঙিন সুর তো পাওয়া গেল। এবার সুরেলা রং পেলেই হয়।

রাজপুত রাগমালার ছবি বিচার করুন। ষোলো শতক থেকে হিন্দিতে রাগমালা কাব্য লেখা চলন হল। আর এইসব পুঁথিতে রাগরাগিণীর ছবি এঁকে দেখানো হল। ছবিগুলো যে সব সময়ে ভরতবর্ণিত রূপ রক্ষা করল তা নয়। উপরন্তু রাজপুত শিল্পী মনের আনন্দেই যেন এঁকে গেছেন ছবি। অথচ সে ছবির রেখায় রঙে, কোথায় যেন ধ্বনিত হচ্ছে সংগীত। গম্ভীর শিবমূর্তি ভৈরব রাগের চেহারা। শিবপূজায় মগ্না বধূ ভৈরবী। ব্রহ্মাপূজা খমবাবতী। ঝুলনের দৃশ্য হিন্দোল। এক নারী বীণা বাজাচ্ছেন, মুগ্ধ হরিণ এসেছে কাছেটোড়ি। মল্লযুদ্ধদেশাখ্য। হোলি আর নাচের উন্মাদনায় আনন্দ—বসন্ত। বর্ষায় কৃষ্ণের লীলা—মেঘ। এক নারী ময়ূরকে সংগীত শোনাচ্ছেন—গুর্জরী।

নায়ক পুষ্পধনু থেকে তীর ছুঁড়ছেন—বিভাস। শিল্পীর রং-রেখায় ফুটে উঠেছে এক-একটি রাগের আমেজ। হুইলার ছবির নাম দিলেন 'হার্মনি ইন গ্রীন'। ছবির কোনো প্রচলিত ধাঁচের বিষয়বস্তু নেই, নামেই বোঝা যাচ্ছে হুইলার সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—বলেছেন তাঁর ছবি আসলে সংগীত, সবুজ সংগীত। এমনি আরো নাম দিয়েছেন—নকতুর্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিলভা' (এবং সত্যি, ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকালে শোপ্যাঁর মধুর রাত্রি সংগীত মনে পড়বে) 'নকতুর্ন ইন ব্লু অ্যান্ড্ড গোল্ড', 'সিম্‌ফনি ইন হোয়াইট' (শেষোক্তটি কেন জানি না ব্রাহমস-এর দ্বিতীয় সিম্‌ফনি স্মরণ করিয়ে দেয়)।

গোগ্যা নিজের একটি ছবি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

'The musical element, harmonies of orange and blue woven together by yellows and violets, all lighted by greenish sparks.''

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোধগম্য যে রং আর সুরের মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বলে কিছু নেই। নাটকের কুশীলবরা এমনভাবে নড়াচড়া করবেন যাতে তা হয়ে উঠবে কথারই চিত্ররূপ; দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসজ্জা এমনভাবে করতে হবে যাতে তা কথা আর সংগীতকেই যেন প্রতিফলিত করবে চোখের উপর। আবার এমনভাবে কথা আর সংগীতকেও সাজানো সম্ভব যা সহজেই ধ্বনিত করে তুলবে দৃশ্যপটের সুরকে। এ মিলন সম্ভব হলে, থিয়েটারের নিজস্ব ভাষাসৃষ্টিও সম্ভব হবে বলে উৎপল দত্ত মনে করেন। নাহলে কথা, আঙ্গিক-অভিনয় ও দৃশ্য-সংগীতে যেন এক গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। আর নাহলে 'হয় কথা, নয় আঙ্গিক অভিনয়, নয় দৃশ্য, নয় সংগীতের আধিপত্য, অন্য সকলের আত্মসমর্পণ এবং অন্যের ধার-করা ভাষা নিয়ে থিয়েটারের চর্বিতচর্বণ।'

এক্ষেত্রে কিছু বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন প্রথম বাঁধা সাহসের অভাব। আমাদের ধারণা অভিনেতাই নাকি থিয়েটারের প্রধান ও একমাত্র হীরো। তাকে 'আলোকে ফোকাসে উদ্ভাসিত করাই আলোর কাজ। তাঁকে উজিয়ে দিতেই দৃশ্যসজ্জা। তাকে কেলাপ পাওয়াতেই নাট্যকারের কথা সাজানো। তাঁর প্রচণ্ড আবেগকে রূপ দিতে মাঝে মাঝে ঝাঁজ আর বেহালার শব্দ করাই সংগীতকারের কাজ।'[৭] কিন্তু মনে রাখা উচিত একজন অর্ধশিক্ষিত স্ফীতমস্তিষ্ক অভিনেতা একটা পুরো দলের সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারেন। একইরকম প্রবণতা দেখা যায় সংগীতকার, আলোকশিল্পী, দৃশ্যসজ্জাকরের মধ্যে। তারা কেউই সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন সামগ্রিক প্রয়োজনার সামনে। কিন্তু এসব মানবিক অসুস্থতার লক্ষণ। যদিও এসব কিছুকে সহজেই দমন করা সম্ভব। দ্বিতীয় বাঁধা হল তথাকথিত রিয়ালিজম বাস্তবতার বাঁধা। প্রাবন্ধিক মনে করেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হিলের ফোটো তোলার পর থেকেই রিয়্যালিজমএর দাপটে কাব্যছন্দ, সুর, রং, বিতাড়িত হয়েছে থিয়েটার থেকে, কেননা সবই নাকি হবে বাস্তব, বাস্তবানুগ। বাস্তবে যা ঘটে এ যেন তারই অনুকরণ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি তাকে আর্ট বলে? পুরো থিয়েটারটাকেই তো মেকি বলে মনে হয়, যার সামনে ঝুলতে থাকে যবনিকা আর মাঝে মাঝে আবার তা সবেগে পতিত হয়ে বাস্তব চিত্রটাকে খান খান করে দেয়। যেমন চটকদার বাস্তব ড্রয়িংরুমের দুপাশেই থাকে কালো কালো অবাস্তব উইংস আর যার ওপরে ঝুলছে সম্পূর্ণ অবাস্তব ঝালরের সার। অভিনেতাকে চট আর কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনে করতে হয় যে এটাই আসল ইটের ইমারত। তাই মনে হয় এটা কি বাস্তবতা, না বাস্তবতার ভান? আর কী করেই বা এই ভান আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে? আমার জানি মেকি ড্রয়িংরুমে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে তাকে খাঁটি বলে চালানোটা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। পুরো আধুনিক থিয়েটারই তাই যেন আজ এক চরম লজ্জায় ভুগছে। কৃত্রিমতা বেরিয়ে পড়ে আতঙ্কে সর্বদা গোপন রাখার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু উৎপল দত্ত মনে করেন এই কৃত্রিমতাই হবে থিয়েটারের ভিত্তি। শব্দকে রঙের পর্যায়ে, এবং রঙকে শব্দের পর্যায়ে তুলতে হবে। কথা কেবলমাত্র অর্থকে বোঝালে শুধু বাচ্যার্থে সীমিত থাকলে, তাতে রঙের ঝিলিক আসতে পারে না। তাই ভাষাকেও জীবনোত্তর করে তুলতে হবে। তাকে ধ্বনিত সৌন্দর্য্য দিতে হবে। আর আমরা জানি কথার মধ্যে রঙ আনতে গেলেই তাকে বাচিক অর্থ ছাড়িয়ে যেতে হবে। 'শব্দের মধ্যে তখনই বর্ণ আসে যখন সে শব্দ হয় ছন্দোবদ্ধ, যখন সে শব্দের থাকে সুর। যে সামান্য সুর নিত্যব্যবহার্য কথাবার্তায় থাকে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাকে আশ্রয় করলে নাটক ওই জীবনানুকরণেই আবদ্ধ থাকবে, জীবনোত্তর শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠবে না।

নাটক হবে শব্দবর্ণের সমন্বয় এবং জীবনানুগ। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। আর তাই এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে ছন্দে বাঁধতে হবে তাকে। নইলে সে হয়ে থাকবে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন চিত্র। প্রাবন্ধিক লিখেছেন—

'যামিনী রায়ের ছবি ফোটো নয়। ফোটো হলে সে আর্ট হত কি?'

ডসপাসোস-এর, জয়েস-এর উপন্যাস ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার দিনপঞ্জি নয়। কাম্যুর 'লেত্রঁজের' প্রবেশ করে গেছে নায়কের চিন্তারাশির মধ্যে, ব্যবহারিক জীবনে আটকা থাকে নি।

পিকাসো বা মাতিস কি জীবনবিমুখ? না, জীবনের বৃহত্তর সত্যের অন্বেষণেই তাঁরা ধাবিত? পশ্চিমের এক মহৎ শিল্পসৃষ্টি হল অপেরা। অপেরায় সংলাপ নেই, আছে গান। রূপসজ্জা উজ্জ্বল, রঙিন মানুষকে মনে হয় এক বৃহৎ ছবির অংশ। সেই ছবিরই আর-এক অংশ হল কাব্যকল্পনায় উদ্ভাসিত দৃশ্যসজ্জা। এ হেন রঙিন রূপকথার রাজ্যে কী রকম কাহিনি উপস্থিত হচ্ছে?

রিগোলেত্তো রাজসভার বিদূষক, কুঁজো, এনামেলকরা মুখে আবেগহীন নিশ্চল মৃত হাসি। লম্পট ডিউকের সব পাপের সে সহচর। অবশেষে একদিন ডিউকের আদেশে সে যে মেয়েটিকে হরণ করে আনে প্রাসাদে একটু দেরি করে জানতে পারে সে তার নিজেরই কন্যা। ক্রোধোন্মত্ত রিগোলেত্তো ডিউককে হত্যা করতে সংকল্প করে। কিন্তু এমনই গ্রহের ফেরযে-দেহটি বস্তায় বেঁধে সে বিজয়োল্লাসে যায় নদীতে নিক্ষেপ করতে, সে দেহটি তারই কন্যার। ভাড়াটে খুনি স্পারাফুচিলের চাতুর্যে নিহত হয়েছে রিগোলেত্তোরই কন্যা, ডিউক নয়। রচয়িতা ভেরদি, ভিক্তর উগোর 'ল্য রোয়া সামুজ' অনুসরণ করেছেন। কী নেই এতে? খুন, নারীহরণ, একাধিক প্রেমের উপন্যাস, নিয়তির অমোঘ হস্তক্ষেপ। তা বলে কি এ জীবনবিমুখ? নাকি অসংখ্য ঘটনা সংস্থাপিত করে রচয়িতা এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেনযে এতে জীবনকে অনুকরণ করার শিশুসুলভ প্রয়াস নেই, এ হচ্ছে উপকথার মতন ঘটনাড়ম্বরে সমৃদ্ধ। 'রিগোলেত্তো' যে কাহিনি এর জন্যে ভেরদি লজ্জা পান না; সদম্ভে তিনি বলেছেন-হ্যাঁ, এ কাহিনি। কাহিনি কাহিনি ই হবে। কাহিনি কে মুখ লুকিয়ে সত্য ঘটনার ছদ্মবেশ ধরতে হবে না।

'হ্যামলেট'-এ কী নেই? ভূত, ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, শোকজর্জরিত নায়কের প্রেম-প্রত্যাখ্যান, তলোয়ার খেলা মায় গুটি ছয়েক পতন ও মৃত্যু। তা হলে কি জীবনের সর্ববৃহৎ সত্যের অতি কাছাকাছি পৌঁছতে অপারগ হয়েছেন শেপিয়ার? সেই রূপনীতিই অনুসৃত হয়েছে উগো 'এরনানি'-তে, শিলার-এর 'ভিলহেল্‌মটেল'-এ, মলিয়েরের 'তার্তুফ'-এ।

আমরা দেখি শেষমেশ এই জীবনোত্তর সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা দেখা দিয়েছে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে, টি. এস. এলিয়ট, টলার, ব্রেশ্ট, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, শেরউড অ্যান্ডারসনের মধ্যে। আর বাংলা নাটকের মধ্যে দেখা যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' বা 'নরনারায়ণ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে আধুনিক সমাজব্যবস্থার নগ্ন চেহারার বাস্তববাদী রূপকে যথাযথভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের মত এই শিল্পাঙ্গিক সৃষ্টি করে নিয়েছে তার নিজস্ব ব্যাকরণ, তার ব্যঞ্জনা ও অলংকার। দর্শকচক্ষুকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্র মাধ্যম নির্ভয়ে বাস্তবতার খাতিরে নিজের বৈশিষ্ট্যকে চেপে রাখে না, কুণ্ঠাবোধও করে না। তাই এই মাধ্যমে দর্শকমনে চমক লাগে, তা যেন বৃহত্তর কিছুর আস্বাদ দেয়। তাই বলা চলে একমাত্র থিয়েটার ছাড়া আর সব শিল্পক্ষেত্রেই চলেছে তালগোল পাকানো জীবনকে ধরার প্রচেষ্টা।

বিশেষ করে আধুনিক জীবন এত বিচিত্র, এত সংঘাতপূর্ণ, এত বাঁকাচোরা, টুকরো টুকরো রূপে, যে এর প্রতিফলনকেও তেমনি জটিল হতে হবে। অতিসরলীকরণে তৃপ্ত হয় শুধু নির্বোধরা।

অনেক আগে যেখানে দেখা গিয়েছিল ইয়োরোপের চিত্রকররা যথাযথ প্রতিরূপ অঙ্কন করতেই ব্যস্ত ছিলেন, পরে তারাই এলোমেলো করে দিয়েছিলেন পার্সপেকটিভ। তখন তাই সমালোচনার ঝড় উথেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল আমরা যা দেখেছি তা আঁকছি না কেন? মাতিস তখন জবাব দিয়েছিলেন—'These apparent abstractions have only one end in view. to express the sentiment that the artist has of life.'

আর তখন মনোবিজ্ঞানী থুলেস দেখিয়েছিলেন মাতিসরা যা আঁকছেন সেটাই হচ্ছে বস্তুত আসল চেহারা, মানবচক্ষু সেটাই দেখে। তাকেই সর্বাঙ্গসুন্দর করে, পল্লবিত করে দেখাতেন প্রাচীনপন্থীরা। তাই অবাস্তব হচ্ছেন তারাই, আধুনিকরা কোনোমতেই নন—

'Some artists have departed very far from perspective drawing. I have found that certain of the post-impressionist painters drew inclined objects in ratios which were about those of the phenomenal shapes as measured in the experiments.'

পত্র : ডিএসই-৪০৪

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৪

অন্বয় বের্টোল্ট ব্রেশট অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বল্পায়ু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একালের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং ভিন্ন গোত্রের নাট্যব্যক্তিত্ব। বাংলা থিয়েটারে গণচেতনা নির্মাণের পরম্পরায় বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, পানু পালরা যে মাত্রা দিয়ে গিয়েছেন সেই গণভাবনা ও গণচেতনাকে একেবারে আঁকড়ে ধরে এবং নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিজের মতো পথ চলেছেন সারাজীবন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজিতেশের নাট্যভাবনা আমাদের সময়ে তো বটেই এমনকী আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু। গণনাট্য আন্দোলনকে কীভাবে বহুমাত্রা দান করা যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি নাটকেই পরতে পরতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যতদিন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের থিয়েটারে জড়িয়ে থাকবেন ততদিনই আমাদের থিয়েটারের চলার পথ সাবলীল ও গতিময় থাকবে। এটা সত্যি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পাকাপাকিভাবে আমাদের মধ্যে বিদেশী নাটককে দেশীয় করে উপস্থাপন করার পথ দেখিয়েছেন। গণনাট্যকর্মী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা কারণে এবং নানাবিধ গুণের জন্য আমাদের কাছে চিরকালের জন্যই আদরনীয়। ওঁর গণচেতনাধর্মী নাটক 'পাপ-পুণ্য', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'সওদাগরের নৌকো', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' আমাদের পথের দিশা।

আমাদের থিয়েটারের এমন একটা সময়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সে কালটা সত্যি এখন আমাদের কাছে বিশেষ গবেষণার উপাদান। তখন গণনাট্য সংঘের নাটকে উৎপল দত্ত, ঋত্বিক বা বিজন ভট্টাচার্য নেই। গণনাট্য আগের মতো তেমন সচলও নয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও একটা সময় গণনাট্য সংঘ থেকে বেড়িয়ে আসছেন। গণনাট্যের নিজস্ব শক্তি তখন কমে গেলেও চারপাশের নাট্যব্যক্তিত্বরা যাঁরা গণনাট্যর ফসল তাঁরা গণনাট্যর আদর্শকে সামনে রেখেই তাঁদের নিজস্ব নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গণনাট্যের প্রভাব গোটা বাংলার উপর ছড়িয়েছে। তখন গণনাট্যর ভাবনাকেই আমরা শহর গ্রাম মফঃস্বলে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে হাতিয়ার করছি যে যার নিজের মতো করে রাজনৈতিকভাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। গণনাট্যর জঠরে যে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের জন্ম, যার পুরোধা ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বল্পায়ু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা জীবনই গণভাবনাকে তাঁর নাট্যআন্দোলনে সবার আগে স্থান দিয়েছেন। যে বাতাবরণ এবং যে আবহাওয়ার মধ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বেড়ে উঠেছেন তাতে করে গণনাট্যর দর্শনকেই তিনি আঁকড়ে ধরবেন এটাই স্বাভাবিক। গণনাট্যকর্মী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু এইটুকু বললেই তাঁর সম্পর্কে সব বলা হয়ে যাবে না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটা মুহূর্তেই ভেবেছেন গণ-আন্দোলনকে আরো কীভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি নিজে কলম ধরছেন। মৌলিক নাটক আমাদের একের পর এক উপহার দিয়েছেন। সে সব নাটকের কথা আমরা সকলেই জানি। পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' অন্যধরণের এই নাটকটার কথা বেশী করে মনে পড়ে। তাছাড়া 'শুভবিবাহ',

‘শরতের মেঘ’, একাঙ্ক নাটক। এর পরেও তবু কোথায় যেন অজিতেশের অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে। তিনি বিদেশী নাটক থেকে সরাসরি বঙ্গীকরণ করেছেন বরং বলা যায় দেশীয় করে তুলেছেন। সে নাটক যেন আমার একেবারে আমার দেশের নাটক হয়ে যাচ্ছে। ‘তিন পয়সার পালা’, ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’, ‘ভালো মানুষ’, ‘শাহি সংবাদ’ বা ‘পাপপূণ্য’ নাটকগুলোর কথা মনে পড়ে। বিদেশী নাটককে দেশীয় করে তোলার ক্ষেত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা সত্যি সত্যি আমাদের বাংলা থিয়েটারের সাথে বিশ্ব থিয়েটারের একটা যোগসূত্র নির্মাণ করে দিয়েছে। বাংলাদেশে সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মর অনেক নাট্যকারই তাঁর দেখানো পথেই হেঁটেছেন। যার ফলে বলা যায় আমাদের দেশে এখন পাকাপাকিভাবে বিদেশী নাটক করার একটা চল তৈরি হয়ে গেল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবেই যে নাটকই করুন না কেন আমরা বলব সব ক্ষেত্রেই গণভাবনাকে সবার আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। নাটকগুলি বিশ্লেষিত হলে অন্তত তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

থিয়েটারের মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। একটা ছবিকে যখন বাঁধাই করা হয় তখন ছবিটিকে পিছনে রেখে যেমন তার চারদিকে ফ্রেম দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি মঞ্চের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। মঞ্চ বস্তুত ঘটনা বা সত্যকে বুঝতে সাহায্য করে, মঞ্চসজ্জার খাতিরেই ঘটনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেমন মঞ্চের উপরের আলো নেভাতে ও জ্বালাতেও হয়, ঠিক তেমনি যবনিকা ফেলতে ও তুলতেও হয়। এতে নাটক অনেকক্ষেত্রেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই কখনও কখনও আমাদের একইরকম মঞ্চসজ্জায় নাটক শুরু ও শেষ করতে হয়। কখনও বা কভার-ডিসকভার পদ্ধতিতে রোলারের সাহায্যে এক একটি দৃশ্যপট তুলে অন্য দৃশ্যপট দেওয়া হয়, অথবা মঞ্চকর্মীর সাহায্যে দু’পাশ থেকে দৃশ্যপট তুলে দেওয়া হয়, কখনও সিম্বলিক বা প্রতীকধর্মী মঞ্চসজ্জা ব্যবহার করা হয়, আবার রিয়ালিস্টিক বা বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জা ব্যবহার করাও হয়, এমনকি মঞ্চেও নানা স্তর ও সিঁড়ি তৈরি হয়। আর এসব করা হয় নাটকে বৈচিত্র্য আনার জন্য। আমরা জাণী শিল্প যেহেতু জীবনের প্রতিচ্ছবি, সেই হেতু জীবন যত জটিল হবে তার প্রকাশ অর্থাৎ শিল্পও তত জটিল হবে। সাধারণত নাটকের চরিত্র অনুযায়ী সেট-এর চরিত্র তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়। নাটকের মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকরকমের মঞ্চসজ্জা দেখতে পাই। যেমন—

ন্যাচারালিস্টিক বা স্বভাববাদী মঞ্চসজ্জা

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় নাটকের পক্ষে যদি একটি দরজা দরকার হয়, তাহলে একটি মঞ্চের উপরে একটা আস্ত দরজাই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এইভাবে পুরো ঘর তৈরি করে ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য সব জিনিসপত্র দিয়ে মঞ্চসজ্জা তৈরির ব্যাপারকে আমরা ন্যাচারালিস্টিক বা স্বভাববাদী মঞ্চসজ্জা বলতে পারি। দেখা যায় ন্যাচারালিস্টিক বা স্বভাববাদী সেট স্বাভাবিকতার অনুকরণ করে। স্তানিস্লাভস্কি এই ধরণের মঞ্চসজ্জার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাইতেন বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে মঞ্চে উপস্থিত করতে। তাঁর উপস্থিত চরিত্ররা মঞ্চে জীবনের নকল করত। স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজনায় মঞ্চে যা কিছু দেখানো হত, সবই ছিল বাস্তব, পরম্পরাযুক্ত এবং ব্যবহারিক দিক দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য। যারা যে চরিত্রে অভিনয় করবে, তাঁদের সেই চরিত্রের ভাবটি সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে এবং যত বেশি সম্ভব সেই ভাব দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে বলে স্তানিস্লাভস্কি বিশ্বাস করতেন। তিনি চাইতেন দর্শক যেন ভুলে যায় যে সে থিয়েটার দেখছে। সে যেন কেবলমাত্র থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

সুর-রিয়ালিস্টিক মঞ্চসজ্জা

যে মঞ্চসজ্জা বাস্তবধর্মী হয়েও অন্য কোনও গভীর বা ব্যাপক অর্থ বহন করে তাকে সুর-রিয়ালিস্টিক মঞ্চসজ্জা বলে।

এক্সপ্রেশনিস্টিক মঞ্চসজ্জা

এই ধরণের মঞ্চসজ্জায় এক্সপ্রেশন বা ভাব প্রকাশই বড় কথা, ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক ব্যাপারটা এখানে বড় নয়।

রিয়ালিস্টিক বা বাস্তববাদী মঞ্চসজ্জা

এইধরণের মঞ্চসজ্জায় স্বাভাবিকতার অনুকরণ করা হয় না। বস্তুত যে কোনও শিল্পই প্রচেষ্টা থাকে স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে সত্য খুঁজে পেতে চাওয়ার। তাই সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা হল সত্যের কাঁচামাল। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর সত্য পাওয়ার জন্য আরও জটিলতর শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। সচল চরিত্রগুলিকে দিয়েই নানান ছবি তৈরি করার কারণেই রবীন্দ্রনাথ নাটকে সেটের কোনও দরকার নেই বলে মনে করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সেট হল নিশ্চল, একেবারে প্রাণহীন, মৃত। তাঁর মতে সেট হল 'পশ্চিমী উপদ্রব', 'ছেলেমানুষী'। আমরা জানি দর্শকরা কখনোই শিশু নন, তাই নাটকের ক্ষেত্রে তাদের কল্পনাকে খেলতে দেওয়াই উচিত। এর যথার্থ উদাহরণ আমাদের যাত্রা। সেখানে দেখা যায় স্টেজের উপরেই একই জায়গায় একই দৃশ্যে জঙগল হচ্ছে, ঠিক পরের দৃশ্যেই সেই জঙ্গল কারাগারে রূপ নিচ্ছে। কিন্তু সেঘটনা ঘটলেও দর্শকদের কারোরই কিন্তু বিষয়টা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। উপরন্তু দেখা যাচ্ছে যে এক একজন দর্শক তাদের নিজের মতো করে জঙ্গল বা কারাগার কল্পনা করে নিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট দৃশ্যপট কল্পনার জন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা ঘটছে না। পশ্চিমি ধ্রুপদি নাটকের মতো আমাদের ধ্রুপদি নাটকে সেট ছিল না। এরপর সময়ের সাথে সাথে আমরা মঞ্চে জল ঢুকতে, ট্রেন, ট্রাম ঢুকতে, আগুন জ্বলতে দেখেছি। মঞ্চ কল্পনায় নতুন নতুন অভিনবত্ব এসেছে। কল্পনার যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

কিন্তু একসময় ইউরোপে স্বভাববাদী মঞ্চসজ্জায় দর্শকমনে নাভিশ্বাস ওঠায় স্বভাববাদী গুরুদের বিপরীতে বিদ্রোহী ব্রেশটের আবির্ভাব ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের ইউনিটি অব টাইম, প্লেস ও অ্যাকশনের কথাকে অস্বীকার করে ব্রেশট তাঁর এপিক থিয়েটার বা মহাকাব্যীয় থিয়েটারের ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। ব্রেশট স্তানিস্লাভস্কির স্বভাববাদী থিয়েটারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। ব্রেশট চাইতেন থিয়েটার দেখতে দেখতে দর্শক যেন কখনও নিজের অস্তিত্ব ভুলে না যায়, দর্শক যেন থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম না হয়। চরিত্র বা অভিনয়ের সময় যে ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে, তাতে দর্শকেরা কখনই যেন অভিভূত না হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোনোভাবেই দর্শক থিয়েটারের সঙ্গে যেন একাত্ম না হয়ে পড়ে। নাটকের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে দর্শককে নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন ব্রেশট। যদিও আমাদের সাধারণ ধারণা, থিয়েটারের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়াতেই থিয়েটারের আনন্দ। আর ব্রেশটের মতে জ্ঞান থেকে যে আনন্দের জন্ম, থিয়েটার কেবল সেই মহৎ আনন্দ দেওয়ার অধিকারী। যেমন মহাকাব্য পাঠে পাঠক কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম না হয়েও পূর্ণ আনন্দ পায়। ব্রেশট থিয়েটারের এই ধরনের নিরপেক্ষ ও

জ্ঞানদায়িনী আনন্দদানের পক্ষপাতী। ব্রেশট বলেছেন, 'তাঁর এপিক থিয়েটারের আগে কেউ এই আনন্দ দেয়নি, দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, থিয়েটার যে আনন্দ দিতে পারেএই উদ্দেশ্য সম্পর্কেই তাঁদের কোনও বোধ ছিল না। '

প্রসঙ্গত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

'যে চরিত্র এবং ঘটনাগুলিকে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, মহাকাব্য তার মূল থেকে শুরু করে বর্তমানে পৌঁছয় এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়, পূর্ববর্তী বা আধুনিক নাটককারেরা জীবন বা ঘটনার খণ্ডাংশ উপস্থাপনের সময় তার মূল ধরতে পারে না। মূল ধরার জন্য তাদের সমস্ত মানুষের ইতিহাস, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলিকে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল। ব্রেশটের মতে, এই অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারটির দৃষ্টিভঙ্গি মার্কবাদ ছাড়া আর কোনও দর্শন দিতে পারে না। এবং ব্রেশট নিজে প্রখরভাবে মার্কবাদী ছিলেন।'

দর্শককে সমালোচকে পরিণত চেয়েছিলেন ব্রেশট। তিনি মনে করতেন দর্শক যদি নাটকের কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে পক্ষপাতী হয়ে পড়ে, তাহলে তিনি ভালো সমালোচক কখনোই হতে পারবেন না। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে পক্ষপাতী হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কাজ করে আবেগ। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে তাহলে আবেগবর্জিত থিয়েটার কি সম্ভব? ব্রেশটের মতে সেটা সম্ভব। তিনি আবেগ ব্যবহারের পক্ষপাতী বিচারককে সজাগ করার জন্যই, শুধু আনন্দলাভের জন্য নয়। তাই তিনি সোজাসুজি বক্তার বলার পক্ষপাতী। আর সেজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁর নাটকে পোস্টার, মুখোশ, অত্যন্ত সাধারণ আসবাবপত্র, সাধারণ আবহসংগীত ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ছবি, গান, নাচ, কবিতা, গল্প, শব্দ, রূপসজ্জা, রং, আলো, অন্ধকার, পোস্টার, মুখোশ, আসবাবপত্র, স্লাইড, সিনেমা এবং দর্শক এই সবগুলিকেই থিয়েটার হজম করতে পারে। এই জন্যই থিয়েটার সভ্যতার মহত্তম, সজীবতম এবং জটিলতম শিল্প। ব্রেশট বলেছেন, 'থিয়েটার সেইসব বুদ্ধিমান লোকদের জন্য যাঁরা প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার আগে বাইরে নিজেদের কোটের সঙ্গে মস্তিষ্কটি ঝুলিয়ে আসেন না এবং সেইসব লোকেদের জন্য যাঁরা থিয়েটার দেখে কেবলমাত্র হৃদয় উদ্দীপ্ত করতে চান না।'

আমরা দেখি সম-সাময়িক জার্মানির অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রেশটের এই দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির শোচনীয় পরাজয়, অপমান ও নিগ্রহের পর সমস্ত জার্মান জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আত্মবিশ্লেষণের, যুক্তি ও বোধের। নিজের জাতির প্রতি অপরিমেয় মমত্ববোধ থেকেই ব্রেশটের বিপ্লবী মন তাঁর নিজস্ব মাধ্যম থিয়েটারে বিপ্লব সংগঠিত করে। ব্রেশট চেয়েছিলেন, থিয়েটার যেন সামাজিক সমালোচনার পীঠস্থান হয়।

ব্রেশটের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের সমালোচক-দর্শক তৈরি করা। দর্শকদের সামনে আবেগ প্রকাশ না করে যুক্তি উপস্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করতেন ব্রেশটের অভিনেতারা। এই পদ্ধতিতে অভিনয়ের জন্য ব্রেশট তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনটি বিষয় অভিনয় করতে বলেছেন—

১. নিজের কথাগুলিকে সব সময় তৃতীয় পুরুষের (থার্ড পার্সন) কথা বলে গ্রহণ করবেন।

২. সব সময় ঘটনাটিকে অতীতের বলে গ্রহণ করবেন।

৩. মঞ্চ নির্দেশগুলিকে চিৎকার করে পাঠ করবেন।

৪. আমরা যখনই মঞ্চে অভিনেতা হিসেবে কথা বলি, তখন এমনভাবে বলি যেন সেটি আমার নিজের কথা। ব্রেশট বলেছেন এমনভাবে বলতে হবে যেন এটি অন্যের কথা, অন্য লোক বলেছিল, কীরকমভাবে বলেছিল সেটা আমি অভিনয় করে দেখাচ্ছি।

৫. আমরা যখন অভিনেতা হিসেবে মঞ্চে কথা বলি, তখন এমনভাবে বলি যেন ঘটনাটি এই মুহূর্তে প্রথম ঘটেছে। ব্রেশট বলেছেন অভিনেতাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ঘটনা আগে ঘটে গেছে, সেটাই অভিনয় করে দেখাচ্ছি।

৬. আমরা যখন অভিনয় করি, তখন মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যাপারটা যথাসম্ভব বাস্তব জীবনের নকল করে করি। ব্রেশট বলেছেন, অভিনয় করতে গেলে মঞ্চে ঢুকতেই হবে এবং বেরতে হবে। ঢোকা বা বেরনো বাস্তবসম্মত এবং পারম্পর্যযুক্ত হওয়া আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ব্রেশটের মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, পোশাক, সংগীত, এমনকি পোস্টারের নকল সমস্ত ধারণাই উপরোক্ত অনন্বয় তৈরি করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 'থিয়েটার নিয়ে', দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন সম্পাদিত, 'অন্যকথা' পত্রিকা, 'প্রসঙ্গ রুদ্রপ্রসাদ', দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২২।

২. অশোক মুখোপাধ্যায়, 'প্রসঙ্গ নির্দেশনা', প্রয়াগ প্রকাশনী ,মে, ২০১৫।

৩. ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, 'নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১।

৪. উৎপল দত্ত, 'গদ্য সংগ্রহ', সম্পাদনা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, কে পি বাগচী অ্যান্ড কিম্পানী, জানুয়ারি, ১৯৯৮।

৫. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ', সম্পাদনা তন্দ্রা চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রথীন চক্রবর্তী, নাট্যচিন্তা, জানুয়ারি, ২০১৬।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'থিয়েটার এমন একটা অদ্ভুত চরিত্রের শিল্পকর্ম বা অদ্ভুত একটা মানবিক কাজ যা মানুষ আবিষ্কার করেছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক কী করে সেই কাজটা চালিয়ে যেতে হবে তা মানুষ এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। অর্থাৎ কাজের কড়ি জোগানোর কৌশলের কথা বলছি।'—ব্যাখ্যা কর।

২. থিয়েটারকে ব্যবসায়িক করবার পেছনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিমতগুলি আলোচনা কর।

৩. অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের চাইতে থিয়েটারের চলার পথ চরিত্রগত দিক থেকে কি সত্যিই আলাদা?—তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৪. বাংলা থিয়েটার নিয়ে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিমতগুলি—আলোচনা কর।

৫. থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ কর।

৬. একজন ভালো নির্দেশক হতে গেলে কোন কোন ধরণের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা উল্লেখ কর।

৭. নির্দেশকের প্রয়োজনীয়তার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা কর।

৮. নির্দেশকের দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলি আলোচনা কর।

৯. একটি নাটককে মঞ্চস্থ করতে গেলে নির্দেশককে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা পর্যায়-ক্রমিকভাবে—আলোচনা কর।

১০. যেকোনো একটি নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে নির্দেশকের ভুমিকাগুলি উল্লেখ কর।

১১. থিয়েটারের ভাষা বলতে কি বোঝ? থিয়েটারের আলাদা কোনো ভাষার প্রয়োজন আছে কী?—তোমার অভিমত ব্যাখ্যা কর।

১২. কবি, চিত্রকর, গায়কের প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের অভিমতগুলি আলোচনা কর।

১৩. থিয়েটারে ব্যবহৃত উপকরণগুলির সমন্বয় কিভাবে সম্ভব তা প্রাবন্ধিকের মতানুসারে—আলোচনা কর।

১৪. থিয়েটারের ভাষা সম্পর্কে উৎপল দত্তের মতগুলি সূত্রাকারে বিবৃত কর।

১৫. 'অন্বয় বের্টোল্ট ব্রেশট ' প্রবন্ধে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতগুলি—আলোচনা কর।

১৬. থিয়েটারের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মতগুলি সূত্রাকারে বিবৃত কর।

১৭. 'দর্শককে সমালোচকে পরিণত চেয়েছিলেন ব্রেশট'—উক্তিটির যথার্থতা উল্লেখ করে তোমার—মতামত ব্যক্ত কর।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-২

প্রসঙ্গ নির্দেশনা : অশোক মুখোপাধ্যায়

১৯৬০-এ অশোক মুখোপাধ্যায় নান্দীকারে যোগদান করেন। নাট্যশিক্ষক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায়ের প্রেরণায় তাঁর নাটক রচনা ও অভিনয়ে শিক্ষানবীশি। ১৯৬৬-তে চোদ্দজন বন্ধু ও সহকর্মীসহ নান্দীকার ত্যাগ করে তিনি থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যসংস্থা গঠন করেন। বর্তমানে সেই সংস্থার তিনিই প্রধান পুরুষ। আধুনিক বাংলা থিয়েটারে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের বিকাশ ঘটেছে 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার', 'গালিলেওর জীবন', 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে', 'বিসর্জন', 'বেড়া', 'সদাগরের নৌকো', 'পালিয়ে বেড়ায়', 'অন্ধযুগের মানুষ', 'কাশ্মীর প্রিন্সেস', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'মাটির গভীরে', 'চিরকুমার সভা', 'পোকা', 'বিয়ে-গাউনি কাঁদনচাপা' প্রমুখ বহু নাটকে। তাঁর নির্দেশনার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'বেলা অবেলার গল্প', 'আলিবাবা', 'বেড়া', 'একা এবং একা', 'পোকা', 'ম্যাকবেথ', 'অন্ধযুগের মানুষ', 'মাটির গভীরে' ইত্যাদি বহু থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নাটক 'দুঃসময়' বা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর নির্দেশনার গুণে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সন্দীপ রায় প্রমুখ বরেণ্য চলচিত্র স্রষ্টাদের ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, এমনকি তিনি অভিনয় করেছেন বহু দূরদর্শন নাটক ও ধারানাট্যে।

নাটক রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তরেও বহু উচ্চমানের সৃষ্টি এসেছে তাঁর কলম থেকে। নাট্যপ্রশিক্ষক হিসাবে তিনি অর্জন করেছেন বিরল সিদ্ধি ও খ্যাতি। থিয়েটার বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলিও আজ নাটকের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য তালিকায়। থিয়েটারের কাজে ভারতের সমস্ত নাট্যকেন্দ্রে এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও-বাংলাদেশের বহু শহরে গেছেন অশোক মুখোপাধ্যায়। পেয়েছেন বহু পুরস্কার যার মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রযোজনা, নির্দেশনা অভিনয়ের জন্য একাধিক বছরের সম্মাননা, শিরোমণি পুরস্কার, নান্দীকার সম্মান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বিশেষ সম্মান, সারা পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও নাট্যকেন্দ্র থেকে আমন্ত্রণ ও সম্মান। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ও রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়-এর নানা পদ অলংকৃত করেছেন তিনি বিভিন্ন সময়ে। তবু আজও অক্লান্ত তিনি, এখনও সৃজনশীল, এখনও নতুন দিগন্ত ছোঁওয়ার উত্তেজনায় ভরপুর।

অশোক মুখোপাধ্যায় বড়ো মাপের পরিচালকের সান্নিধ্যে এসে তাদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কুড়ি থেকে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত যৌবনের গোগ্রাসী চোখ ও মন নিয়ে তিনি তীব্রভাবে দেখেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যসৃষ্টি পদ্ধতি। তার বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং বন্ধুর দরদ নিয়ে দেখেছিলেন বিভাস চক্রবর্তীর সৃষ্টিকর্ম। এমনকি বিখ্যাত জার্মান নির্দেশক ও ব্রেখট-শিষ্য ফ্রিৎস বেনেভিৎস-এর পরিচালনায় একটি বড়ো চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন তিনি। সেই প্রযোজনায় যুগস্রষ্টা অভিনেতা শম্ভু মিত্রর সঙ্গে অভিজ্ঞ ধীমান পরিচালক বেনেভিৎস-এর শৈল্পিক লেনদেন দেখতে দেখতে নির্দেশক-অভিনেতার সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর ধারণা পাকাপোক্ত হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকবিভাগে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা তাঁকে নাটক থেকে নাট্য হয়ে

ওঠার প্রযোজনা পদ্ধতি সম্পর্কে ভাবতে শেখায়। সঙ্গে তিনি পেয়ে যান তাঁর অনেক সহযোগীকে যাঁরা সকলেই স্বক্ষেত্রে কৃতি। সবার ভাবনা-চিন্তার বিনিময় ঘটাতে গিয়েও বহু বিষয়, প্রসঙ্গ, সমস্যার অনালোকিত অর্ধালোকিত প্রদেশে আলো গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ কাটা-ছেঁড়া করে ডাক্তারি ছাত্র যেমন মানব দেহের জটিল বাস্তব বোঝার পাঠ নেয়, তেমনি করে তাদেরও হাতড়াতে হয়েছে অনেক পথ, খুঁজতে হয়েছে পদ্ধতি। এইসব করতে গিয়ে প্রযোজনার পদ্ধতি বিষয়ে তত্ত্বগত ধারণাকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি তাঁর নাট্যপ্রযোজনার ধারণা গড়তে পেরেছিলেন তাঁর হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে। তাই তিনি গভীরভাবে ঋণী তাঁর নাট্যদল থিয়েটার ওয়ার্কশপের বন্ধুদের প্রতি। তাঁরা তাঁকে নির্দেশকের কাজে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কোন নাটক তারা করবে সেটা তারা সবাই মিলে ঠিক করলেও কীভাবে সেটা করবে তা নিয়ে অশোক মুখপাধ্যায়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অঢেল সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন। নির্দেশক হিসেবে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা তাঁরা ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁকে সমর্থন ভরসা অর্থ ও সংগঠন জুগিয়েছেন। আর তাই তিনি বিদেশি নাটকের রূপান্তর বা সরাসরি অনুবাদভিত্তিক প্রযোজনাও যেমন করতে পেরেছেন, ঠিক তেমনি সমকালের শ্রেষ্ঠ নাটককারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক রচনা নিয়েও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

নির্দেশকের গুণাবলী

নাটককার নাটক লেখেন। আর সেই নাটককে মঞ্চে এনে হাজির করেন একদল কুশীলব তাদের পরিশ্রমসাধ্য অভিনয়ের দ্বারা। এর পেছনেও একাধিক মানুষের পরিশ্রম কাজ করে। মঞ্চাধ্যক্ষ, ম্যানেজার, মঞ্চনির্মাতা, নির্দেশক, সুরকার, আবহশিল্পী, আলো প্রক্ষেপকের যৌথ প্রয়াসেই একটি নাটককে সুন্দরভাবে মঞ্চে দর্শকদের সামনে মঞ্চস্থ করা হয়। এটি তাই দুরূহ কাজ। যেমন-তেমন নাটকের যেমন-তেমন এক ধরনের মঞ্চায়ন করে দেওয়া যায় এবং অনেকক্ষেত্রে করে দেওয়াও হয়। কিন্তু এই ধরনের কাজকে নাট্যশিল্প বলে বিবেচনা করা যায় না।

একটা ভালো নাটককে মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে উপভোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অনেক কিছু প্রয়োজনীয়। সে যেন এক নাট্যযজ্ঞ। সেই সৃষ্টিযজ্ঞের পুরোহিত হলেন নাটকের নাট্যনির্দেশক। একজন ভালো নাট্যনির্দেশকের কিছু গুণাবলী থাকা অবশ্যই জরুরি। যেমন—

১. একজন নাট্যপরিচালকের মধ্যে বুদ্ধি, মেধা, জ্ঞান, কল্পনাশক্তি, শিল্পবোধ, রসবোধ, অন্য শিল্পমাধ্যম বিষয়ে অবহিতি এই রকম বহু গুণের সমন্বয় ঘটা দরকার।

২. এমনকি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই অভিনয়, মঞ্চ, আলো, সংগীত, পোশাক, রূপসজ্জা প্রভৃতি নাট্যশিল্পের নানা প্রদেশ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান ও দখল।

৩. সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প বা চলচ্চিত্র-সৃজনের মতো ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর একটা স্পষ্ট ধারণা ও অনুভব থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪. নির্দেশকের নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা, বন্ধুত্ব-স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতা, সহকর্মীর জন্য ভালোবাসা এবং যৌথসৃষ্টি বিষয়ে সত্যিকারের শ্রদ্ধা থাকাও দরকার।

৫. অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে নির্দেশকের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। নির্দেশক একাধারে শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক এবং নেতা। নানাবিধ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নির্দেশককে হতে হয় বুদ্ধিমান, হৃদয়বান ও আত্মবিশ্বাসী।

৬. নাটক যেহেতু যৌথ শিল্প, তাই নাটকের আলোক, সঙ্গীত, মঞ্চ, পোষাক যারা তৈরি করছেন সেই কৃতী মানুষদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিলে- মিশে নির্দেশককে নাট্যশিল্পের সমন্বিত রূপ তৈরি করতে হয়। তাই একে অপরের কাজের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা খুব প্রয়োজন। নির্দেশকের যদি নিজের গন্তব্য বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট থাকে, তবে তিনি সকল পথিককে নিয়ে নিজের গতিতে ও ছন্দে পথ চলতে সমর্থ হবেন সাফল্যের সঙ্গেই।

৭. নির্দেশক শুধু কো-অর্ডিনেটর নয়, তিনি 'ক্রিয়েটার'ও, তিনি নতুন অভিজ্ঞতার স্রষ্টা। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, মূকাভিনয়, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, বাচিক শিল্প, মানব শরীরের বিভঙ্গ সব মিলে মিশে এক অনন্য আবেদন তৈরি হয় মঞ্চ প্রযোজনায়। সব মিলে এক স্বতন্ত্র দৃশ্যশ্রাব্য চাক্ষুষ করা যায়। নির্দেশক তার কাজের মধ্যে নাট্যের নিজস্ব ভাষার অনুসন্ধানে মগ্ন হয়ে যান। তার সৃষ্টির মধ্যে তখন মহৎ এক মাত্রা যোগ হয়।

এইসব গুণাবলী থাকলেই একজন নাট্যপরিচালক সত্যিকারের ভালো নাট্যপরিচালক হতে পারেন।

নির্দেশকের প্রয়োজনীয়তা : ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলা নাট্যমঞ্চায়নের প্রাথমিক কালে দেখা যায় নাট্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, মঞ্চস্থ নাট্য বিষয়ের আলোচনার জন্য, মহলা নিয়মিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নজরদারির জন্য, যার সিন এঁকে দেওয়ার কথা সে আঁকল কি না সে বিষয়ে তদারকির জন্য, যার পোশাক তৈরি করে এনে দেওয়ার কথা সে সঠিকভাবে তার কাজ করছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণের জন্য, নাটকের সেট-সেটিংস ঠিক হচ্ছে কিনা সেসব দেখাশুনো করার জন্য একজন 'ম্যানেজার'' জাতীয় লোকের প্রয়োজন ছিল এবং তখনকার সময়ে প্রধান অভিনেতারাই সেই দায়িত্ব পালন করতেন। বলতে গেলে 'অ্যাক্টর-ম্যানেজার'-দের যুগ ছিল সেটা। কিন্তু নির্দেশকের আবির্ভাব তখনও আমাদের দেশে ঘটেনি। প্রায় পনে দু'শো বছর আগেও ইয়োরোপে বা একশো পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশেও 'ডিরেক্টর' বলে কিছু ছিল না থিয়েটারে। মূল বিষয় ছিল নাটককারের লেখা নাটক নির্বাচন করে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মহলা দিয়ে সুচারুরূপে সেই নাটক দর্শকদের সামনে মঞ্চস্থ করা এবং দর্শকদের সেই নাটক দেখার ব্যাবস্থা করে দেওয়া। এর মধ্যে নির্দেশকের গুরুত্ব তখনও অনুভূত হয়নি। কিন্তু তখনকার থিয়েটারে 'ম্যানেজার' খুবই সক্রিয় ছিল। যেমন-'স্টেজ ম্যানেজার'—যিনি অভিনয়ের সময় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতেন, 'প্রোডাকশন ম্যানেজার'-তিনি প্রযোজনার কাজকর্ম দেখেতেন। চলচ্চিত্রে 'প্রোডাকশন কন্টোলার'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এখন 'ম্যানেজার'-এরই পরিবর্তিত আধুনিকায়িত সংস্করণ রূপে আমরা পাই 'এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর'কে। নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একটা সময় ছিল যখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পাদপ্রদীপের সামনে সোচ্চারে আবৃত্তিধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্য বিষয়ের উপস্থাপনা করতেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আমরা যখন আধুনিক মঞ্চ পেলাম, তখন থিয়েটার প্রকাশের ভাষাই আমূল বদলে গেল। প্রাকৃতিক আলোর বদলে কৃত্রিম আলো ব্যবহৃত হওয়ায় বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় সম্ভব হল। মঞ্চের যে-কোনো অংশকে যে-ভাবে ইচ্ছা আলোয় বা অন্ধকারে রাখতে পারা সম্ভব হল। ফলত দর্শকের দেখাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেল। এমনকি চারদিক ঘেরা প্রেক্ষাগৃহে উচ্চারিত সংলাপ শোনাতে অভিনেতৃবর্গকে প্রাণান্ত চিৎকার আর করতে হল না। অর্থাৎ থিয়েটারের ভাষায় পাল্টে গেল। এই থিয়েটারের ভাষা বলতে বোঝানো হয়, 'নাটক ও প্রযোজনার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা নতুন যে অভিজ্ঞতা তারই

প্রকাশনা-ভঙ্গি’। আর থিয়েটারের নিজস্ব ভাষা আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার পর থেকেই নাট্য উপস্থাপনায় নির্দেশকের স্বতন্ত্র ভূমিকা চিহ্নিত হতে শুরু করল।

উনিশ শতকের শেষদিকে চারদিক ঘেরা বদ্ধ মঞ্চে নাট্যপ্রয়োগের বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটল। আর এর অগ্রপুরুষ হিসেবে গন্য করা যায় রাশিয়ার সর্বজনবিদিত কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি (১৮৬৫-১৯৩৮) সুইজারল্যান্ডের অ্যাডল্ফ আপ্পিয়া (১৮৬২-১৯২৮) এবং ইংল্যান্ডের গর্ডন ক্রেগকে (১৮৭২-১৯৬৬)। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আধুনিক ইয়োরোপীয় থিয়েটারের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয় উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যেই। আমাদের দেশের নাট্যবিকাশে তাঁদের গুরুত্বও সমধিক। কিন্তু উপরে উল্লিখিত তিনজন নাট্যনির্মাতা ও নাট্যচিন্তকই শুধু নয়, এরও পূর্বে ১৮৭৪-এ প্রতিষ্ঠিত ‘মেইনিংগেন প্লেয়ার্স’ (Meiningen Players)-দের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। আমরা জানি তৎকালীন অস্ট্রিয়ার প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য স্যাক্স-মেইনিংগেন-এর ডিউক (Duke of Saxe-Meiningen) এই দল তৈরি করেছিলেন। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযোজনায় প্রথম যূথবদ্ধ অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হয় এবং তখন থেকেই নাট্যঅভিজ্ঞতা নির্মাণে একজন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। নাট্যপোস্থাপনার ক্ষেত্রে আলো, দৃশ্যপট ও পোশাক পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয় অনুভূত হতে শুরু করে। সময় ও স্থান বিবেচনায় প্রযোজনার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও ভাবা শুরু হয়। এমনকি জনতা-দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মঞ্চে স্থাপনা ও চালনার কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। ১৮৭৪ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে ইয়োরোপের বহু দেশের বহু শহরে ডিউকের দল দাপটের সঙ্গে অভিনয় প্রদর্শন করে যায়। আর তাঁর এই থিয়েটার পরিচালনার দক্ষতা ও সংগঠন পরিচালনার কাজ দেখে উদ্বুদ্ধ হন তৎকালীন ইউরোপের বহু সৃজনশীল নাট্যকর্মী।

১৮৯৫-এ বিশ্বনাট্যে নবযুগের প্রবর্তন করলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের স্রষ্টা স্তানিস্লাভস্কি। তৎকালীন রাশিয়ার প্রচলিত চিৎকারসুলভ সুরেলা অভিনয় পদ্ধতিকে তিনি বর্জন করলেন। তিনি জোর দিলেন মনস্তত্ত্ব-নির্ভর বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র নির্মাণে। নব্য অভিনয়রীতি প্রবর্তন করলেন তিনি। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালেন। মনস্তত্ত্ব-সম্বদ্ধ অভিনয়রীতির ব্যবহারে, মঞ্চসজ্জার নতুনত্বে, নাটকের নিজস্ব ব্যাখ্যায়, আলো ও সংগীতের যথাযথ ব্যবহারে নিজস্ব নাট্যভাষা তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রেখট-ও নিয়ে আসেন নতুন রীতি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে স্তানিস্লাভস্কি-র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই আজকের থিয়েটারে নির্দেশকের বিশাল সর্বগ্রাসী ভূমিকা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছিল।

আবার দেখা যায় আধুনিক থিয়েটারের যে-ধারা বাস্তবকে ভেঙেচুরে পরাবাস্তবকে ধরতে চেয়েছে পরবর্তী সময়ে, সুইসনির্দেশক ও নাট্যতাত্ত্বিক আপ্পিয়া যেন সেই ধারারই পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি সারাজীবন নিরত ছিলেন প্রতীকী বাস্তবাতিশয়ী একটি নাট্যভঙ্গির অনুসন্ধানে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মঞ্চ-পরিকল্পক। মঞ্চভাবনায় বহু বৈপ্লবিক কাজকে উনি বাস্তবায়িত করেন। যেমন আলোর চেয়ে ছায়ার ব্যবহার বেশি করে মঞ্চে তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন জীবনোত্তর রহস্যময়তা, এমনকি সংগীত ও নৃত্যভঙ্গির ব্যবহারে নাট্যাভিনয়কে তিনি দিতে চেয়েছিলেন ভিন্নতর মাত্রা।

গর্ডন ক্রেগ ১৯১১-য় প্রকাশিত ‘অনদি আর্ট অফ থিয়েটার’ নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর নাট্যভাবনা প্রকাশ করেন। সংলাপের থেকে নৃত্য ও মূকাভিনয়ের ভুমিকাকে তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। বাস্তবপন্থী প্রযোজনার বদলে আলো, রং ও ভঙ্গির সমন্বয়ে গড়ে তোলা অন্য এক থিয়েটারের কথা বলেছেন। অভিনেতৃবর্গ সেখানে সামগ্রিক ছকের একটি অংশমাত্র। তাদের সবকিছুই যেন নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দেশকের ভাবনা-সংকেত পৌঁছোবার

কাজে। অর্থাৎ থিয়েটার মানে বোঝায় নির্দেশকের থিয়েটার। থিয়েটার পরিচালনায় নির্দেশকেরই যেন একমাত্র সর্বগ্রাসী ভূমিকা।

বিদেশী থিয়েটারে ১৮৭৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে যখন বিকশিত হচ্ছে নির্দেশকের ভূমিকা তখন আমাদের দেশে নজর ফেরালে দেখা যায় এখানেও বহু প্রতিভাধর নট-নটীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অভিনয়-ঐতিহ্য। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমণি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফি, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী দাসী, সুকুমারী দত্ত, চুনীলাল দেব, অমরেন্দ্র দত্ত, তারাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তাঁদের অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন। যদিও চরিত্রানুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার বা বিষয়ানুযায়ী মঞ্চসজ্জা তৈরি করতে তাঁরা অপারগ ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয়ে (ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া) কিছুটা চমক সৃষ্টি করতে পারলেও থিয়েটারের সামগ্রিক মানের বিকাশ বা থিয়েটারের ভাষা আবিষ্কারও যে তখনও ঘটেনি তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে প্রভূত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই পুষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের প্রথম যুগের বাংলা থিয়েটার। গিরিশচন্দ্রের হাত ধরেই ভদ্র-শিক্ষিত বাঙালির জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিল এই থিয়েটার। দর্শকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠিক তেমনি নাট্য উপস্থাপনার জন্য স্থাপিত হয়েছিল নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ, নাটকের খবর প্রকাশের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল নাটকের পত্র-পত্রিকা, মঞ্চ হয়ে উঠতে পেরেছিল মত প্রকাশের একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এমনকি থিয়েটারকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতিফলনে কাজে লাগানো হয়েছিল। ১৯২০-র দশকে এই প্রস্তুতির পটভূমিতে গিরিশের প্রজ্জ্বলিত মশাল থেকেই আলো নিয়ে পথ খুঁজে পেলেন নবযুগের ঋত্বিক শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমারের খ্যাতি যেমন বিস্তৃত হয়েছিল দেশে-বিদেশে, ঠিক তেমনি নির্দেশকের ভূমিকায় তাঁর বিশাল ও তাৎপর্যময় সাফল্যকেও আমরা পর্যবেক্ষণ করি। শম্ভু মিত্র যথার্থই লিখেছেন—'আমার অনুমানে, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম নির্দেশক যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো, দৃশ্যপট, অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এই দেশে এনেছিলেন।' বিদেশ ও স্বদেশের এই পটভূমি স্মরণে রাখলে বুঝতে সুবিধা হবে যে রচিত নাটক বা তার দলগত অভিনয়ের থেকে নির্দেশকের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

নির্দেশকের দায়িত্ব

নাটককারের লেখা নাটক বাছাইয়ের পর, প্রযোজিতব্য নাটকটা ভালো করে পড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নির্দেশকের কাজ শুরু হয়। তারপর ধাপে-ধাপে তার রূপান্তর প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। সেই ধাপগুলি নিয়েই এখন আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে-

ক. নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণ

নির্দেশকের প্রথম কাজ হচ্ছে যে নাটকটিকে তিনি অভিনয় করবেন বলে বেছে নিয়েছেন সেই নাটকটিকে বারবার খুঁটিয়ে ভালো করে পড়া। নির্দেশক একা পাঠক হিসেবে যেমন নাটকটি পাঠ করবেন, ঠিক তেমনি তিনি নাটকটির পাঠেরও আয়োজন করবেন, কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রী কলাকুশলীদের শোনাবার প্রয়োজনও আছে। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ আলোচনা ও বিশ্লেষণও চলতে থাকে। প্রাথমিক স্তরে নাটক-বিষয়ে আলোচনা নাট্যসাহিত্যের আলোচনার পথ ধরেই চলে। নাটক যখন শুধু পাঠের বস্তু, তখন যেমন করে পঠিত নাটকের গুণাগুণ

বিচার করা হয়, ঠিক সেভাবেই বিচার বিশ্লেষণ চলতে থাকে। একই সঙ্গে নির্দেশকও নব নব বিচার বিশ্লেষণে নাটকটি প্রযোজনার খসড়া নিজেই তৈরি করতে থাকেন। প্রাথমিক পাঠে নাটকের যে বিষয় বা প্রসঙ্গগুলি গুরুত্ব পায় সেগুলি হল-

১. নাটকের কাহিনি (Story) ও কাহিনি-বিন্যাস/কাঠামো (Plot/Structure)

২. নাটকের চরিত্র (Character)

৩. নাটকের সংলাপ (Dialogue)

৪. নাটকের বিষয় (Theme) ও বক্তব্য (Message)

১. নাটকের কাহিনি ও কাহিনি-বিন্যাস (Story & Plot)

নাটকে যে গল্প বলা হচ্ছে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি আবার গল্পটা যেভাবে বলা হচ্ছে, যেভাবে সাজানো হচ্ছে সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গল্পের কাহিনি ও কাহিনি-বিন্যাস ঠিক না হলে সেই নাটক পাঠক বা দর্শকের মনোযোগ কখনও আকর্ষণ করতে পারবে না। দুটো উপকরণই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেকসময়ই দেখা গেছে নাটকের গল্পটা চমৎকার, কিন্তু মোক্ষমভাবে বলা হয়নি বলে ভালো গল্পটাও মাঠে মারা গেছে, দর্শকদের কাছে সেটা আকর্ষণীয় হতে পারেনি। আবার অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে কাহিনি দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ, অথচ বিন্যাসের গুণে সেই কাহিনি দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের তাই দুটোই প্রয়োজনীয়-ভালো গল্প এবং সেই গল্পের কুশলী বিন্যাস, অর্থাৎ কাহিনি র জোর এবং কাঠামোর পরিকল্পনায় নাটক তার নির্দিষ্ট তুঙ্গবিন্দু যাতে স্পর্শ করতে পারে সেবিষয়েই আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। সুতরাং প্রাথমিক পাঠের মূল লক্ষ্য হল গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া এবং নাট্য কাঠামোর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা।

২. নাটকের চরিত্র (Character)

নাট্য চরিত্র পাঠকের আকর্ষণের প্রধানতম ক্ষেত্র। বিখ্যাত নাট্যকারদের কথা উঠলেই প্রথমেই তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত মানুষ হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। মূল পাঠের বাইরেও তারা যেন আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ। নাটকপাঠের সময়ও তাই সর্বদা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয় নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের আকর্ষনীয়, জীবন্ত, বিশ্বাসযোগ্য লাগছে কিনা। নাটকের চরিত্রকে বুঝতে হলে আমাদের কিছু বিষয়ে নজর দিতে হয়। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"সার্থক চরিত্রসৃষ্টির মূল কথা হচ্ছে, ক) চরিত্রটির বাইরের রূপ ও অন্তরের রূপ যুগপৎ ধরা পড়া চাই; খ) চরিত্রটিতে একাধিক মাত্রা আছে কিনা, সেটি বহুমাত্রিক কিনা; গ) চরিত্রটিতে দ্বন্দ্ব আছে কিনাঘটনা ও অন্যচরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা; ঘ) যদি দ্বন্দ্ব থাকে, তবে চরিত্রটি পাল্টাবেও, যেমন জীবনেও মানুষ পাল্টায় পরিস্থিতির চাপে, অন্য মানুষের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায়; এই পরিবর্তনশীলতা জীবনেরই লক্ষণ; চরিত্রটিতে এই বদল ঘটছে কিনা; ঙ) যত বড় মাপের চরিত্র হবে ততই দ্বন্দ্বের চরিত্রও বড় হবে এবং চারপাশের সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে দ্বন্দ্বও তখন চরিত্রকে উন্নততর মাত্রা দেবে; তবে খুব উন্নত স্তরের নাটক ছাড়া এত বড় দ্বন্দ্ব চরিত্রের মধ্যে না-ও থাকতে পারে।"

নাটকের চরিত্রে এইসব লক্ষণ দেখা গেলে নাটকের চরিত্রচিত্রণ বিশ্বাসযোগ্য ও স্মরণীয় হয়ে উঠবে। আমরা দেখি নাটকে সাধারণত স্টিরিওটাইপ চরিত্রের ভিড়। যেমন বেকার রিকশাওয়ালা, প্রতিহিংসা পরায়ণ খলনায়ক বা

খলনায়িকা, সৎ নায়ক, স্নেহপরায়ণ পিতা, দুঃখিনী জননী ইত্যাদি। জীবন থেকে উঠে আসা বিশ্বাসযোগ্য দ্বন্দ্বময় পরিবর্তনশীল চরিত্র খুব কমই থাকে। মনে রাখতে হবে স্টিরিওটাইপ চরিত্রের সমাবেশে হয়তো প্রমোদ-মূলক উদ্দেশ্য সার্থক হয়, কিন্তু সার্থক শিল্প সৃষ্টি হয় না। তাই আমাদের খুঁজতেই হয় সার্থক শিল্পের অভিজ্ঞান।

৩. নাটকের সংলাপ (Dialogue)

নাটক সংলাপ-নির্ভর, বলা ভালো নাটকের মূল অবলম্বন সংলাপ। চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তার উন্মোচন এবং কাহিনি র বিন্যাস সংলাপের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে। সংলাপের শক্তি বা দুর্বলতাই নাটকের সাফল্য-অসাফল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাটকে সংলাপ ব্যবহারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়-

ক) সংলাপ বিষয় ও চরিত্রানুগ হওয়া প্রয়োজনীয়। সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রগুলি তাদের নিজস্বতা নিয়ে হাজির হয়। একথা তো ঠিকই যে—'কোন মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান, মানসিক গঠন, দেশ-জীবিকা, বয়স, অন্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক সবই তার কথার ধরণে ধরা পড়বেই। নাটকেও সেটা হওয়া খুব জরুরি।'৩

খ) নাটকের সংলাপকে হতে হবে স্পষ্ট ও পরিমিত। নাটকের সংলাপকে দর্শকদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাতে হবে।

গ) সহজ সংলাপ যেমন সহজেই মর্মমূলে বিদ্ধ হয়, ঠিক তেমনি বহুস্তরিক এমনকি কাব্যগুণান্বিত সংলাপও মর্মভেদী হতে পারে। এই ভেদশক্তি নাটকের সংলাপের প্রধান জোর।

ঘ) বিশ্ব-নাট্য ও বাংলা নাটকের ইতিহাসের দিকে নজর ফেরালেই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা সকলেই রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। থিয়েটারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই অথচ দারুণ নাটক লিখেছেন, এর দৃষ্টান্ত খুবই কম। মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আজকের বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনোজ মিত্র সকলের সঙ্গেই ছিল থিয়েটারের যোগ। আর তাই দেখি তাঁরা যখন নাটক লেখেন তখন তাঁদের নাট্যসংলাপে উঠে আসে তাঁদের সেই সেই অভিজ্ঞতার অনিবার্য আঁচ। তাঁরা চরিত্রোচিত, পরিমিত, ভেদশক্তিসম্পন্ন এবং স্মরণযোগ্য সংলাপ রচনাকালে সংলাপকে উচ্চারণযোগ্য করে তুলতে ভোলেন নি। চিন্তাশীল নাট্যকার মাত্রই জানেন যে তাঁর লেখা নাটকগুলো মঞ্চস্থ হওয়ার জন্যই লেখা। আর তাই নাটকের সংলাপগুলি যেহেতু মঞ্চে কয়েকজন মানুষ বলবেন এবং বহু মানুষ শুনবেন, তাই বলার সময়ে মানুষের বলার ভঙ্গি বা ভাষার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ছন্দ ও বিন্যাস সংলাপের মধ্যে তাঁরা অবশ্যই গেঁথে দেন। কারণ তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে সেই কাজটি সহজভাবে না করে দিলে অভিনেতাদের মৌলিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এইখানেই অভিনয়ের জগতের সঙ্গে নাট্যকারের যোগাযোগের প্রশ্ন এসে যায় সহজেই।

৪. নাটকের বিষয় ও বক্তব্য (Theme & Message)

আমরা জানি যে নাটকের কাহিনি এবং তার নাটকে বিন্যস্ত কাঠামো একে অপরের সংলগ্ন হলেও পুরোপুরি এক নয়, নাটকের কাহিনি বা গল্পের থেকে বিষয়-কে আলাদা করে বুঝে নেওয়া অবশ্যই দরকার। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে অশোক মুখোপাধ্যায় দৃষ্টান্ত সহযোগে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন-"আমাদের প্রায় সকলের জানা

রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের গল্প খুবই আকর্ষণীয়। ভিখারিনী অপর্ণার দুঃখে সন্তপ্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুর রাজ্যে জীববলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর পুরোহিত রঘুপতি। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন রাণী গুণবতী ও রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়। রঘুপতির প্ররোচনায় নক্ষত্রের ভ্রাতৃহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয় রাজার চরিত্রগুণে। মাতৃপূজার জন্য গোপনে বলি সংগ্রহের চেষ্টা করেন রঘুপতি। রাজা সৈন্য দিয়ে মন্দির ঘিরে ফেলেন। রঘুপতিকে নির্বাসন দণ্ড দেন। আহত, বিধ্বস্ত পুরোহিত তাঁর প্রিয় শিষ্য জয়সিংহের মাধ্যমে রাজরক্ত সংগ্রহে শেষ মরিয়া চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজপুতবংশোদ্ভূত জয়সিংহ নিজের রক্তে মেটাতে চায় দেবীর পূজা। পুত্রতুল্য জয়সিংহের মৃত্যুতে চেতনা ফেরে রঘুপতির। ভিখারিণী অপর্ণার হাত ধরে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যান তিনি। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে নিজের ভাবনা মিশিয়ে এই চমৎকার গল্পটি তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের থেকে ‘বিসর্জন’ নাটকে এই কাহিনি র পরিবর্তন সাধন করেছেন। হৃদয়গ্রাহী নাট্যকাঠামোয় একে বিন্যস্ত করে ধাপে ধাপে নিয়ে গেছেন ক্লাইম্যাক্স বা তুঙ্গবিন্দু পর্যন্ত। কিন্তু এই কাহিনি ও তার নাটকীয় বিন্যাস অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুঝে নিতে হয় এর উপজীব্য প্রধান বিষয়গুলি (theme) কী কী। সেই রকম করে ভাবলে দেখা যাবে, রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মশক্তির বিরোধ, হিংসার সঙ্গে প্রেমের বিরোধ, কর্তব্যের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব, অতীব ব্যক্তিগত স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা বা দুই ভাই বা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে বৃহত্তর সংকটের অনুপ্রবেশ, রাজভক্তি ও রাজকর্তব্যের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি নানা বিষয় ওতঃপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে। দ্বন্দ্বের নানা ধরণ প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে এবং কে না জানে, দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ, তার মুখ্য চালিকাশক্তি।

এইভাবে কাহিনি , কাঠামো ও বিষয়ের আলোচনার পরেও প্রশ্ন থাকে, এ নাটকের কি কোন বক্তব্য (message) আছে? মনে হতে পারে যে প্রেমের শক্তি হিংসার শক্তির চেয়ে বড়, শুষ্ক প্রাচীন রীতির চেয়ে বড় হৃদয়বৃত্তি, মানবধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবসমাজে, এইরকম কিছু অনুভব যেন এই নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে দিতে চাইছেন আমাদের কাছে। এই যে অন্তর্লীন ভাবনাসূত্র তাই যেন গ্রথিত হয়ে গড়ে দেয় এক জীবনদর্শন, জীবন বিষয়ে এক স্বতন্ত্র বোধ। মোটা করে একে বক্তব্য বলে চিহ্নিত করা যায়, আবার মনন ও আবেগের কাছে এ এক আবেদনও বটে। নাটকের ছাত্রকে এই নির্যাসের অনুসন্ধানও করতে হয়। নাটকের স্তর যত বাড়ে, ততই বাড়ে তার কাহিনি র বুনোট এবং তার আবেদনের ব্যাপকতা। এই ভাবেই অল্পস্তরসঞ্চারী সাধারণ নাটকের থেকে আলাদা হয়ে ওঠে বহুস্তরসঞ্চারী মহৎ নাটক।

মহলা-পদ্ধতি

নাটকপাঠের প্রাথমিক পর্ব শেষ হলে শুরু হয় নাট্যনির্মাতার নিজস্ব পাঠ। নির্দেশক তার পঠিত নাটকের মঞ্চরূপের কল্পনা শুরু করেন। মঞ্চের শর্তের কথা মাথায় রেখে নাটকের স্থান-কাল-পাত্র এবার তাঁকে ভাবতে হয়। কোথায় কোথায় নাটকের ঘটনা ঘটছে (location) সেটা খেয়াল রেখে মঞ্চে তার দৃশ্যরূপ কেমন করে গড়ে তোলা হবে সেসম্পর্কে তার ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। অর্থাৎ মঞ্চসজ্জার (scenography) পারিকল্পনা নির্দেশককে করে নিতে হয়। যে সময়পর্বে কাহিনি র আবর্তন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চরিত্রের পোশাক-আশাক (costume), রূপসজ্জা (make-up) এমনকি আলো বা আবহ সংগীতের (lights/music) পরিকল্পনা করে ফেলেন তিনি। অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের ব্যাপারেও নির্দেশককে ভাবতে হয় ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতে হয়। কোনচরিত্রে কাকে মানাবে এই দুরূহ সিদ্ধান্ত নির্দেশক নিতে না পারলে তিনি মহলার কাজ শুরু করতে

পারবেন না। এক-একজন নির্দেশকের চলন এক এক রকম হলেও সবাইকে কিন্তু শুরুটা করতে হয় পাঠের মহলা দিয়ে। আর তারপর চরিত্রের চলাফেরার ছক তৈরির কাজে তিনি নেমে পড়েন।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের বিষয়ে নির্দেশকের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশকের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের কাজটি একদিকে সহজ আবার একদিকে কঠিন। সহজ এই কারণেই যে নির্দেশক দলের সদস্যদের প্রত্যেকের অভিনয়-ক্ষমতা ও সম্ভাবনা, তাদের শক্তি ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে অবহিত। আর তাই কে কোন চরিত্রটাকে সঠিকভাবে মঞ্চস্থ করতে পারবে সেই বুঝে তিনি সহজেই চরিত্র নির্বাচন করতে পারেন। আবার কাজটি দুরূহও বটে কারণ এক একটি দলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা সীমিত। তাই নির্দেশকের নির্বাচনের ক্ষেত্রও সীমিত, তাঁকে দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই কুশীলব নির্বাচন করতে হয়। কোনও কোনও সময় এক বা একাধিক দলের সদস্যদের দ্বারা নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ আসলে নির্দেশকের পক্ষে শিল্পী-নির্বাচনের স্বাধীনতা একটু বেড়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা যায় ভিন্ন ধারার অভিনয়ে অভিজ্ঞ শিল্পীদের একই ধারা বা পদ্ধতিতে মানানসই করে নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশককে নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সদস্যদের মধ্যে শিল্পী-নির্বাচনে যেমন নির্দেশককে একধরণের আপোষ করতে হয়, ঠিক তেমনি আবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেখানে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ আছে, স্বাধীনতা আছে সেখানে শৈল্পিক ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্দেশককে বাড়তি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত অর্জিত বোধের দ্বারাই নির্দেশক সেই কাজটিকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের পর শুরু হয় মহলা। এই মহলাকে কয়েকটিপর্বে ভাগ করে নেওয়া হয়। যেমন-

১. পাঠ-মহলা (Reading rehearsal)

২. মঞ্চে চরিত্রদের চলাফেরা ও বিন্যাস (Blocking & Composition)

৩. পোষাক-রূপসজ্জা-আলো-সঙ্গীতসহ মঞ্চ-মহলা (Technical Rehearsal)

৪. চূড়ান্ত মঞ্চ-মহলা (Final Stage rehearsal or Run-Through)

৫. প্রযোজনা-পরবর্তী মহলা (Post-production rehearsal)

নাটক থেকে নাট্যে যাবার পথ, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এই মহলা-পর্বের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। এখন সংক্ষেপে এই পর্বগুলিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

পাঠ-মহলা (Reading Rehearsal)

নির্দেশক নাটকের কুশীলব অর্থাৎ যে, যে চরিত্রে অভিনয় করবে সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে মহলা পরিচালনা করেন। নির্দেশক সবার প্রথমেই নাটকের চরিত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করে তার সাধারণ ধারণা ব্যক্ত করেন এবং অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে মতামত আদান-প্রদান করেন। তারপর বিভিন্ন চরিত্রের কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে তিনি মোটামুটি একটা খসড়া নির্মাণ করে নেন। মহলার পাঠের মাধ্যমেই নাটক বিষয়ে সম্পূর্ণ একটা ধারণা গড়ে ওঠে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সহজেই নিজেদের চরিত্রের

পরিধি সম্পর্কে বুঝতে পারেন, এমনকি নাটকে তাদের ভূমিকা এবং তাদের অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সম্পর্ক বিষয়েও অবহিত হন। কোন সংলাপ কিভাবে উচ্চারণ করবেন, সংলাপ বলার সময় কোথায় গলার স্বর কেমন হবে অর্থাৎ কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় যতি প্রয়োজন, এইসব প্রাথমিক পরিকল্পনাও খুব সহজেই পাঠাভিনয়ের সময় গড়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত মঞ্চে বা মহলা-ক্ষেত্রে 'চলাফেরা করে অভিনয় করার সময়ই কেবল সংলাপ বলার মোক্ষম ভঙ্গী ও সময় (Style of delivery and timing) ঠিক করে নেওয়া সম্ভব।'

পাঠ-মহলা কতদিন চলবে তা যে নাটক অভিনীত হচ্ছে সেই নাটক অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। দীর্ঘ সংলাপ-নির্ভর নাটক বা ধ্রুপদী নাটক বা কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে বারবার পাঠ-মহলা বেশী জরুরি হয়ে পড়ে। যাহোক পাঠ-মহলার পাঠের মধ্য দিয়েই শুরু হয় নাট্যনির্মাণ পদ্ধতির।

মঞ্চে চরিত্রের চলাফেরা ও বিন্যাস (Blocking & Composition)

লিখিত নাটকের দৃশ্য ও শ্রাব্য এক পুনর্নির্মাণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ের মাধ্যমেই মঞ্চে প্রযোজিত হয়। সংলাপের শ্রবণীয়তার দিকে বেশি জোর পড়ে পাঠ-মহলায়। কেমন করে কোনসংলাপ উচ্চারণ করলে তার ভেতরের অর্থটা স্পষ্ট হবে সেই দিকে বেশি নজর থাকে। কিন্তু নাটকের দৃশ্যগ্রাহ্য এক চিত্ররূপ তৈরি হয় মঞ্চে চরিত্রদের চলা-ফেরার মধ্য দিয়ে। সেখানে মঞ্চ ও মানবশরীরের যুগপৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এক অদ্ভুত ছবি তৈরি হতে থাকে। কাহিনি র এই চিত্রায়ণ বস্তুতই একটি জটিল প্রক্রিয়া। নির্দেশককে নিজের কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটা বুঝে নিতে হয়। বারবার ভাঙতে-গড়তে হয়। আর তাই নির্দেশকের কিছু প্রাথমিক বোধ থাকা অবশ্যই দরকার। যেমন-

মঞ্চের ভাগ

মঞ্চের আয়তক্ষেত্রকে Down stage (সম্মুখ মঞ্চ), Centre stage (মধ্য মঞ্চ), ও Up stage (পশ্চাদ মঞ্চ)-এ ভাগ করে নেওয়া হয় কাজের সুবিধার জন্য। এই তিনটি অংশকে আবার তিনটি করে ভাগ করে নিলে মঞ্চ মোট নযটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। অশোক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন—

<u>মঞ্চের ৯টি ভাগ</u>[৬]

UR	UC	UL	UP STAGE (পশচাদ মঞ্চ)
CR	CC	CL	CENTRE STAGE (মধ্য মঞ্চ)
DR	DC	DL	DOWN STAGE (সম্মুখ মঞ্চ)

মঞ্চের এই অংশগুলিকে স্কন্দ্রত্বদ্ধ বলা হয়। এই Block গুলির আলাদা আলাদা শক্তি ও দুর্বলতা আছে। একজন নির্দেশককে প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ভিত্তিতে সেই শক্তি ও দুর্বলতাকে চিনে নিতে হয়। এই সব ব্লকগুলির কোনটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার পরিকল্পনাকেই বলে Blocking। এক একটা চরিত্র এক এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে চলে গিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে যে-সব ছবি তৈরি করে তাকে বলা হয় Composition। অর্থাৎ 'মঞ্চের

এলাকা ধরে ধরে (Blocking) চলমান মঞ্চদৃশ্যের সুষম বিন্যাস (Composition) এই দুটিই হচ্ছে চিত্রায়ণের (Picturisation) মূল কথা।' এই বিষয়ে বোধ ও অভিজ্ঞতা মঞ্চনির্দেশকের আয়ত্বে আনতেই হয়, তবেই একটি নাটকের মঞ্চায়ন সফল হয়।

জড়-চেতন ভারসাম্য

অভিনয় চলাকালীন মঞ্চে একের পর এক ছবি তৈরি করা হয়। মঞ্চে ছবি তৈরির সময় সর্বদা মনে রাখতে হয় যে দুই বিপরীতের সংমিশ্রণে তৈরি হয় এই ছবির চরিত্র। আমরা জানি মঞ্চ (stage) এবং তার উপর তৈরি করা মঞ্চ সজ্জা (sets) ও মঞ্চসামগ্রী (requisition) এ-সবই প্রধানত কাঠ, কাপড়, ইট, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি জড় বস্তুর দ্বারা নির্মিত। এইসব অচেতন বস্তুকে ব্যবহার করেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপর নানাবিধ ছবি তৈরি করে যান—নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বস্তুত জড় ও অজড়ের সহাবস্থানে, বৈপরীত্যে, সংঘর্ষে ও সঙ্গমে জন্ম নেয় মঞ্চের ছবি। মঞ্চে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক আলো এতে আবার আরেক জোরালো মাত্রা যোগ করে। আলো যন্ত্রে তৈরি হলেও তা যান্ত্রিক নয়, বরং বাঙময়। দৃশ্যকাব্যের জটিল ও বিচিত্র বিন্যাস এই সব সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতা মিলে-মিশেই তৈরি হয় মঞ্চের উপর।

মঞ্চদৃশ্যের মূল কথা

কোন দৃশ্য মঞ্চে সাজিয়ে তোলার সময় কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশকের তীক্ষ্ম নজর থাকা দরকার। যেমন-

i. মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে চলে যাবার ক্রম বা পর্যায় (sequence) যেন সর্বদা স্পষ্ট থাকে। ii. সৃষ্ট ছবির সঠিক জায়গায় যেন জোর (Emphasis) পড়ে। এবং iii. গোটা ছবির ভারসাম্য (Balance) যেন বজায় থাকে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলাফেরার গতিপথ (Line of movement), চলাফেরায় গতির তারতম্য (Movement & Speed), শরীর সংস্থান (Body-position), এক জায়গায় থেমে থাকা (Pause in movement), শরীরের রেখার পরিবর্তন (Body-line), যথা বসে থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা বা শুয়ে থাকা এই দায়িত্ব-পালনে নির্দেশককে সাহায্য করে। এমনকি মঞ্চসজ্জায় (Sets) নানা তল ব্যবহার করে (level) চিত্ররূপে মাত্রা যোগ করা হয়। অর্থাৎ নানা পন্থা ব্যবহার করে বৈচিত্র্য ও সাবলীলতা (Variety & Fluidity) তৈরি করতে জড় ও চেতনের সহাবস্থানে দৃশ্যকে পরপর সাজাতে হয়। তারমধ্যেই থাকে বৈপরীত্য (Contrast) ফুটিয়ে তোলার কৌশল। কারণ আমরা জানি দ্বন্দ্বই হল নাটকের প্রাণ। আর সংলাপ বা অভিনয়ের মাধ্যমেই শুধু এই দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুললে চলে না, বরং দ্বন্দ্ব-র দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ সৃষ্টি করতে হয় মঞ্চদৃশ্যের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

আবার অভিনেতা ও মঞ্চসজ্জা মিলে যে ছবি তৈরি হয়, তা পোষাক (Costume) ও রূপসজ্জার (Makeup) সুষম যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণতা পায়। সেখানে চরিত্র-র বহিরঙ্গ ফোটানো যেমন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, ঠিক সেই সঙ্গে মঞ্চের ও মঞ্চসজ্জার রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যও (Harmony) তৈরি করতে হয়। সর্বোপরি আলোকসম্পাতের (Lights) নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত রূপ খুঁজে পায় মঞ্চদৃশ্য। থিয়েটারের ভাষাকে এইসব বিপরীত অভিজ্ঞতাকে মিলিয়েই তৈরি করতে হয় নির্দেশককে। খুঁজে নিতে হয় দৃশ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ (Rhythm)।

দৃশ্য তৈরি (Picturisation)[৭]

পর্যায় (Sequence)	জোর (Emphasis)	ভারসাম্য (Balance)
শরীর সংস্থান (Body Position)	চলাফেরার গতি (Movement & Speed)	থেমে থাকা (Pause)
চলাফেরার গতিপথ (Line of Movement)	শরীরের রেখা (Body Lines)	বৈপরীত্য (Contrast)

মঞ্চে কুশীলবদের চলাফেরা এবং প্রয়োজনীয় মঞ্চক্রিয়া তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বাচিক অভিনয়ও চলতে থাকে। পাঠ-মহলায় সংলাপ উচ্চারণের প্রাথমিক প্যাটার্ণ তৈরি হলেও তা চূড়ান্ত রূপ পেতে থাকে শরীরী অভিনয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কোনসংলাপ কোনমাত্রায় (Scale) বা কোনউচ্চতায় (Volume) বললে তা সঠিকভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাবে তা কেবলমাত্র মঞ্চ-মুহূর্ত তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করা যায়। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'চরিত্রের মানসিক অবস্থা, নাটকের ক্রিয়া (Action) তখন কোনপর্যায়ে, এমনকি সহ-অভিনেতা কতটা দূরে বা কাছে আছে, কথা বলার সময় অভিনেতা স্থানু না চলমান অবস্থায়, চলমান থাকলে গতি দ্রুত না ধীর না মাঝারি, এমনই সব বহু ছোট-বড় হিসেব-নিকেশ করতে হয় সংলাপ উচ্চারণের চূড়ান্ত রূপ ঠিক করতে। সুতরাং সন্দেহ নেই, শরীরি ও বাচিক অভিনয়ের যুগপৎ চর্চা চলতে থাকে মহলার এই পর্বে।'[৮]

পোষাক-রূপসজ্জা-আলো-সঙ্গীতসহ মঞ্চ-মহলা (Technical Rehearsal)

নাটকের প্রযোজনাকে ধাপে ধাপে গড়ে তোলা হয়। প্রযোজনার নানা অঙ্গ। মঞ্চে অভিনয়ের সময় মঞ্চসজ্জা (Sets) ও মঞ্চসামগ্রীর (Requisi-tion) সঙ্গে অভিনেতাদের পরিচয় ঘটে। নির্দেশককে প্রযোজনা-পদ্ধতির অন্তিম পর্বে পোষাক ও রূপসজ্জার চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে নিতে হয়। কারণ মঞ্চসজ্জা, পোষাক ও রূপসজ্জা প্রস্তুত না হলে যিনি নাটকের আলো করবেন তার পক্ষে আলোর পরিকল্পনা করা দুরূহ পড়ে। প্রাবন্ধিক লেখেন—'মঞ্চ ও পোষাকে শুধু নাট্যক্রিয়া বা চরিত্রের স্বরূপ আভাসিত হয়না। এদের মধ্যে রঙের যে-ব্যবহার হয়, সেখানে দৃশ্যের ভারসাম্যও রক্ষা করতে হয়। পোষাক, রূপসজ্জা ও মঞ্চের বিন্যাস অভিনয়ের সঠিক প্রেক্ষিত তৈরি করছে কিনা এটা চূড়ান্ত ভাবে বুঝে নিতে হয় নির্দেশককেই।'

মঞ্চে নাট্যক্রিয়ার দৃশ্যকাব্য রচিত হয় আলোক-নির্দেশকের সাহচর্যে। কোনও বিষয়কে কতক্ষণ ও কতটুকু দেখানো হবে, কিম্বা কোন বিষয়কে হাইলাইটে আনতে হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে যিনি নাটকের আলো করছেন তার উপর। আলো তাই মঞ্চপ্রযোজনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্দেশকেরও আলোক-ব্যবহারের বিজ্ঞান বিষয়ে বোধ ও অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহলে তিনিও আলোচনা সূত্রে আলোক নির্দেশককে নাটকের বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য রূপদানে পরামর্শ দিতে পারবেন। আলোক-পরিকল্পনা করা হয়ে গেলে এবারে ভাবতে হয় আবহ-সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে। নাটকে নানাবিধ শব্দ/ধ্বনি ব্যবহার করতে হয় প্রযোজনায়। নাটকে গান ব্যবহারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গান কখনো কখনো কুশীলবদের কণ্ঠ (Vocal) থেকে, কখনও বা যন্ত্র (Instrumental) থেকে উদ্ভুত হয়। এমনকি প্রযোজনায় বহু রকমের অ-সাঙ্গীতিক (Non-musical) শব্দ বা ধ্বনিরও প্রয়োজন হয়। শব্দযন্ত্রীর ভান্ডার থেকে (Stock) সেই অ-সাঙ্গীতিক শব্দ বা ধ্বনির সন্ধান অনেক সময় পাওয়া গেলেও কখনও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে (Improvisation) সেই শব্দ বা ধ্বনি তৈরি করে নিতে হয়। নির্দেশককে নাটকের আবহ সঙ্গীত যিনি রচনা করছেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এইসব খুঁটিনাটি কাজও করতে হয়।

চূড়ান্ত মঞ্চ-মহলা (Final Stage-Rehearsal/Run through)

প্রযোজনার সব বিভাগের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন নির্দেশক আয়োজন করেন চূড়ান্ত মঞ্চ-মহলার। এই চূড়ান্ত মহলায় নির্দেশক আর কোনও তাৎক্ষণিক সংশোধন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। একটানা তখন মহলা চলে, মনে যেন দর্শকের সামনে অভিনয় চলছে। নির্দেশক ও প্রযোজক-গোষ্ঠীকে এই চূড়ান্ত মহলা রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, পোষাক, আলো, আবহ, সঙ্গীত, ধ্বনি সব বিভাগের কাজের সমন্বিত পরিবেশনে প্রযোজনা ঠিক কী রূপ নিচ্ছে তা বুঝে নিতে খুবই সাহায্য করে। কোন সময়ে পর্দা উত্তোলন করা হবে, কোন সময়ে পর্দা বন্ধ করা হবে, এমনকি পর্দা তোলার ও ফেলার সঠিক মুহূর্ত ও গতি কিভাবে স্থির করা হবে, বিরতির সময়-সীমার মধ্যে নেপথ্যের প্রস্তুতি কিভাবে চূড়ান্ত করে রাখা হবে, পুরো নাটকটি অভিনীত হতে কতক্ষণ সময় লাগছে ইত্যাদি বহু বিষয়ের খুঁটি-নাটি ঠিক করে নেওয়া যায় এই চূড়ান্ত মহলায়।

প্রযোজনা-পরবর্তী মহলা (Post-Production Rehearsal)

চূড়ান্ত মঞ্চমহলার পর প্রযোজনা মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। নাট্যাভিনয় শেষে দর্শকের প্রতিক্রিয়া ও মতামত বিশ্লেষণ করে নির্দেশক প্রযোজনার শক্তি এবং দুর্বলতা দুই-ই চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নির্দেশককে নিরপেক্ষ এবং আত্মবিশ্বাসী হতে হয়। নির্দেশককে দর্শক প সমালোচকদের প্রশংসা এবং নিন্দা দুইয়েরই ঊর্দ্ধে উঠে নিজের মত করে সাফল্য-অসাফল্যের মূল্যায়ন (Assessment) করতে হয় এবং প্রয়োজনমতো প্রযোজনায় সংশোধন করতে হয়। প্রয়োজনে মঞ্চসজ্জার কিছু অংশের পরিবর্তন করতেও হয়, যেহেতু মঞ্চসজ্জায় ব্যবহৃত উপকরণের স্থানান্তকরনের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংশোধনের পরিকল্পনা করতে হয় ঠাণ্ডা মাথায়। মাথায় রাখতে হয় পরবর্তী অভিনয়ের আগে তিনি কতটা সময় পাওয়া পাচ্ছেন তার উপর। পরিবর্তন কিছু হলে নির্দেশককে পুনরায় মহলার ব্যবস্থা করতে হয়। এইভাবে যতদিন একটি নাট্যপ্রযোজনা চলতে থাকে ততদিনই পরিবর্তন-পরিমার্জন-সংশোধনের অবকাশ থাকে।

একটি নাটককে ভালো করে মঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য করে তুলতে পারেন একজন নির্দেশক। এক্ষেত্রে নিজস্ব বোধ, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, সাহিত্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অবশ্যই জরুরি। শুধু তাই নয়, দলের ছেলে মেয়েদের অভিনয় পারদর্শিতা সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন ভালো নির্দেশকের কাজ শুরু হয় নাটক বাছাই করা থেকেই। তারপর ধাপে ধাপে কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নাটকটির রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটে। রিহার্সাল রুমে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় একজন ভালো নির্দেশকই পারেন একটি নাটককে যথাযথভাবে মঞ্চায়িত করতে।

নির্দেশকের প্রথম কাজ 'নাটক নির্বাচন' করা। বিশেষজ্ঞরা নাটক নির্বাচন করার সময় চারটি নিয়ম মেনে চলতে বলেছেন। (১) নাটকটি নির্দেশকের মনোমত হয়েছে কিনা। (২) অভিনেতারা নাটকটি অভিনয় করতে উৎসাহী কিনা। (৩) নির্বাচিত নাটক দর্শকদের চিত্তাকর্ষণ করতে তথা আনন্দ দিতে সক্ষম হবে কিনা। এবং (৪) প্রযোজনা সুসাধ্য হবে কিনা অর্থাৎ অর্থসঙ্গতি, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা ও সামর্থ্য, দৃশ্যসজ্জাদি ইত্যাদি ব্যাপারে কোন দিক দিয়েই তা সাধ্যের অতীত হবে কিনা। নির্দেশকের কোনও নাটক পড়ে ভালো লাগলে সবার আগে তিনি দলের সদস্যদের জানান। ঠিক তেমনি অন্যান্যদের পছন্দসই নাটকও তিনি নিজে যেমন পড়েন ঠিক তেমনি অন্যান্যদেরও পড়তে বলেন। তারপর দীর্ঘ আলচনাক্রমে নাটক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত নাটকটি তখন তিনি বারবার খুঁটিয়ে পড়েন ও সদস্যদের নাটকটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে বলেন। তারপর সবাই মিলে এক জায়গায়

বসে নাটকটি পড়বার ব্যবস্থাপনাও করেন। কেন তিনি নাটকটি নির্বাচন করলেন সে সম্পর্কে দলের অন্যান্যদের অবহিত করান। ঠিক তেমনি নাটকটি পড়ে বাকীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের কথাও শোনেন। অর্থাৎ যৌথ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই নাটক নির্বাচনের যৌক্তিকতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকের মধ্যে যে কাহিনি বলা হচ্ছে, সেটা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে কিনা সে সম্পর্কে যেমন নির্দেশকের স্পষ্ট ধারণা থাকে, ঠিক তেমনি আবার গল্পটা কিভাবে বললে দর্শকদের মনোগ্রাহী হবে সে সম্পর্কেও তিনি নিরন্তর চিন্তাভাবনা করেন। চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য কী করে করা যাবে, সে সম্পর্কেও দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে মতামত উঠে আসলে তিনি বাকিদের কথাগুলোর গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্ব বিচার করে দেখেন। সংলাপকে চরিত্রানুযায়ী করে তোলার চেষ্টা করেন। মূল নাটকের বিন্যস্ত কাহিনি র থেকে আলাদা করে তিনি যেমন নিজস্ব বোধগম্যতার জায়গায় পৌছান, তেমনি অন্যদের বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করেন।

নির্দেশকের দ্বিতীয় কাজ 'ভূমিকা বণ্টন' (কাস্টিং) করা। নির্দেশক তাঁর দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় প্রদর্শনের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই কাকে কোন চরিত্রটি মানাবে, সে সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা লক্ষ্য করা যায়। সেই অনুসারে তিনি চরিত্র নির্বাচন করেন। বলাবাহুল্য, নাটক নির্বাচনের সময়েই নির্দেশক দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা মাথায় রেখেই নাটক নির্বাচন করেন। তাই প্রথম থেকেই তার মাথায় থাকে কাকে কোন চরিত্র দেওয়া যাবে। কারণ, দলের কার কি অভিনয় ক্ষমতা, কে কোন রসের অভিনয়ে পারদর্শী সেসব সম্পর্কে তিনি অবহিত। নির্দেশককে খুব সতর্কভাবে চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। খেয়াল রাখা উচিত যেন তিনি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়েন। ভূমিকা বন্টন করার সময় নির্দেশক অবশ্যই দেখবেন-অভিনেতাদের আকৃতি, স্বর এবং অভিনয় দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য আছে কি না। প্রধান ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি অন্যান্য ভূমিকা বণ্টন করবেন। নির্দেশক কখনোই কোনো অভিনেতাকে একাধিকবার একই ধরণের ভূমিকা দেবেন না। তাতে সেই অভিনেতা ক্রমে 'টাইপ' অভিনেতায় পরিণত হবেন এবং তার অভিনয় মুদ্রাদোষদূষিত হয়ে পড়বে।

নির্দেশকের তৃতীয় কাজ 'প্রয়োগ পরিকল্পনা' করা। এই পরিকল্পনার প্রথম কাজ নাটকের প্রতিপাদ্য রস, রূপ ও রীতি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরে নাটকটি বহুবার পাঠ করে করে মুখস্থের মত করে নাটকের সমগ্র রূপের একটি ধ্যান মনের মধ্যে স্পষ্টাকারে ধারণা করা এবং সেই ধ্যানানুসারে 'পাণ্ডুলিপি' (স্ক্রিপট প্রস্তুত করে ফেলা। নাট্যকারের নাটক, নির্দেশকের অভিনয়, সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে যে নতুন রূপ ধারণ করে, তারই নাম অভিনয় পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপিতে থাকে নাটকের প্রত্যেকটি পরিস্থিতির প্রত্যেকটি দৃশ্যের ও অঙ্কের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশ্লেষণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বিচার। প্রত্যেকটি দৃশ্যের চূড়ান্ত পর্যায় (ক্লাইম্যাক্স), প্রত্যেক অঙ্কের চূড়ান্ত পর্যায় এবং সমগ্র নাটকের চূড়ান্ত পর্যায় নির্দেশক চিহ্নিত করে রাখেন এবং নাটকীয় ঔৎসুক্যের ক্রমবৃদ্ধির ধারাটিও সতর্ক-ভাবে নিরূপণ করেন। অভিনয় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পরে তিনি প্রত্যেকটি অভিনেতাকে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সবিস্তারে লিখে লিখে দিয়ে দেন। দ্বিতীয় কাজ—মঞ্চ পরিকল্পনাকার ও দৃশ্য-রচয়িতার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেক দৃশ্যের নক্সা তথা 'সিন-প্লট' তৈরী করা। তৃতীয় কাজ-দৃশ্যশিল্পী ও পরিচ্ছদ শিল্পীর সঙ্গে পরামর্শ করে 'প্রপার্টি প্লট' তৈরী করা। চতুর্থ কাজ-পরিচ্ছদ শিল্পীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বেশভূ ষার পরিকল্পনা করা। পঞ্চম কাজ-আলোকশিল্পীর সঙ্গে পরামর্শ করে 'লাইটিং প্লট' প্রস্তুত করা। ষষ্ঠ কাজ—'সাউণ্ড প্লট' প্রস্তুত করা।

নির্দেশকের চতুর্থ কাজ এবং মুখ্য কাজ 'রিহার্সাল' অর্থাৎ অভিনয় শিক্ষাদান করা। চরিত্র নির্বাচন হয়ে গেলে শুরু হয় নাটকের রিহার্সাল। প্রথমেই হয় পাঠের মহলা। চরিত্রগুলো সম্পর্কে নির্দেশক তাঁর ধারণা সবার সামনে

ব্যক্ত করেন এবং সেই চরিত্রটি সম্পর্কে অন্যান্যদের অভিমতও শোনেন। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রশ্ন করে করে নিজেদের চরিত্রের স্বরূপ জেনে নিতে চেষ্টা করেন এবং নির্দেশক তা সম্যকভাবে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেন। এরপর বিভিন্ন চরিত্রের উচ্চারণ ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এমনকি, কোন সংলাপ কেমন ভাবে বললে, কোন শব্দের উপর বিশেষ জোর দিলে চরিত্রটিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে সেসব সম্পর্কেও তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

এরপর শুরু হয় আসল রিহার্সাল—অভিনয়-শিক্ষণের কাজ। কাজের শুরুতেই নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজ নিজ কণ্ঠে সংলাপগুলি পাঠ করবার ব্যবস্থা করেন। এর দ্বারা অভিনেতাদের উচ্চারণ জড়তা দূর করা যায় এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে কুশীলবদের তা যথেষ্ট সাহায্য করে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজের অভিনীত চরিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি তাও বুঝে নিতে নির্দেশক সুপরামর্শ দেবেন। কারণ 'সবরকম আচরণেরই (কায়িক, সাত্ত্বিক, বাচনিক) মূল উৎস হচ্ছে চরিত্র বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই কায়িক, সাত্ত্বিক ও বাচনিক অভিব্যক্তির মাত্রা ও ঔচিত্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।'[১১]

কায়িক, বাচনিক এবং সাত্ত্বিক আচরণগুলির পূর্ণ সংশ্লেষণেই অভিনয়ে সার্থকতা বটে, কিন্তু শিক্ষার সৌন্দর্যের জন্য নির্দেশক ঐ তিনটি আচরণকে পৃথক পৃথক ভাবে অভ্যাস করিয়ে থাকেন। মঞ্চের উপর চরিত্রের অবস্থান, তারা কোথায় কিভাবে চলাফেরা করবে—সেগুলিও নির্দেশক বারংবার অভ্যাস করিয়ে নেন। অর্থাৎ মঞ্চকে কয়েকটি পর্বে যেমন সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাদ ভাগে বিন্যস্ত করে চরিত্রদের মঞ্চে চলাফেরা কেমন হবে সেসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন। কোন চরিত্রের, কোন ধরনের পোশাক হবে কিংবা নাটকের কোথায় কোন আলোর ব্যবহার করা হবে, কোন সঙ্গীতের সঙ্গে অভিনীত সংলাপ কেমন হবে, মঞ্চের উপর ব্যবহৃত উপকরণগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এসব খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও নির্দেশক দলের সদস্যদের অবগত করান এবং আলোচনা সাপেক্ষে একটি যুক্তিনির্ভর খসড়া তৈরি করেন। সকলের অভিনয়ের সমবায়ে তিনি প্রতিমুহূর্তের রূপ ও রসকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রসঙ্গত ডঃ. সাধন কুমার ভট্টাচার্য লেখেন-

"পরিচালককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর কায়িক-বাচনিক-সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি, দৃশ্যসজ্জা, আলোক, বেশভূষা প্রভৃতি উপকরণ খণ্ড খণ্ড রূপে যত ভালই হক তাদের অখণ্ড বা সাময়িক সংবেদনের উপরেই রস নিষ্পত্তি নির্ভর করে এবং যে মনে তিনি রসের উদ্রেক করবেন, সে মন শুধু ব্যক্তি বিশেষেরই মন নয়, দর্শক সমষ্টির মন। উপকরণ প্রয়োগের সময় যে পরিচালক সমষ্টি-মনের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুল করেন, তিনি গোড়াতেই একটি মহাভুল করেন—যে হাটে তাঁর প্রয়োগ বিকাবে সেই হাটের কথাই ভুলে থাকেন । যখন পরিচালকের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য প্রয়োগের দ্বারা দর্শক মনে অভিপ্রেত রসসৃষ্টি করা তখন, যে উপকরণই তিনি ব্যবহার করুন না কেন, দর্শকমণ্ডলীতে বা সমষ্টিমনের উপকরণটিতে অভিপ্রেত সংবেদন সৃষ্টি করতে পারছে কি না, সেই দিকেই তাঁকে একাগ্র দৃষ্টি রাখতে হবে। অস্বাভাবিক উপকরণগুলির দ্বারা স্বাভাবিকতার মায়া করে যে পরিচালক সমষ্টিমনে অভিপ্রেত রস সৃষ্টি করতে পারেন, তিনিই সার্থক পরিচালক।"

সবশেষে শুরু হয় চূড়ান্ত মহলা। এই ধরণের মহলায় নির্দেশক তাৎক্ষণিক সংশোধন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। একটা পুরো নাটক সবাই মিলে মহলা চলে ঠিক যেমনভাবে দর্শকদের সামনে মঞ্চস্থ হয়, থিয়েটারের সব আনুষঙ্গিক বিষয় মঞ্চ, পোশাক, আলো, সেট-সেটিংস, আবহসংগীত ইত্যাদি সহযোগে। দলের সবার সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন মনোভাব এবং টিমওয়ার্কের মাধ্যমেই একজন দক্ষ নির্দেশক একটি নাটককে সার্থক মঞ্চায়নের দিকে নিয়ে যান। তিনি একজন দক্ষ সেনানায়কের মতো থিয়েটার নির্দেশনার দায়িত্ব সামলান।

পত্র : ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

নাটক : অনুশীলন ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ্ : ৪

নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ

একক-৫

থিয়েটারওয়ালার সিনেমা—বিভাস চক্রবর্তী

পাঠ বিন্যাস :

৪০৪.৪.৫.১ : ভূমিকা

৪০৪.৪.৫.২ : প্রবন্ধের ভাববস্তু

৪০৪.৪.৫.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪০৪.৪.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.৪.৫.১ : ভূমিকা

বিভাস চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক, অভিনেতা এবং মঞ্চায়নের তাগিদে কিছু নাটকের রচয়িতাও। কিন্তু তাঁর সহযোগীদের থিয়েটার দেখার ব্যাপারে আগ্রহ বরাবরই ছিল। সমসময়ের থিয়েটার যা দেখেছেন তা নিয়ে আলোচনার কোনো কার্পণ্য বা কুণ্ঠা রাখেননি। তাঁর নাট্যকর্মজীবনের ব্যপ্তি পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে। বিভাস চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৭ এর ২৩ সেপ্টেম্বর শ্রীহট্টে। বার্মা সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসের জন্য তাঁর শৈশব কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের আশঙ্কার মধ্য দিয়ে। মাত্র দশ বছর বয়সে 'বিজয় সিংহ' নাটকে বৃদ্ধ মন্ত্রীর চরিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। তাঁর নাট্য জীবনের সূচনা 'বহুরূপী'তে হলেও তার সময়টি ছিল হতাশাজনক। ১৯৬০ সালে যোগ দেন 'নান্দীকার'-এ। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তিনি অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৬৬ সালে 'নান্দীকার' ছেড়ে তৈরি করেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ। সে সময়ের বহু নাটকের পরিচালক ছিলেন তিনি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত', মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' তার অন্যতম। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'রাজরক্ত' ছিল এক উল্লেখযোগ্য নাট্য পরিবেশনা। যেখানে সংকেত-প্রতীক রূপকের ব্যবহারে প্রথাগত রাজনৈতিক নাটকের বাইরে এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের পরিস্ফুটন হয়েছে।

১৯৮৫তে 'অন্য থিয়েটার' নামে এক নাট্যদল গঠন করেন তিনি। 'কথা ও কায়া' নাট্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সূচনাকাল থেকে বহু বছরের সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়াও কলকাতা নাট্যকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক আকাদেমিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৫-৯৬তে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসররূপে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালে বঙ্গনাট্য সংহতি গড়ে তোলেন এবং প্রথম সম্পাদক তিনিই ছিলেন। অসংখ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। 'শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮৮), ভারত সরকারের 'সংগীত নাটক আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৮৯), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্গ বিভূষণ', বাংলাদেশের ঢাকা পদাতিক-এ সম্মান 'নাট্যভূষণ', 'নান্দীকার পুরষ্কার' (১৯৯১) ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটক—'ভিয়েতনাম', 'অন্ধকারের নাটক', 'বিচিত্র নাট্য', 'পাঁচু ও মাসি' (সহযোগী অশোক মুখোপাধ্যায়), 'হচ্ছেটা কী' (সহযোগী বাচ্চু দাশগুপ্ত) 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা', 'নটীর কথা', 'নিবারণ বাড়ুজ্জে', 'অগ্নিজল' প্রভৃতি। কিছু ফিল্মোগ্রাফিও রয়েছে। যথা—'আমার ভুবন' (২০০২), 'পথ ও প্রসাদ' (১৯৯১), 'আমার পৃথিবী' (১৯৮৫), 'পরশুরাম' (১৯৭৯), 'ছেঁড়া তমসুক' (১৯৭৪)।

'দল নয় থিয়েটারই বড় কথা'—একথা ঘোষণা করে বিভাস চক্রবর্তী গ্রুপ থিয়েটার সম্বন্ধে নতুন চিন্তার উদ্রেক করেন। যার ফলশ্রুতি অন্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গ্রুপ থিয়েটারে দল বড় হয়ে যাচ্ছে, থিয়েটার নয়। তাঁর অভিমত, 'এদেশের গ্রুপ থিয়েটার একেবারেই অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। একেবারে শিকড়বাকড়হীন। এই থিয়েটার অবশ্যই অবক্ষয়ের থিয়েটার'।

তাই দীর্ঘ ৫৫ বছর অতিক্রান্ত নাট্যজীবনে কত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে মানুষটিকে। নাটকের নির্মাণকালে, অভিনেতার পরিচালনাকালে বা থিয়েটারের সহযোগী অন্যান্য শিল্পসৃজকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কত সমস্যা দেখা দিয়েছে। আবার কত সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে—তারই ফলশ্রুতি এই প্রবন্ধ। এরকম আরও অসংখ্য প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর রচিত 'নাটুকিটাকি'। 'থিয়েটারওয়ালার সিনেমা' প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে 'নাটুকিটাকি' গ্রন্থ থেকে।

গ্রন্থটি কারিগর থেকে প্রকাশিত হয় ২০১৮তে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন রবিশংকর বল-এর স্মৃতির উদ্দেশে। 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাংবাদিক, সাহিত্যিক-বন্ধু রবিশংকর বল-এর অনুরোধে তাঁদের ক্রোড়পত্র রবিবারের 'ছুটি'তে একটি নাট্যবিষয়ক ধারাবাহিক কলাম শিখতে শুরু করেন। এটি পনের দিন অন্তর অন্তর প্রকাশিত হত। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ২০১৫-র ৫ জুলাই। একুশটি লেখা নিয়ে এই নাটুকিটাকি বইটি। প্রবন্ধগুলি হল—প্রতিদিন নাটক, কোরাস ও জনতা, ভাষা-উপভাষা সুর-উচ্চারণ, বিজনদা-বটুকদা, কথাতঙ্ক!, থিয়েটারওয়ালার সিনেমা, গুরু-শিক্ষক সংবাদ, আজ পীযূষ নেই, পাঠে মন করহ নিবেশ, আমাদের শেকসপিয়ার, দ্বন্দ্বে মাতনম, থিয়েটারের কাসাবিয়াংকা, বিজ্ঞান চেতনা, অভিনেতাকে থামতে নেই, স্বাভাবিক অভিনয় কারে কয়, সাধারণ রঙ্গালয়, নাটকে ও জীবনে, হায়, কমেডি! নাট্যের ভাষা, রেপার্টরি থিয়েটার। সবগুলো প্রবন্ধই নাটক, থিয়েটার বিষয়ক, নাট্যকারের অভিনয় যাপনের টুকিটাকি বিষয় নিয়েই নাটুকিটাকি।

৪০৪.৪.৫.২ : প্রবন্ধের ভাববস্তু

থিয়েটার ও সিনেমা দুটি পৃথক সংরূপ। থিয়েটার ও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষাও আলাদা, ক্ষেত্র ও পরিসরও আলাদা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, একজন থিয়েটারওয়ালা সিনেমা প্রযোজনা করছেন বা সিনেমার পরিচালক থিয়েটার করছেন। একজন থিয়েটার কর্মী-অভিনেতা সিনেমাতেও অভিনয় করে থাকেন। এই

চলন প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। কিন্তু তার প্রেক্ষিত, পটভূমি আলাদা। প্রাবন্ধিক বিভাস চক্রবর্তী অসংখ্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে থিয়েটারওয়ালা ও সিনেমা পরিচালকের হয়ে ওঠা, খ্যাতি, সম্মান, দুই ক্ষেত্রেই গমনাগমন বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—"যে নামটা আগে কখনো শোনা যায়নি হঠাৎ করেই নামটা ছড়িয়ে পড়ে প্রচারের বাজারে।" [নাটুকিটাকি, পৃষ্ঠা ৩৫]

অনেক নামকরা সিনেমা পরিচালকের সিনেমা জগতে প্রবেশ Lateral অর্থাৎ ঘাপটি মেরে বসে থেকে পাশটি থেকে হঠাৎই লাফটি মেরে ঢুকে পড়া। যেমন সত্যজিৎ রায়ের কথা বলেন তিনি। প্রথম ছবিতেই তাঁর ফাটাফাটি রেকর্ড। আজকাল যদিও সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতা হবার আগে একটা ব্রিডিং বা ট্রেনিং পর্ব আছে কিংবা অনেকে সিরিয়াল বা সিনেমাতে আগে নবিশ হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু সেই পরিচিতি কতটুকু। অনেকের নিচে থেকে ওপরে ওঠার ব্যাপারটা নাও ঘটতে পারে।

কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে সচরাচর এমনটা ঘটে না। নাটক বা থিয়েটারের পরিচালক বা অভিনেতা চোখের সামনেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছেন বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। এখানে রাতারাতি কোনো চমক বা আবিষ্কার ঘটে না। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে থিয়েটার ও সিনেমার যাতায়াতটি অবাধ। থিয়েটারের বহু অভিনেতাই সিনেমায় বা দুই মাধ্যমেই অভিনন্দিত। অনেকে সিনেমায় সফল না হলেও থিয়েটারে বেতাজ বাদশা। প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই দুজনই থিয়েটারওয়ালা তথা থিয়েটার পরিচালক। কিন্তু তাঁদের সিনেমা করার সুপ্ত বাসনা ছিল। শম্ভু মিত্রের 'একদিন রাত্রে', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'মানিক', 'শুভবিবাহ'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাবন্ধিকের সমসাময়িকদের মধ্যে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহ, পড়াশোনা ছিল। তিনি যেগুলি সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলি অনেকটাই চিত্রায়িত থিয়েটার, যাকে ইংরেজিতে 'সিনেমাটোগ্রাফড্ থিয়েটার' বলে। প্রাবন্ধিকের মতে "সেটাও একটা না সিনেমা না থিয়েটার গোছের তৃতীয় কিসিমের অভিজ্ঞতা।" [নাটুকিটাকি, পৃ. ৩৬]

মধ্যবর্তী প্রজন্মে রয়েছেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য। তাঁরা থিয়েটারই করেছেন, চলচ্চিত্র পরিচালনার পথে পা বাড়াননি, যদিও অভিনয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল না। এসময়ে রমাপ্রসাদ বণিকই ছিলেন একমাত্র 'ভার্সাটাইল'। থিয়েটার, ফিল্ম, সিরিয়ালে তাঁর সমান আগ্রহ ও দক্ষতা কিন্তু ছবি পরিচালনা করেননি। দেবাশিস মজুমদার সম্প্রতি কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করেন। এই সময়পর্বে সর্বাগ্রে নামোল্লেখ করতে হয় অঞ্জন দত্তের। তিনি গান ও সিনেমা, টেলিফিল্মের জন্য বেশ কিছুদিন মঞ্চ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু আবার সগৌরবে ফিরে এসেছেন 'গ্যালিলিওর জীবন' বা 'অবনী অপেরা'য়। 'গ্যালিলিওর জীবন'-এর সমালোচনায় প্রাবন্ধিক লিখেছেন—"তোমার এই পুনরাগমন খুবই জরুরি ছিল।" [পৃ ৩৭] মাঝখানে অঞ্জন দত্ত টেলিভিশনে 'চিত্রায়িত নাট্য' সিরিজে অনেকগুলি ক্লাসিক নাটক উপহার দিয়েছিলেন। অনেকগুলি ভালো টেলিফিল্মও তৈরি করেছিলেন। গোবিন্দ নিহালনিও এই কাজটি করেছেন। পরে কলকাতা থিয়েটারের প্রথম সারির পরিচালক শ্যামানন্দ জালান বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' নাটক, দিব্যেন্দু পালিতের 'প্যান্টোমাইম' গল্পটি নিয়ে ছবি করার চেষ্টা করেন।

বর্তমান সমাজে তিন বিশিষ্ট নাট্যজনকে আমরা ছবির কাজ করতে দেখি। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ব্রাত্য বসু। তিনি মেইনস্ট্রিমের ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। একেবারেই আর্টফিল্ম নয়, পুরোদস্তুর সিনেমা। যেমন 'রাস্তা', 'তিস্তা' চলচ্চিত্রের কথা বলা যায়। রাজনীতি ও মন্ত্রীত্ব সামলেও থিয়েটার করে যাচ্ছেন দাপটের সঙ্গে। অপর দুজন সুমন মুখোপাধ্যায় ও দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। দেশ-বিদেশের ফিল্ম ও থিয়েটার সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান

রয়েছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের; যাকে 'এক্সপোজার' বলে। সুমনের 'শেষের কবিতা', 'হারবার্ট', 'চতুরঙ্গ', 'মহানগর ডটকম', 'কাঙাল মালসাট' জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'নাটকের মতো' সিনেমা নজর কেড়েছে। কেয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। অসাধারণ দৃশ্য নির্মাণ ও বিন্যাস, সম্পাদনা, সঙ্গীত, রিয়াল স্পেসের ভার্চুয়াল বা থিয়েটার স্পেসে রূপান্তর, সর্বোপরি অভিনয় মন কেড়েছে। পাওলি দাম, রূপা গাঙ্গুলি, রজতাভ দত্ত, সুজন মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সায়নি ঘোষ, ব্রাত্য বসুর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সবকিছু। প্রাবন্ধিকের অভিমত—"বাংলা থিয়েটার নিয়ে, থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে তার জীবনের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা সাধনা সংগ্রাম এবং আত্মঘাতী যন্ত্রণা নিয়ে এমন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি কেন এতদিন, তাই ভাবি।" [পৃ. ৩৯] এই থিয়েটারের মানুষ নিয়ে সিনেমা করা থিয়েটারকর্মী হিসাবে প্রাবন্ধিকের যেমন গর্ববোধ হয়, তেমনই অশ্রুস্মরণও। চরিত্রের নাম, নাট্যদলের নাম, চরিত্রের সাদৃশ্যে পাল্টে নেওয়া প্রাবন্ধিক মেনে নিতে পারেননি। কারণ এটি জীবনীভিত্তিক কাহিনি। কেয়া হয়েছে খেয়া, অজিতেশ হয়েছে অমিতেশ, দলের নাম নান্দীকার হয়েছে নটকার, রুদ্রপ্রসাদ থেকে প্রসাদ—সমস্ত সাফল্যের পরেও কিছু বিস্বাদ থেকে যায়। প্রাবন্ধিক তাই বলেছেন—"কিন্তু হাততালি দিতে গিয়েও যে হাতের পাতাদুটো কাছাকাছি এল না, দেবেশই আটকে দিলেন।" [পৃ ৩৯]

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মূলত দেখাতে চেয়েছেন একজন থিয়েটারওয়ালা ও চলচ্চিত্র পরিচালকের হয়ে ওঠা, থিয়েটারওয়ালাকে তিলতিল করে নির্মাণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় অর্থাৎ রাতারাতি থিয়েটারের পরিচালক হলেন এমনটা নয়। সিনেমাওয়ালা রাতারাতি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। তিনি আগে এই জগতে আলোচিত নাও হতে পারেন। এমন কিছু দৃষ্টান্ত প্রাবন্ধিক রেখেছেন। থিয়েটার ও সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায় অনেককেই। অনেক থিয়েটারওয়ালা সিনেমা করেছেন। কেউ সফল হয়েছেন, কেউ বা হননি। এরকমই একটা পরম্পরা, ইতিহাসকে প্রাবন্ধিককে তুলে আনতে দেখি এই প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাখ্যা থিয়েটার ও সিনেমা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে।

৪০৪.৪.৫.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। একজন থিয়েটারওয়ালা এবং একজন সিনেমা পরিচালক কীভাবে থিয়েটার ও সিনেমা জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হন তা প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো।

২। একজন থিয়েটারওয়ালা সিনেমায় পরিচালক হিসাবেও সার্থক কি না উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৩। 'থিয়েটারওয়ালার সিনেমা' প্রবন্ধটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য পরিস্ফুট করো।

৪০৪.৪.৫.৪ : গ্রন্থপঞ্জি

১। নাটুকিটাকি, বিভাস চক্রবর্তী, ২০১৮, কারিগর।

২। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার, ড. শেখর সমাদ্দার(সম্পাদনা), প্রয়াগ প্রকাশনী, ২০১৯।

৩। থিয়েটার যা দেখা তা নিয়ে লেখা, বিভাস চক্রবর্তী, প্রতিভাস, ২০১৫।

ডিএসই-৪০৪

বিশেষ পত্র—নাট্য প্রবন্ধ

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১

'থিয়েটার নিয়ে' : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে এক বিশাল সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে। এসময় বহু সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের শরিক হয়ে বাংলা থিয়েটারকে বাঁচানোর অদম্য আগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের পথ চলা শুরু হয়। কিন্তু অচিরেই গণনাট্য সংঘের প্রধান অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে যান। আবার অনেকে গণনাট্য সংঘের উদাসীনতা, শিল্পীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষায় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে যান। গণনাট্য সংঘ চাইলেই তৎকালীন নাট্যশিল্পী, যারা বাংলা থিয়েটারকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর লড়াই করে চলেছে, তাদের ভাবনা-চিন্তা ও দুঃসাহসিকতাকে নিজেদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে ভাঙন রোধ করতে পারত। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। তাই সংঘ ভেঙে তৈরি হয় ছোট ছোট গ্রুপ থিয়েটারের দল। যেমন বহুরূপী, এল.টি.জি., নান্দীকার ইত্যাদি।

এই গ্রুপগুলোর দিকে চোখ ফেরালেই দেখা যায় তৎকালীন খ্যাতনামা নাট্য ব্যক্তিত্ব, নাট্য পরিচালক এবং নাট্য অভিনেতারাই ছিলেন গ্রুপগুলোর প্রধানতম কান্ডারী। সেইসব ব্যক্তি শিল্পীদের শিল্প ভাবনাকে রূপ দেবার জন্যই গ্রুপগুলোর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সহজ কথায় বললে, একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছিল। যদিও সহযোগী হিসেবে অনেকেই পাশে থাকতেন। নাট্য গ্রুপগুলোতে অনেক গুণী মানুষের সমাবেশ ছিল, কারণ গ্রুপের সংখ্যা তখন হাতে গোনা যেত। সবাই তখন ডিরেক্টরসথিয়েটারকে মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন পরিচালকেরা।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থিয়েটার গ্রুপদলগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হলো। নাটক নিয়ে নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। কিন্তু এই গ্রুপগুলো তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে কোনও উদ্যোগ নিল না। তারা ভুলে গেল থিয়েটার তো একা একা করা সম্ভব নয়। অনেকের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই একটি প্রযোজনাকে সুন্দর শিল্পসম্মত রূপে দর্শকদের সামনে হাজির করা যায়। এখন এই যে অনেক তরুণ তরতাজা যুবক, তাদের ভবিষ্যৎ কী? শুধুই কী তারা ভালোবেসে থিয়েটার করবে? থিয়েটার কী তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে? নাকি প্রতিভাশীল ব্যক্তির ছত্রছায়ায় তারা তাদের জীবন-যৌবন বিলিয়ে দেবে। এসব নিয়ে গ্রুপগুলোর কোন মাথাব্যাথাই ছিল না। অপেশাদার পার্টটাইম থিয়েটার কর্মীকে দীর্ঘদিন ধরে রাখবার, গ্রুপের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর, পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য কৌশল পরিবর্তনের, সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যম, সিনেমার হাতছানি থেকে থিয়েটারের আত্মরক্ষার জন্য

কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাবে সেসব নিয়ে কারও কোন চিন্তা ভাবনাই ছিল না। তাই গ্রুপগুলোর মধ্যে ভাঙন লেগেই থাকত। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আদর্শ বোধের লড়াই প্রতিনিয়তই ঘটতে লাগল। যদিও এর মধ্যেও কিছু নাট্য গ্রুপ ও নাট্য ব্যক্তিত্বের কর্মপ্রয়াসে কিন্তু ভাটা পড়েনি। তারা চেষ্টা করে চলল থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য। তারা নাট্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থিয়েটার কর্মীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করল। আলো, মঞ্চ, সংগীত নিয়ে পরীক্ষার জন্য গুণী শিল্পীদের থিয়েটারের সাথে সংশ্লিষ্ট করল, বিদেশী নাটকের রূপান্তর সাধন করে সফল মঞ্চায়নের উদ্যোগ নিল। নাট্য আলোচনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য নাট্য পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করল। শিক্ষিত তরুণ-তরুণী আর দর্শকদের থিয়েটারমুখী করে তুলবার জন্য উদ্যোগী হল। এরকমই একটি নাট্য গ্রুপ নান্দীকার। প্রথমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরলস প্রচেষ্টায় নান্দীকার তার যাত্রা শুরু করে। সফলতার সঙ্গেই গ্রুপের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একের পর এক মঞ্চস্থ করে যুগান্তকারী সব প্রযোজনা। কিন্তু দলের মধ্যে মতদ্বন্দ্বকে তারাও পাশ কাটিয়ে যেতে পারল না। তাই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দল ছেড়ে চলে যেতে হলো। আর তখন থিয়েটারের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে যোগদান করা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত একপ্রকার বাধ্য হয়েই নান্দীকারের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ব্যক্তিগত অচরিতার্থতা, একাকীত্বময় জগতে আনন্দ খোঁজার জন্য যে মানুষটি থিয়েটারের সঙ্গে, নান্দীকারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন তাঁর হাতেই এসে পড়ল যাবতীয় দায়-দায়িত্ব।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর নান্দীকারকে নিজের মতো করেই গড়ে তুলতে চাইলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কিন্তু তৎকালীন অন্যান্য নাট্য ব্যক্তিত্বদের থেকে একটু ভিন্ন পথে হাঁটলেন তিনি। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সংগঠনের ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। দলের সবার সাথে পারস্পরিক বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে নান্দীকারের প্রতি দলের সদস্যদের ভালোবাসা তৈরি করলেন। সবার আনন্দ-মুক্তির ঠিকানা হয়ে উঠল নান্দীকার। সরকারি অর্থ সাহায্যের জন্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ছুটলেন দরজায় দরজায়। যৎসামান্য সাহায্য জুটল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য যতটুকু পারিশ্রমিক পারা যায় হাতে তুলে দিলেন। সবার জন্য নাট্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। প্রয়োজনে দায়ে পড়ে নিজেও নাট্যরূপ দিলেন এবং মঞ্চ অভিনেতা হিসেবে আলো-আঁধারির মঞ্চে নেমে পড়লেন। নান্দীকার এইভাবে একের পর এক সফল প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিল। ঠিক তেমনি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ঐকান্তিক ইচ্ছায় আর দলের ছেলেমেয়েদের অকুণ্ঠ ভালোবাসায় নান্দীকার নিজের ভিত্তিভূমিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যে কর্মপ্রয়াস শুরু হয়েছিল, রুদ্রপ্রসাদ সেই কর্মপ্রয়াসকে আরও বহুগুণান্বিত, বহু শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত করে তুললেন। সেই নান্দীকার আজও টিকে আছে স্বমহিমায় নিজের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বটবৃক্ষ সমান ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় এসে থিয়েটারকে ভালোবেসে, নান্দীকারকে ভালোবেসে নান্দীকারের পরবর্তী প্রজন্ম দেবশঙ্কর হালদার, সোহিনী সেনগুপ্ত, পার্থ প্রতিম দেব, সপ্তর্ষি মৌলিকরা আজ সেই সাধের নান্দীকারকে নব নব সাজে গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রয়াসে সদা নিয়োজিত প্রাণ। নান্দীকারের অভিনীত নাটকগুলো দেখবার জন্য যেকোন হলে গেলেই তার প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যায়। উপচে পড়া ভিড়। টিকিট পাওয়া দুষ্কর। টিকিট না পেলে মাঝে মাঝে মনে হয় কী করতে পারে নান্দীকার? যা বাকিরা পারে না? নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখলে তার প্রমাণ মেলে। আর এসব কিছুর পেছনে আগে যেমন, এখনও তেমনি স্বমহিমায়, সুদৃঢ়ভাবে নান্দীকারের হাল ধরে রয়েছেন চাঁদ বণিক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বাংলা থিয়েটারের তিনি প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তাঁর বোধ ও মেধা থেকে ছিটকে আসা আলোর বিচ্ছুরণে আমরা প্রতিনিয়ত আলোকিত হচ্ছি। নাট্যকর্মী, নির্দেশক,

অভিনেতা, শিশুশিল্পী তৈরি করার কারিগর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। থিয়েটারকে যদি মাতৃমূর্তি ধরা হয়, তবে সে মূর্তির চোখ আঁকার জন্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের তাগিদ বাংলা থিয়েটার অবশ্যই অনুভব করবে। ১৯৬৬ সালে ১৭ জনকে নিয়ে বিভাস চক্রবর্তী নান্দীকার ছাড়ার পর, ১৯৭৭-এ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় দল ছাড়ার পর এবং সবশেষে গৌতম হালদার দল থেকে চলে যাওয়ার পরও নান্দীকার বলীয়ান থেকে যায়, তার প্রাণশক্তি রুদ্রপ্রসাদ। আর তা তিনি অর্জন করেছেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' থেকে এখনকার 'মাধবী' হয়ে 'নাচনী' পর্যন্ত।

নাটকের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা, নান্দীকারের প্রতি জীবন উৎসর্গীকৃত করা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমেই 'ডোডো' আজ মঞ্চের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর অনুরাগ ও অনুরাগিনীর সংখ্যা অসংখ্য তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও দর্শকদের সংখ্যাও অনেক। শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবদিক থেকেই তিনি তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ভাবলে অবাক লাগে বাবার স্নেহাদ্র ছায়া বঞ্চিত একটি শিশু, খুব অল্প বয়সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল ছিন্ন ছোট্ট কিশোর বড়দির শাসনে বেড়ে ওঠা বালক দারিদ্র্য ও আত্মীয়দের অবহেলা অনাদরকে উপেক্ষা করেও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে, দুর্দমনীয় মনোভাব নিয়ে কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট চারাগাছ থেকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের জীবনের এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তা কণ্টকাকীর্ণ। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর টগবগে মন নিয়েই বড় হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয় 'ডোডো। তাঁর বন্ধুভাগ্যও নিজের শিল্পসত্তার পরিস্ফুটনে অনেকখানি সহায়ক। তিনি স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়েছেন জীবন নাটমঞ্চে ও চারদেওয়ালের আলো-আঁধারির রঙ্গনাট্য মঞ্চে।

থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গরা থিয়েটার নিয়েই বাঁচতে চান। থিয়েটারকে অঁকড়ে ধরেই জীবনের স্বপ্ন দেখতে চান। তাদের জীবনের যাবতীয় উত্থান-পতন হাসি-আনন্দ-কান্নার সাথে জুড়ে রয়েছে এই থিয়েটার। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত থিয়েটারই তাদের বাঁচার রসদ যোগায়। থিয়েটারের ঐ চার দেওয়ালের বদ্ধ ঘরে তাদের স্বপ্ন-স্বাধ-আহ্লাদ পূরণ হতে দেখে তারা। নবাগত তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যখন থিয়েটারের সাথে যুক্ত হয় তখন দেখা যায় অনেকেই অভিনয়কে ভালোবেসে আসে। আবার অনেকেই থিয়েটারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অভিনয়টা ভালো মতো শিখে সিনেমা বা টিভি সিরিয়ায়ালের জগতে চলে যেতে চায়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, থিয়েটার মনের গভীরে সেই ভালোবাসাটা তৈরি করে দেয়। থিয়েটারের চরিত্রের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ধরনের রহস্য আছে, যে রহস্য মানুষকে থিয়েটারের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নান্দীকারকে অঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন,স্বপ্ন দেখেছিলেন নান্দীকারকে যথোপযুক্ত একটি নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবেন। বহু বছর থিয়েটারে কাটিয়ে এসে থিয়েটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রুদ্রপ্রসাদ বলেছেন

"একাত্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে পড়েছি, সুতরাং বুড়ো তো বটেই। কিন্তু জীবনে কম্বল ছাড়া অন্য কোনও কোনও বস্তুও থাকে, যা ছাড়ে না বা ছাড়া যায় না। মাঝে মাঝেই দিন শুরু হয় সকাল দশটায়। তারপর দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যে পেরিয়ে যখন 'নান্দীকার' থেকে ফিরি তখন রাত সাড়ে দশটা বেজে যায়। ঘরে ফিরেও আলো জ্বেলে রাখার দায় থাকে কখনও কখনও। সেই প্রহর অসমাপ্ত কাজ থেকে 'অ' মুছে দেওয়ার জন্য সংরক্ষিত থাকে। বয়স হচ্ছে এই অনুভবের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে মনে হয়, দিনে ১৮ ঘন্টা কাজ করেও আমার সম্পূর্ণ বেঁচে থাকায় কোথাও একটা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। কখনও কখনও সত্যিই এমন মনে হয়, যদি হঠাৎ দিন পাঁচ-সাতের জন্য কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারতাম অথবা ঘড়ির কাঁটাকে মহাপ্রভু না ভেবে, সকাল দশটাতেই না বেরিয়ে একটা দিন যদি স্ত্রীর সঙ্গে নানা ধরনের গল্প করতে পারতাম। কী ভাবনা তাঁর মনের মধ্যেও ঘুরপাক খাচ্ছে তা হয়ত জানা যেত। জানিই তো জীবনের দরজা-জানালাগুলো অন্তত একটুখানি খোলা রাখা দরকার। তা না ঘটলে জীবনটাই

কেমন যেন শিকড়-ছাড়া গাছের মতো হয়ে যায়। কিন্তু কাজের চাপ সেই জায়গাটুকুও ছাড়ে না। কেন ছাড়ে না ? কারণ থিয়েটার এমন একটা অদ্ভুত চরিত্রের শিল্পকর্ম বা অদ্ভুত একটা মানবিক কাজ যা মানুষ আবিষ্কার করেছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক কী করে সেই কাজটা চালিয়ে যেতে হবে তা মানুষ এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।”

রুদ্রপ্রসাদের কথায় আমরা বারবার উল্লেখ পাই, থিয়েটার চালানো অত সহজ কাজ নয়। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে অনেক কিছু। সেট-সেটিংস, মঞ্চ, আলো, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক, আরো কত কিছু। এমনকি অন্যান্য শিল্পকর্মের চাইতে থিয়েটার চালানোর খরচ সবচাইতে বেশি। আমরা যদি অভিনিবেশ সহকারে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে চরিত্রগত দিক থেকে থিয়েটার কিন্তু নশ্বর। অর্থাৎ থিয়েটারে যা আজকে সৃষ্টি হচ্ছে, কাল কিন্তু সেটা থাকবে না। অর্থাৎ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই যেন কালের একটা থাবা থিয়েটারের শরীরে বসে যাচ্ছে। সুতরাং থিয়েটার করতে যাওয়া মানেই হচ্ছে নিজস্ব কিছু ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করা। সিনেমার মতো কিন্তু এখানে টাকা বিনিয়োগ করার পরেও তা পাওয়া যাওয়া যায় না। কোনও দল যদি আমাদের ছ'মাস ধরে চালাতে হয় তাহলে কিন্তু মনে রাখতে হবে দর্শকদের কথা মাথায় রেখে পেশাদারী যোগ্যতার সঙ্গেই নতুন নতুন উন্নত মানের নাটক কিন্তু নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি থিয়েটার সংলগ্ন যেসব খরচ খরচা আছে সেগুলোও চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আমরা জানি যে, থিয়েটারের দর্শকরা কিন্তু একই ধরনের নাটক বারংবার দেখতে আসেন না। তাদের উদ্দেশ্য থাকে নতুন নতুন নাটক দেখার। এখন তাদের সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে থিয়েটার দলগুলি কেউ কিন্তু বারংবার নতুন নতুন নাটক মঞ্চে নিয়ে আসতে হয়। তার জন্য খরচ খরচার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সুতরাং প্রতিদিনই কিন্তু নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট চালিয়ে যেতে হয়। ফলত দেখা যায় অধিকাংশ দলই আর্থিক সংকটের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এই থিয়েটারটাকে বাঁচানোর জন্য, থিয়েটারের কাজকর্মকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তার জন্য কিন্তু কারও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। দলগুলোকে নিজেদের উদ্যোগেই অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে, থিয়েটারটা চালাতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দলগুলো অর্থসংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় দলগুলো ন্যূনতম পারিশ্রমিক এবং অর্থ জোগাড়ের মাধ্যমে থিয়েটার পরিচালনা করছে। কিন্তু এই সংকটকালীন অবস্থায় থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সমাজ কিংবা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কিংবা ডিসিশন নিচ্ছেন না। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মনে করেন থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। যথোপযুক্ত অর্থের যোগান দিয়ে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে তোলা উচিত।

কলকাতায় পেশাদার নাট্যসংস্থার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং স্টার থিয়েটারের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ যেসব কথাগুলো বলেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়—থিয়েটার যে সংকটের মধ্যে আছে, সেই সংকটকালীন অবস্থা সর্বার্থেই দূর না করে কোনও দল এবং দলের ব্যক্তিবর্গরা মুক্তি আনতে পারবে না। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন—

“সকলেই জানেন ‘স্টার’ থিয়েটার পুনর্নির্মিত হয়েছে। তার পুরনো জায়গাতেই হয়েছে। কিন্তু সেই নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এটাও খেয়াল করতে হবে, সেখানকার চারপাশের থিয়েটারগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটা তো উঠেই গেছে। সেখানে দিব্যি বাজার বসেছে। চালু হয়ে গেছে চীনে খাবারের রেস্তোরাঁও। আমার প্রশ্ন, ‘স্টার’ থিয়েটার চালু করার আগে কি এই হৃদয়হরণ সম্ভাবনার কথা ভাবা উচিত ছিল না? সর্বত্র সকলেই শিক্ষালাভে অবশ্য আগ্রহী হন না। যদি ‘স্টার’ নির্মাণকে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস কাজ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তো সেই সঙ্গে হিসেবি ভাবনায় এটাও ভাবা উচিত ছিল কী করে, কী পদ্ধতিতে ক্ষতি স্বীকার না করে সেখানে নিয়মিত

অভিনয় হতে পারবে ! কারণ এটা সকলেই অনুমান করতে পারেন যে, নিয়মিত ভর্তুকি দিয়ে কর্পোরেশন-এর পক্ষে কোনও থিয়েটার হল চালানো সম্ভব নয়। অথচ সেই লগ্নে অর্থাৎ 'স্টার' নির্মাণের শেষ পর্বে আলোড়িত আহ্লাদের কোনও সীমা ছিল না। আহা ! কি মহান কীর্তিই না স্থাপিত হল, 'স্টার'কে উদ্ধার করা হল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে বিশাল যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা হল (যা শহরের নাগরিকদের দেওয়া অর্থ থেকেই পাওয়া) এবং তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা যে প্রথম থেকেই ম্রিয়মাণ, সে কথা কেউই ভাবলেন না।

উপরের উক্তি থেকে একথা সহজেই বোধগম্য হয় যে, থিয়েটার চালানো সত্যিই এক দুরূহ কর্ম। থিয়েটারকে ব্যবসায়িক হতে হবে অর্থাৎ থিয়েটার চালাতে গেলে অর্থের যোগান যেমন জরুরি হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি থিয়েটার থেকে রুজি রোজগারের অর্থ যদি না উঠে আসে তাহলে থিয়েটার কখনও ভালোমতো পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। রুদ্রপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন যে কোনও একটি নাট্যদল এই স্বপ্ন নিয়েই দল গড়ে যাতে তারা বছরে অনেকগুলো নাটক দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে। একদিকে যেমন বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়, ঠিক তেমনি অন্যদিকে থিয়েটারের নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে থিয়েটার শিল্প মাধ্যমটার উন্নতি করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই থিয়েটার চালাতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় হচ্ছে অর্থ। তাই থিয়েটারকে ব্যবসায়িক করার পক্ষপাতী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশেও অনেক পেশাদার থিয়েটার বর্তমান ছিল। ব্যক্তিগত অনুগ্রহেই সেই থিয়েটারগুলো টিকে ছিল। কিন্তু একটা সময় সাহেবরা সেই থিয়েটারগুলোর প্রতি অনাগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। একদিকে মাথার ওপর কারও হাত না থাকায় অন্যদিকে নিজস্ব সংকটে থিয়েটারকে মরে যেতে দেখলাম আমরা। যদিও আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক মানুষজনেরা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারলেন না যে, থিয়েটারের এই মাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, তার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক সহায়তা করতে হয়। প্রসঙ্গত রুদ্রপ্রসাদ বিদেশের থিয়েটার এবং আমাদের দেশের থিয়েটারের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তিনি জানিয়েছেন, একবার নান্দীকার জার্মানির বন শহরে গিয়েছিল নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করতে, যেখানে তারা অভিনয় করেছিল তার নাম ছিল 'থিয়েটার কমার্সপিয়েল'। রুদ্রপ্রসাদের অভিজ্ঞতা ছিল বাংলায় সর্বমোট চল্লিশটা আলো নিয়ে 'চোখ গেল' নাটকের অভিনয় করার। যদিও সেই চল্লিশটা আলো নিয়ে এই নাটকে ঝড়ের দৃশ্যে অসাধারণ কান্ড ঘটাতে পেরেছিলেন তাপস সেন। কিন্তু বন-এর হলে যখন নান্দীকার অভিনয় করতে গেল, তখন দেখা গেল সেখানে আলো রয়েছে সাড়ে পাঁচশো। যেখানে নান্দীকারে তাপস সেন ত্রিশটা আলো ব্যবহার করে ঝড়ের দৃশ্য উপস্থাপনা করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে বন-এ গিয়ে সেই ঝড়ের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন চারশোটা আলোর ব্যবহারে। সেদিন ওই চারশো আলোর ব্যবহারে মঞ্চে দর্শকরা যথার্থ অর্থেই সুনামি দেখেছিলেন। প্রসঙ্গত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত উল্লেখ করেন বন-এর ঐ হলটায় টেকনিশিয়ান আছেন ৮১ জন। তারা সবাই কিন্তু পূর্ণ বেতনের পেশাদার কর্মী। সেই কর্মীবাহিনী সবসময়ই নাটক উপস্থাপনার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সহযোগিতাতেই নান্দীকার সেদিন মোটা তেরপলের মতো কাপড় আর সেই কাপড়ের ভাঁজে ও রঙের দ্বারা গোটা স্টেজটাকেই সাজিয়ে তুলেছিল একটি মরু অঞ্চলে, কারণ নাটকে বলা ছিল বীরভূম অঞ্চলের একটি শুকনো মাটির কথা। হলে দেখা যায় ওই বেতনভুক কর্মচারীদের সহযোগিতাতেই নান্দীকার সেদিন যথোপযুক্তভাবে মঞ্চসজ্জা করতে পেরেছিল। বিষয়টি থেকে একথা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, আমাদের দেশের থিয়েটার কর্মীদের কাছে উপকরণের সংখ্যা কম। কিন্তু বিদেশে উপকরণ প্রচুর। আমাদের কাজ করতে হয় স্বল্প সংখ্যক উপকরণ আর উপাদান দিয়ে। আর তা দিয়েই আমরা একের পর এক ফুটিয়ে তুলি

নাটকের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্য, আলো যা দেখে বিদেশের লোকজনের কপালেও চিন্তনের বলিরেখা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ওই হলে অভিনয় করার সময় জানতে পারেন ওঁরা 'থিয়েটার কমার্সপিয়েল'টা কিন্তু বন্ধ করে দিতে চাইছে। কারণ ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটিও তার আর্থিক ক্ষতি বহন করতে পারছেন না। অর্থাৎ আর্থিক সংকট থিয়েটারের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতেই কিন্তু জুড়ে আছে। যদিও মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের দেশে যেখানে একটা শহরে থিয়েটারের সংখ্যা হাতে গোনা, ঠিক তেমনি বিদেশে এক একটা শহরে থিয়েটারের সংখ্যা কিন্তু কুড়ি থেকে ত্রিশটা। তার ভেতরে একটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলেও থিয়েটারের দিক থেকে বিশাল কোনও ক্ষতি হয়ে যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে হাতেগোনা কয়েকটি থিয়েটারের মধ্যে আর্থিক সংকটে যদি সেই থিয়েটারগুলোও বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বাংলা থিয়েটারের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তাই থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন থিয়েটারকে উপযুক্ত পেশাদারী সাহায্য করা। এখন এই পেশাদারী সাহায্য মানে কোনও একটি থিয়েটার সংস্থাকে মাসে যৎসামান্য টাকা দেওয়া নয়, বরং এমন অর্থ সাহায্য করা, যাতে সেই থিয়েটারটা স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রসঙ্গত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানান—

এখানেই অর্থাৎ পঞ্চভূতের মূলে ঠেলা লাগার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। নান্দীকারকে যদি মাত্র কুড়িজন থিয়েটার কর্মীকে নিয়ে একটা থিয়েটার কোম্পানি করতে হয়, তাহলে তাদের তো নিয়মিত মাইনেও দিতে হবে। আজকাল যে-কোনও সাধারণ কাজে অর্থাৎ মাস্টারি, কেরানির কাজ বা অন্য ধরনের কাজে কমপক্ষে আট থেকে দশ হাজার টাকা বেতন পাওয়া যায়। আট হাজার করে ধরলেও মাসে এক লক্ষ আট হাজার টাকা শুধু কর্মীদের বেতন দিতেই খরচ হবে। এর ওপর থাকবে প্রতিটি শো-এর জন্য নির্ধারিত খরচ। যদি কেউ কৌতুহলী হন, তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন, কলকাতার নাট্য সংস্থাগুলোর অধিকাংশই প্রতি শো-তে কত টাকার ক্ষতি স্বীকার করে। সেই পরিমাণ কোথাও পাঁচ হাজার কোথাও হয়ত দশ হাজার, যাবতীয় খরচ মিটিয়ে লাভের কোনও প্রমাণ নেই। এমন সংকটে আমাদের সমাজের, সংস্কৃতির অভিভাবকদের কাছে বার বার একই কথা উচ্চারণ করতে হচ্ছে যে, এখন থিয়েটারকে সমর্থন প্রায় 'লিপ সার্ভিস'-এর জায়গায় চলে যাচ্ছে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মনে করেন আমরা যে সময়ে বাস করছি তা চরিত্রে অ্যান্টিথিয়েটার। কারণ সময়টা অসামাজিক। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের চাইতে থিয়েটারের চলার পথ চরিত্রগত দিক থেকে আলাদা। অধিকাংশ শিল্পমাধ্যমে আমরা দেখি ব্যক্তিগত সেন্সিবিলিটির প্রাধান্য। যেমন সিনেমায় অনেক লোকের প্রয়োজন হলেও দেখা যায় একজনের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অনেক মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরিচালক যেভাবে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে চান তার চিন্তা ভাবনাকে অনেকে মিলে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেন। ঠিক তেমনি কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যিনি কবিতা লেখেন তিনি সারা পৃথিবীর ভাবনাচিন্তাকে অর্থাৎ বাস্তবতার সাথে কল্পনার যোগে তাকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চান। কিন্তু থিয়েটার করতে গেলে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে কালেক্টিভ সেন্সিবিলিটি। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যিনি থিয়েটারের নির্দেশক তিনি যেমন কোনও চরিত্রের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা ব্যক্তিগত আবেগ, আনন্দকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন, ঠিক তেমনি সেটা যিনি ফুটিয়ে তুলবেন অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রী তারাও চরিত্রের অন্তর্গত দুঃখ যন্ত্রণা যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করবেন। ঠিক তেমনি কোনও একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে গেলে যিনি মঞ্চসজ্জা করছেন তাকেও যথোপযুক্ত উপলব্ধি এবং সচেতন হয়ে কর্ম করতে হয়। এমনকি যিনি মিউজিক করেন তিনিও যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করবেন কোন মুডে কোন মুহূর্তে কোন ধরনের মিউজিক ব্যবহার করতে হবে। আবার আমরা ভালোমতোই জানি যে থিয়েটারটা উপস্থাপন করা হয় কিন্তু দর্শকদের জন্য। ফলে দর্শকদের কাছেও যথোপযুক্ত মাধ্যমে সেটাকে উপস্থাপন করতে

হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে থিয়েটার হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম যেখানে কালেক্টিভ সেন্সিবিলিটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। থিয়েটার উপস্থাপনার সময় এটা ভাবাও জরুরি হয়ে পড়ে যে, আমাদের সমাজ নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাময়। তা একদিকে যেমন ভোগবাদে আচ্ছন্ন আবার অন্যদিকে দেখা যায় সমাজে দিন দিন মানুষের ছলনা, লোভ, ক্রাইম, বিবাহবিচ্ছেদ এসব কিছু বেড়েই চলেছে। এমনকি টেলিভিশনের সিরিয়ালগুলো এবং সিনেমাতেও প্রত্যহ দেখান হচ্ছে খুন-জখমের দৃশ্য। যৌন মিলনের দৃশ্যকেও সুচারুভাবে টেলিভিশনের পর্দায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যৌন আচরণকে উস্কে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা নৃত্যগীত এবং সংলাপের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর সেসব দেখেই বর্তমান সমাজের মানুষের মধ্যেও সেইসব কদর্য রূপগুলো আমরা ফুটে উঠতে দেখেছি। দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা সুযোগ পেলে জোর করে প্রেম বা বন্ধুত্বে পারদর্শী হয়ে উঠছে। আর নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কখনও কখনও ধর্ষণের কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারাও কিশোরীকে খুন করতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের চতুর্দিকে চোখ ফেরালেই এইসব কদর্য দৃশ্য আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই। যদিও এই ইনফরমেশন এন্ড কালচার ইন্ডাস্ট্রিকে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। সমাজ জীবনের সাথে, আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে, বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে, এগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এমন ভাবে মিলে মিশে গেছে যে, এ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। তাই একথা সত্য যে, মানুষ ধীরে ধীরে তার সামাজিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অসামাজিক হয়ে উঠছে। আমরা শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির কথাই ভাবছি এবং অন্যকে দমিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে তুলতে চাইছি।

সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি, আমাদের বেড়ে ওঠা, চলাফেরা, সমস্ত কিছুই যেন দ্রুততার সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন আমাদের চাহিদা ছিল কম। যৎসামান্য জীবনধারণের উপকরণ নিয়েই আমরা বড় হয়ে উঠেছিলাম। তখন মানুষের মধ্যে এত সুখ স্বাচ্ছন্দ, এত বৈজ্ঞানিক উপাদান-উপকরণের ভিড় ছিল না। জীবনটা অনেক সুখকর ছিল। কিন্তু দিনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে, সময়ের সাথে সাথে অবস্থা পাল্টাতে শুরু করেছে। এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে যেখানে বন্ধুদের মোবাইল ফোন আছে আর বাবার সন্তানকে মোবাইল কিনে না দেবার অসামর্থ্যের জন্য পুত্রকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখা গেছে। তাই এক অসামাজিক সময়েই আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বড় হয়ে উঠতে হচ্ছে।

উপরিউল্লিখিত উক্তি থেকে একথা সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, বর্তমান অসামাজিক সময় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেই আমরা ভালোবেসে যারা থিয়েটার করতে আগ্রহী, তারা থিয়েটারে এসে অংশগ্রহণ করে থিয়েটার কর্ম করে যাচ্ছি। এখন এই রকম পরিস্থিতিতে কোনও রকম ভাবেই আমাদের হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বরং স্বপ্ন দেখতে হবে আরও দ্বিগুন পরিমাণে। পরিশ্রম করতে হবে যতই তা অ্যান্টিথিয়েটারের সময় হোক না কেন। আমাদের সেই সত্যটাকে উল্টে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, না আমরাও পারি—আমাদের মধ্যেও সে ক্ষমতা আছে। স্বল্প ক্ষমতা দিয়েও আমরা থিয়েটার কর্মটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, কঠোর এবং একনিষ্ঠ পরিশ্রমের দ্বারাই আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে আমাদের থিয়েটার সত্যিই শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় মাধ্যম। আমরা আমাদের স্বপ্ন, সৌন্দর্য, আনন্দ—সবটাই ফুটিয়ে তুলতে পারি থিয়েটারের ওই কিছুক্ষণের অভিনয়ের মাধ্যমে। আমরা থিয়েটারে অভিনয়ের মাধ্যমেই চরিত্রগুলোকে তাদের সামগ্রিকতা নিয়েই ফুটিয়ে তুলতে পারি, যেখানে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণাকে বাস্তবোচিত ভাবেই দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজনীয় যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে থিয়েটার মঞ্চে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে কিংবা হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মাধ্যমে চরিত্রের

অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলে, তিনি কিন্তু যথোপযুক্ত বাস্তবভাবেই চরিত্রটাকে রূপদান করার চেষ্টা করেন। যেখানে সিনেমায় দেখা যায় চরিত্র চোখের জল বের করে আনার চেষ্টা করে গ্লিসারিনের সহায়তায়। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিটা শোতেই প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে থিয়েটারে। আর থিয়েটারের দর্শকরাও কিন্তু বলতে বাধ্য হন যে, আমি আমার ভালোলাগার চরিত্রটির চোখের জল, তার হত্যার দৃশ্য কিন্তু আমি সামনা সামনি দেখতে পাই। অর্থাৎ একথা ঠিকই যে, থিয়েটার হলো এমন একটা মাধ্যম যেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের অন্তর্গত দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা সবকিছু উজাড় করে দিতে পারে চরিত্রের মাধ্যমে। চরিত্রের অন্তর্গত সৌন্দর্য উপলব্ধি করে সেই চরিত্রের ভেতর দিয়েই নিজের ব্যক্তিগত জ্বালা-যন্ত্রণাকে উজাড় করে দিতে পারে অভিনেতা—অভিনেত্রীরা, যেটা দর্শকরা উপলব্ধি করতে পারেন তাদের সামনা সামনি বসেই। দর্শকরাও তাদের ভালোলাগার চরিত্রটাকে, তাদের চোখের জল সামনা সামনি দর্শন করতে পারেন। তাই থিয়েটার হচ্ছে একটা জীবন্ত মাধ্যম। এই থিয়েটারকেই আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে আমাদের এই চরম ক্রাইসিসের সময়েও। আমাদের নিজস্ব উপলব্ধির জগতে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে থিয়েটার এমন একটা মাধ্যম, যা আর পাঁচটা মাধ্যমের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা, যে মাধ্যমকে আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি আর উপলব্ধির জগত দিয়েই আরও গৌরবোজ্জ্বল করতে পারি। যখন সবাই এটা ভাবতে শুরু করবেন, তখন আর দর্শক জোগাড় করবার প্রয়োজন পড়বে না, যার ভালো লাগবে সেই দর্শকই গিয়ে তার আত্মীয় পরিজনদের জানাতে পারবেন যে থিয়েটারটা দেখে আসুন। আর এভাবেই হয়তো বাংলা থিয়েটার বেঁচে যাবে এবং এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়াটাও বজায় থাকবে।

থিয়েটারকর্মীদের মাঝে মাঝেই কিছু কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কেউ কেউ তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনারা থিয়েটার কেন করেন? কিসের জন্য করেন? থিয়েটার আপনাদের কি দেয়? এ প্রসঙ্গে বলা যায় থিয়েটার হচ্ছে এমন এক মাধ্যম যা সমাজের দরবারে জীবনের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচে এবং মানুষের মানবিক বিদ্যার চর্চাগুলো থিয়েটারের মাধ্যমে করা সম্ভবপর হয়। এক দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা যাকে বলি ইমোশন, ইন্টেলেক্ট, ইমাজিনেশন, ইন্টিউশান, টুগেদারনেস, ইণ্ডিভিজুয়ালিটি—সবকিছুরই যথোপযুক্ত জ্ঞান থিয়েটারের মাধ্যমে লাভ করা যায়। আরিয়ানে মুশকিন থিয়েটারে—যে মানবিক গুণগুলোকে প্রার্থনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ জানান "আই অ্যাম ফুলিশ, ট্রান্সফর্ম মি। আই অ্যাম ভালগার, এলিভেট মি। আই ফিল ওল্ড অ্যান্ড স্টেল,মেক দ্য চাইল্ড ইন মি লিপ আপ। আই হ্যাভ বিন রিক্রুটেড বাই হেট্রেড, আনলিশ অল দ্য ফোর্সেশ অফ লাভ।" থিয়েটার মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিকে যেমন মঞ্চায়িত করে, যেমন নাটকের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাস্তব ঘটনাসমূহকে প্রত্যক্ষ করি, ঠিক তেমনি থিয়েটার মানুষকে বাঁচার স্বপ্নও দেখায়। এমনকি মানুষের মানবিক গুণগুলিও যেন বিকশিত করে তোলে। প্রসঙ্গত রুদ্রপ্রসাদ ব্যক্তিগত একটি উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে একজন নাট্যকর্মী যিনি তার নিজের জীবনের সবটুকুকে উজাড় করে দিয়েছেন থিয়েটারের জন্য, তিনি থিয়েটারের মাধ্যমে জীবনের সবকিছুই পেতে পারেন, তার জীবনের যাবতীয় অপ্রাপ্তি পূর্ণতায় রূপ পায় থিয়েটারের মাধ্যমে—

সেই মেয়েটির বুক খালি করা গল্প আমাদের যখন একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, তখন তারই একজন বন্ধু তাকে বলেছিল—'তুই একেবারে ঢং করে সব কথা বলে ফেললি কেন ?' তার উত্তরে সেই হাহাকার করা মেয়েটি বলেছিল—'কী জানি, অত আলো আর অত লোকের মাঝখানে কথা বলতে বলতে আমার মনে হল এখানেই বোধহয় নিজের সব কথা বলে ফেলা যায়।' অনেক পণ্ডিত সাহেব অনেকভাবে থিয়েটারের সংজ্ঞা শুনিয়েছেন, আমরাও ভক্তিভরে শুনেছি। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই, সেই যৌনকর্মী মেয়েটির চেয়ে ভালোভাবে

বলা থিয়েটারের সংজ্ঞা আমি কখনও শুনিনি। মেয়েটির শান্ত, স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম তার মনের স্মৃতির মন্তাজ চলছে। সেই মুহূর্তের সময় ছুঁয়ে কথা বললেও সে সেখানে নেই। যেভাবে যা বলেছিল, সেটাই জীবনের আংশিক প্রতিচ্ছবি এবং সেটাই থিয়েটার। থিয়েটারের কাজই তো অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পর্শের মতো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একজন যৌনকর্মী, আমাদের সঙ্গে তার কদিনেরই বা আলাপ। কিন্তু নিজের বুক বিদীর্ণ করে ফেলা জীবনকাহিনি সে দ্বিধাহীন ন্ট্রে বলে ফেলল। বুড়ো হয়েছি এবং অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে তখনই কেঁদে ফেলিনি। কিন্তু বিষন্ন হয়ে থেকেছি দীর্ঘক্ষণ, অবশ্যই নিজেকে লুকিয়ে রেখে। আমার মনে হয়েছে, তখন এবং এখনও যে, এটাই থিয়েটারের জয়। এই থিয়েটারের স্বাদ জীবনে পেয়ে গেছি বলেই আর ছাড়তে পারিনা। হ্যাঁ, থিয়েটার করতে বিস্তর কষ্ট পেতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কষ্ট পেলেই থিয়েটার ছেড়ে চলে যাব বা কাউকে সুখের কাননে চলে যেতে বলব তা ভাবতেই পারি না। সেখানে তথাকথিত মধ্যবিত্তদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভেণ্ডার, সব্জিবিক্রেতা, রিকশাচালক ও বাড়ির কাজের লোক হিসেবে কাজ করা মহিলাদের বাচ্চারাও পড়ে। সেখানে আমরা কাজ করতে গিয়েছি। গৌতম একদিন 'বীরপুরুষ' নিয়ে কাজ করবে। বাচ্চাদের বলেছে কবিতাটা মুখস্থ করতে। সেদিন রাতের শেষ প্রহরে বস্তিতে যা ঘটল তাকে মৌলিক আলোড়নও বলা যায়। বাচ্চারা রাত সাড়ে তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে দুলে দুলে 'বীরপুরুষ' মুখস্থ করছে, সেখানকার বাবা-মা সম্প্রদায় তো নিজের চোখকানকে বিশ্বাসই করতে পারছে না, কী হয়েছে, অ্যাঁ? কোনওদিন পড়াশোনা করতে চায় না, আর আজ কিনা শেষরাতে উঠে পড়ছে? পরে তারা শুনে আরও অবাক যে গোটা ঘটনাটা হয়েছে থিয়েটারবাবুদের কথায়। আবার থিয়েটার। ওনলি থিয়েটার ক্যান আনলিশ দেম।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের এই কথা থেকে সহজেই অনুভব করা যায় যে মানুষের মনের আনন্দ তুলে ধরতে পারে থিয়েটার। থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে গতানুগতিক জীবনের থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। মানুষ যেমন আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে তার নিজস্ব জীবন কাহিনি কে বা অন্যের দুঃখকে নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে আর পাঁচজনের কাছে জানাতে, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত ক্ষোভ, দুঃখ ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। যে কথা আর পাঁচজনের সামনে বলা যায়না, যে কথা বন্ধুর কাছেও তুলে ধরা যায় না, সেই কথাটাই হয়তো এত দর্শকের মাঝখানে আরও বাস্তবোচিত করে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়। আর এই কাজটা একমাত্র থিয়েটারই করতে পারে যা অন্য কোনও শিল্পের মাধ্যমে এত জীবন্তভাবে সামনা সামনি দর্শকদের কাছে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই সবদিক থেকেই দেখা যায় থিয়েটার এমন একটা মাধ্যম যে মাধ্যমের দ্বারা মানুষ প্রতিদিন বাঁচতে পারে অর্থাৎ কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও—এই দুর্বিষহ সমাজজীবনের একঘেয়েপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র থিয়েটার। তাই থিয়েটারে মানুষের আগ্রহী হওয়া উচিত বলে রুদ্রপ্রসাদ মনে করেন। থিয়েটার মানুষকে বাঁচার স্বপ্ন দেখাতে পারে বলে যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন মানুষের উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই থিয়েটার কর্মটাকে, থিয়েটার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা। কারণ থিয়েটারের যদি অপমৃত্যু ঘটে তাহলে হয়তো মানুষ গতানুগতিক দিনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, নিজের কথাকে আর পাঁচ জনের কাছে এত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকে হারাবে। তাই সকলের সম্মিলিত প্রয়াস হওয়া উচিত তাকে বাঁচিয়ে রাখা।

প্রবল উৎসাহে, প্রচণ্ড যৌবনের উদ্দীপনায় একসময় রুদ্রপ্রসাদ থিয়েটার করতে মেতে উঠেছিলেন। একসময় থিয়েটারে প্যালা দিতে আসা সাধারণ মানের একজন কর্মী হিসেবে দলে অংশগ্রহণ করলেও আমরা ধীরে ধীরে রুদ্রপ্রসাদকে দেখেছি নান্দীকারের প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশক থেকে শুরু করে প্রধানতম পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই রুদ্রপ্রসাদ ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন বড়দের থিয়েটারের প্রতি

কেন জানিনা তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। বরং তার মনটা ধীরে ধীরে ছোট কচিকাঁচাদের নিয়ে থিয়েটার করবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ লিখেছেন—

সল্টলেকের একটা স্কুলে আমরা প্রত্যেক বছর কাজ করতে যাই। প্রতি বছর ওই স্কুলটাতেই যাই, যাতে বারবার একই জায়গায় যাওয়ার জন্য একটা স্থায়ী কোনও প্রভাব তৈরি হয়, ছাত্রদের মানসিকতা বদলায়। সেই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যারা থিয়েটারে আগ্রহী তারা যে প্রবল খুশিতে জীবনের বৈচিত্রে আলোড়িত হয়ে মানসিক দিক থেকে আরও চাঙ্গা হয় তা তাদের স্কুলের পরীক্ষা-সহ বোর্ডের পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হয়েছে। সচরাচর যে সব ধারণা প্রচারিত, তার উল্টোটাই সত্যি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, থিয়েটার মোটেই ডিসট্র্যাকটিভ নয়, বরং প্রবল আনন্দময় উৎসাহই দেয়। তাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না, তারা আমাদের এই সামান্য আয়োজনের বাইরে থাকে। তারা বড় হতে হতে যে সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে সেটা, সকলেই জানেন বাজারি সংস্কৃতি। আর যে ছোটরা তুলনামূলক ভালো অবস্থায় আছে, অর্থাৎ খেতে-পরতে পাওয়ার সঙ্গে লেখাপড়ার সুযোগও পায়, তাদের ওদের সমাজের অন্য সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা হিংসুটে পরিবেশে মানুষ হচ্ছে। অদূরদর্শী চিন্তায় স্বার্থপর হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় তাদের, তাদের জার্নি হল টুওয়ার্ডস সাকসেস, নট টুওয়ার্ডস অ্যাচিভমেন্ট। এই নাগরিকরা ভবিষ্যতে কোন সমাজ গড়ে তুলবে যারা যথার্থ টুগেদারনেস-এর শিক্ষা পাচ্ছে না। সমবেদনা বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংবেদনশীলও হওয়া প্রয়োজন। এমন শিক্ষা তাদের দিতে হবে যাতে তারা অর্গানিকের সঙ্গে সিন্থেটিকের পার্থক্য বুঝতে পারে। কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া একসঙ্গে কিছু করার প্রেরণা ও শিক্ষা পাওয়া যায় ? ওই যে ইংরেজিতে বলে—আই অ্যান্ড দা ওয়ার্ল্ড—এই বোধটা জাগিয়ে তোলা খুব জরুরি। আমি নিজে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন না হতে পারি, কিন্তু মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ থাকবে না কেন ? কোনও মৌলিক জ্ঞানের সন্ধান আমি দিচ্ছিনা, কিন্তু দেখেছি ভালোবাসা পেলে ছোটরাও অনেক কিছুতে উৎসাহিত হয়, অনেক কিছু করতে পারে। থিয়েটার ছোটদের জন্য অনেক কিছু করতে পারে, আর ভালোবাসা দিলে থিয়েটারও করা যায়। অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ বড়দের মতো ছোটরাও বুঝতে পারে, পেয়ে যায় অনেক আলো, হাসি, গান, হাতুড়ির শব্দ, মুখে মাখার রঙ, কাপালিকের চুল, বীরপুরুষের তলোয়ার, প্রধানত কল্পনা ও বিশ্বাস দিয়ে তৈরি মঞ্চের শরীরে থিয়েটার তৈরি হয়।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ

একক-৬

রঙ্গমঞ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ বিন্যাস :

৪০৪.৪.৬.১ : ভূমিকা

৪০৪.৪.৬.২ : প্রবন্ধের সারাংশ

৪০৪.৪.৬.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪০৪.৪.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.৪.৬.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, আন্তর্জাতিক মানুষ, মানবতাবাদের প্রতিভূ, সাহিত্যিক, সংগীতকার। একজন পূর্ণ মানুষ তিনি। সুখের চেয়েও দুঃখের ভাণ্ডার তাঁর পরিপূর্ণ। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের একটা যুগপর্ব তিনি। বিশ্বে শান্তি-মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য পেয়েছেন সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন, বিশ্বযুদ্ধের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে শান্তির ললিত বাণী প্রচার করেছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের সর্বশ্রেণির, সর্বধর্মের, সমস্ত ভাষার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ সৃজন করেছেন। প্রথাগত শিক্ষার কর্মে রূপান্তরিত করার জন্য শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা। বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা, উপন্যাসে নতুন শ্রেণি, ফর্ম, বিষয় আনলেন, নাটক রচনায় বৈচিত্র্য আনলেন বিষয় ও গঠন সমস্ত দিক থেকেই। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেন, কাব্যের বাঁকবদল হলো আজীবন, বাংলা প্রাইমার লিখলেন, ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অসংখ্য গান লিখেছেন, গেয়েছেন, গানের একটা ঘরানা সৃষ্টি করেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, পত্রসাহিত্য রচিত হয়েছে, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছেন ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলিতে। কখনও আত্মসমালোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। ভার্সাটাইল এই মানুষটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দিয়েছেন অনেক কিছুই। দেশ বিদেশের সমস্ত বিষয়েই তাঁর গভীর পড়াশোনা। বিশ্ব থেকে, ভারতীয় ইতিহাস-পুরাণ থেকে মুঠো মুঠো রত্ন আহরণ করে বাঙালিকে, ভারতীয়কে, বিশ্বকে অকাতরে বিতরণ করেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্গত

'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিরই ফসল। বিচিত্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছেন। সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'সাহিত্যের পথে', চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধের অন্তর্গত 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম', 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'শিক্ষা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট', 'বিশ্বপরিচয়' এবং সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধের অন্তর্গত 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র', 'জীবনস্মৃতি', 'জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' উল্লেখ্য। আত্মস্মৃতিমূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়', 'ছেলেবেলা' অভিনব কলাকৌশলে রচিত। আত্মকথনের ভঙ্গি এতে আছে। ইতিহাস, রাজনীতি সমাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, পরিবেশ, কৃষি, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্য ও জীবনের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে।

৪০৪.৪.৬.২ : প্রবন্ধের সারাংশ

'বিচিত্র প্রবন্ধ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪২ সালে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ গ্রন্থে ১৪টি প্রবন্ধ আছে। যথা—সরোজিনী প্রয়াণ, ছোটোনাগপুর, রুদ্ধগৃহ, পথপ্রান্তে, লাইব্রেরি, নববর্ষা, কেকাধ্বনি, বাজে কথা, মা ভৈঃ, পরনিন্দা, রঙ্গমঞ্চ, পনেরো-আনা, বসন্তযাপন ও পাগল। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি জানিয়েছেন কাব্য দুই ধরণের—শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য অনেকটাই স্বাধীন। 'যাহা উচ্চদরের কাব্য তাহা আপনার সংগীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সংগীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে।' (রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০৯, পৃ ৬৭৯) যেখানে কলাবিদ্যা নিজেই একেশ্বরী সেখানেই তার পূর্ণগৌরব। বরঞ্চ সতিনের সঙ্গে ঘর করতে গেলেই নিজেকে খাটো হতে হয়। কিন্তু দৃশ্যকাব্য অনেকটাই পরাধীন। অন্যের সাহায্য নিয়েই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য দৃশ্যকাব্য তথা নাটক বিশেষভাবে সৃষ্ট।

নাটক চাই, অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই, অভিনয় চাই, মঞ্চসজ্জা চাই, আলো-সংগীত অনেক কিছুর সাহায্য নিয়েই দৃশ্যকাব্য নিজেকে প্রকাশ করে। দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে একথা তাকে স্বীকার করতে হয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন—'আমরা একথা স্বীকার করি না।' (পৃ তদেব, ৬৭৯) প্রসঙ্গক্রমে এনেছেন, সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাউকে চায় না, ভালো কাব্যও তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কারও অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করে থাকি। সে অভিনয়েই কাব্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথই অন্যত্র বলেছেন, প্রকাশই কবিত্ব। অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না সেই কাব্য কবিকে সম্মানিত করেনি। প্রাবন্ধিক অভিনয়বিদ্যাকে পরাশ্রিতা বলেছেন। নাটকের জন্য সে পথ চেয়ে থাকে। শম্ভু মিত্রের 'কাকে বলে নাট্যকলা' প্রবন্ধেও একথা বলা হয়েছে। নাটকের গৌরব অবলম্বনেই অভিনয় বিদ্যা নিজের গৌরব দেখাতে পারে। স্ত্রৈণ স্বামীর মতোই নাটক অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকলে উপহাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। নাটকের ভাবখানা কেমন হবে সে প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমায় যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।' [তদেব, পৃ ৬৭৯]

শেষ পর্যন্ত অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করতেই হয়। কখনো কখনো আত্মপ্রকাশের জন্য সামান্যতম অধীনতা স্বীকার করতে হয়। নাটকের কথাগুলি, সংলাপগুলিই মুখ্য। নাটকের কথা অনুযায়ীই অভিনেতাকে হাসতে হয়, কাঁদতে হয়, দর্শকের চোখে জল আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহা সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র;' [পৃ ৬৮০]

তাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, দৃশ্যপট আশ্রয় করে অভিনেতা দর্শকদের মনে বিভ্রম তৈরি করে নিজের কাজকে সহজ করে তোলে। প্রথমে প্রাবন্ধিক শুধুমাত্র নাটকের ওপর জোর দিলেন, অন্য কোনো উপাদান নয়, তারপর বললেন অভিনয়ের কথা, যেখানে কোনো দৃশ্যপট নয়। দর্শক মঞ্চে এসেছেন অভিনেতার অভিনয় দেখতে। নাট্যকার যে কথাগুলি নাটকে বলেছেন, যে অনুভূতি সঞ্চার করেছেন তার প্রকাশ দেখতে। চিত্রকরের কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনা কৃত্রিম দৃশ্যপট এনে ভাব প্রকাশ দেখতে নয়। এখানে প্রাবন্ধিক শিক্ষিত, পরিশীলিত দর্শকের কথা বলেছেন। যে দর্শক অভিনয় দেখতে এসেছেন তাদের কি নিজের সম্বল সামান্যতমও নেই? বিশ্বাস করে দর্শকের ওপর নির্ভর করার কোনো জো নেই? একথা সত্য হলে টিকিটের জন্য ডবল দাম দিলেও তাদের টিকিট বেচতে নেই। প্রাবন্ধিক দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। 'কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।' [পৃ ৬৮০] দর্শকের সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তির কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুষ্যন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে শকুন্তলার কথাবার্তা শুনছেন। এই আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমাদের সামনে উপস্থিত না থাকলেও আমরা ধরে নিতে পারি মঞ্চে গুঁড়িটা আছে —এটুকু সৃজনশক্তি আমাদের আছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেকের হাবভাব, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে অনুমান করে নেওয়া শক্ত। কিন্তু সেগুলি যখন মঞ্চে দেখতে পাই তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়। এখানে অভিনয়ের মাধ্যমে ভাবটা প্রকাশ করাই মুখ্য, দৃশ্যপট আনা নয়। শকুন্তলার কবিকে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবতে হলে কবি কালিদাসকে সূচনাতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানো বন্ধ করতে হত। তিনি বড় কবি, রথ বন্ধ হলেও কলম বন্ধ হতো না।

রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন, যেটা তুচ্ছ তার জন্য যা বড় তা কেন নিজেকে কোনো অংশে খর্ব করতে যাবে? তাই তিনি বলেন—'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই।' সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হতে পারে না। তাই যখন দুষ্যন্ত ও সারথি একইস্থানে স্থির দাঁড়িয়ে বর্ণনা ও অভিনয়ের মাধমে রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরে নেন যে মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়। তাই আনন্দচিত্তে কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ত্রুটিকে মার্জনা করেন। সেই সঙ্গে নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়ে মঞ্চকেই মহীয়ান করে তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো হতো, তবে ঐ কয়েকটি হতভাগা কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করতে পারত? শকুন্তলা নাটক বাইরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখেনি বলে আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করে নিয়েছে।

প্রাচ্য দেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা—আনন্দ সমস্তই সহজ সরল। কিন্তু বিলাতের অনুকরণে আমরা যে থিয়েটার করেছি তা ভারাক্রান্ত একটি স্ফীত পদার্থ মাত্র, তাকে নড়ানো শক্ত, তাকে আপামর জনসাধারণের দ্বারের কাছে নিয়ে যাওয়াও দুঃসাধ্য। তাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। তাই আয়োজনের ভার জটিল ও অতিরিক্ত হয় বিলাতের অনুকরণে থিয়েটারে। এই জটিলতা অক্ষমতারই পরিচায়ক। তাহলে কি

রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধকে আশ্রয় করে নতুন ধারার থিয়েটারের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন! বাদল সরকার যে তৃতীয় থিয়েটারের কথা বলেন, যে পথনাটকের অবয়ব—রবীন্দ্রনাথ কি পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন? 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ পাঠে আমরা সেই অনাগত সুরই শুনতে পাই। বাহুল্য নয়, অতিরিক্ত সরঞ্জাম নয়, কবি-নাট্যকারের প্রতিভার সাহায্যে অসম্ভব জিনিসও সম্ভবপর করে তোলা যায়। পাঠকও সজাগ থাকবেন, সচেতন থাকবেন, পাঠক শিক্ষিত হবেন। শিক্ষিত অর্থে নাটক দেখে অনেক অব্যক্ত বিষয়ও কল্পনার সাহায্যে নিজের মতো করে ভরাট করে নেবেন। নাটক-অভিনয়-দর্শক-এই ত্রিবেণী সঙ্গমেই দৃশ্যকাব্য তথা নাটক আস্বাদন করা যায়।

৪০৪.৪.৬.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. রবীন্দ্রনাথ থিয়েটার ভাবনার ক্ষেত্রে নূতনের সন্ধান দিয়েছেন—'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো।

২. 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই।'—'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ অবলম্বনে এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার করো।

৩. রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত কোন্ বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাধান্য দিয়েছেন তা যুক্তিসহ লেখো।

৪০৪.৪.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, কোলকাতা ৭০০০১৭।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ

একক-৭

কাকে বলে নাট্যকলা—শম্ভু মিত্র

পাঠ বিন্যাস :

৪০৪.৪.৭.১ : প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৪০৪.৪.৭.২ : প্রবন্ধের সারাংশ

৪০৪.৪.৭.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪০৪.৪.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.৪.৭.১ : প্রাবন্ধিক পরিচিতি

প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ সালের ২২ আগস্ট, কলকাতায়। তাঁর বাবার নাম শরৎকুমার মিত্র, মা শতদলবাসিনী দেবী। জন্মসূত্রে তাঁর নাম ছিল 'শম্ভুনাথ' যদিও পরে তিনি এই নামটি তেমন ব্যবহার করেননি। শম্ভু মিত্র ছিলেন তাঁর মায়ের সপ্তম সন্তান ও মধ্যম পুত্র। হুগলি জেলার কলাছড়া গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষের জমিদারি থাকলেও শম্ভু মিত্র বা তাঁর বাবাও কখনো সেই জমিদারির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁর যখন মাত্র তেরো বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান (১৯২৮)। তার সাত বছর পর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শম্ভু মিত্রের বাবা লক্ষ্ণৌ ও পরে এলাহাবাদে বসবাস শুরু করেন।

প্রবাসে থাকাকালীন পড়াশোনার পাশাপাশি শম্ভু মিত্র নিয়মিত শরীরচর্চা ও আবৃত্তিচর্চা করতেন। প্রথমটির প্রতি বাবার সরাসরি নির্দেশ থাকলেও দ্বিতীয়টি ছিল তাঁর একান্ত আপন মনের খেয়াল। ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। লাইব্রেরিতে গিয়ে সাহিত্য বিশেষত নাটকের বইয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এমনকি ফ্রয়েডের বইও তিনি পড়তেন। সেই সঙ্গে চলছিল আবৃত্তিচর্চার মাধ্যমে স্বরক্ষেপণের বিভিন্ন কৌশল, কণ্ঠস্বরে আবেগ ও অনুভূতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা। পরবর্তী জীবনে নাট্যকার ও নির্দেশক শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যদল 'বহুরূপী'র সকল সভ্যের স্বরক্ষেপণ ও উচ্চারণ অনুশীলনের জন্য কোরাসে আবৃত্তির পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

ভবানীপুর স্কুল ও পরে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। ডিগ্রি অর্জন নয়, বরং জ্ঞানার্জনেই ছিল তাঁর প্রাধান্য। তাই ১৯৩১-এ প্রথম বিভাগে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েও ডিগ্রিলাভ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে তিনি কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেননি।

আবৃত্তিচর্চার অভ্যাস তাঁর বরাবর ছিল। পড়ে ভালো লাগলে মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন অনায়াসে। কবিতা তো বটেই এমনকি গদ্যাংশও মুখস্থ আবৃত্তি করতেন অনেকসময়। রবীন্দ্রনাথের গোটা 'সঞ্চয়িতা' তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল আবৃত্তির সূত্রে। স্কুলে পড়াকালীন 'রঘুবীর' ও 'শকুনি' নামে দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র।

তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯৩৬/৩৭ সাল নাগাদ। থিয়েটারের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকলেও কলকাতার তৎকালীন পেশাদারি থিয়েটার দলে তিনি কিন্তু যোগ দেওয়ার কথা ভাবেননি কখনো। এই সম্পর্কিত অজস্র বিদেশি বই পড়ে যে ধরণের থিয়েটার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতেন তিনি তা তখন বাংলায় ছিল না। তবু জনৈক প্রিয়জনের কিছুটা প্ররোচনাতেই ১৯৩৯-এ তিনি পা রেখেছিলেন 'রঙমহল' থিয়েটারে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের। তারপর 'মিনার্ভা', 'নাট্যনিকেতন', 'শ্রীরঙ্গম' (এখানে তিনি পরিচিত হন কিংবদন্তী অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে), 'কালীপ্রসাদ ঘোষ বি.এস.সির ট্যুরিং কোম্পানি' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল) হয়ে অবশেষে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ'-এ যোগদান করেন ১৯৪২ সাল নাগাদ। ১৯৪৩-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে।

এই কালপর্বটি শম্ভু মিত্রের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময়ই তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' রচনা করেন। এই সময় থেকেই তিনি পেশাদারী মঞ্চের অভিনয়রীতি পরিত্যাগ করে নতুন রীতির সন্ধান করছিলেন। আবার এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা শুরু হয় যা মঞ্চস্থ হয় 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় অনেক পরে, ১৯৬৪-তে।

'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ'-এ থাকাকালীন 'ল্যাবরেটরি', 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' ইত্যাদি বিখ্যাত প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন শম্ভু মিত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'নবান্ন' নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্বও যৌথভাবে সামলেছিলেন তিনি। 'নবান্ন' নাটককে অবলম্বন করেই বাংলায় 'নবনাট্য আন্দোলন' শুরু হয়।

১৯৪৮ সালে শম্ভু মিত্র এই সংঘের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন এবং সেই বছরই জন্ম হল তাঁর নিজের নাট্যদল 'বহুরূপী'র। এই দলের নামকরণ করেছিলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন এই দলের একজন অন্যতম সদস্য। তাদের প্রথম মঞ্চায়িত নাটকটি ছিল তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'পথিক'। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ, বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, মন্মথ রায়, বিজয় তেন্ডুলকর, গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস, নরওয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন প্রমুখের লেখা নাটক তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।

'বহুরূপী'তে প্রযোজিত হয়েছে একাধিক মঞ্চসফল নাটক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'নবান্ন', 'ছেঁড়া তার', 'বিভাব', 'চার অধ্যায়' যা ছিল তাঁদের প্রথম রবীন্দ্রনাটক, হেনরিক ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল' অবলম্বনে 'দশচক্র', 'রক্তকরবী', 'রাজা অয়দিপাউস', 'পুতুলখেলা', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'বাকি ইতিহাস', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলা ঘোড়া', 'চোপ! আদালত চলছে', 'কাঞ্চনরঙ্গ' ইত্যাদি।

শম্ভু মিত্র নিজে যেমন নির্দেশনা দিয়েছেন তেমনই অন্যের নির্দেশনায় অভিনয়ও করেছিলেন মঞ্চে। যেমন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে 'চাণক্য', তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় 'ডাকঘর' নাটকে 'রাজকবিরাজ' ও 'ঠাকুরদা' চরিত্রে এবং 'টেরোড্যাক্টিল' নাটকে 'ম্যাজিশিয়ান' চরিত্রে, শ্যামানন্দ জালানের পরিচালনায় 'তুঘলক' নাটকে নামচরিত্রে, ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ-এর পরিচালনায় 'গ্যালিলিওর জীবন'-এ, শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায় 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকে ইত্যাদি।

সাহিত্যিক সত্তা: ১৯৫৫ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলে সেখানেও একাধিক ছদ্মনামে প্রবন্ধ, গল্প, নাটিকা রচনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর ছদ্মনামগুলির মধ্যে ছিল ক্ষণেশপ্রসাদ দত্ত, সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সত্য গুপ্ত ইত্যাদি। বটুক ছদ্মনামে তিনি লিখেছিলেন 'চাঁদবণিকের পালা'। এই নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ না করতে পারলেও তিনি একাধিকবার এই নাটকটি পাঠ করেছিলেন। এছাড়াও লিখেছিলেন পাঁচটি ছোটগল্প, নাট্যবিষক একাধিক রচনা ('কাকে বলে নাট্যকলা', 'প্রসঙ্গ নাট্য', 'সন্মার্গ সপর্যা')। নাটকের মধ্যে 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'বিভাব', 'ঘূর্ণি', 'গর্ভবতী বর্তমান', 'অতুলনীয় সংবাদ'। শেষ দুটি ছিল তাঁর রচিত দুটি একাঙ্ক নাটক। তিনি অনুবাদ করেছেন একাধিক বিদেশি নাটকের। তার মধ্যে রয়েছে 'ইউজিন ও নিল' নাটকের অনুবাদ 'স্বপ্ন', ইবসেনের 'এ ডলস হাউস' এর অনুবাদ 'পুতুলখেলা', সফোক্লিসের লেখা নাটকের অনুবাদ 'রাজা অয়দিপাউস'।

আবৃত্তিশিল্পী: শম্ভু মিত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন আবৃত্তিকার হিসাবেও। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা 'মধুবংশীর গলি'র আবৃত্তির রেকর্ড আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। এছাড়াও রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তিও রেকর্ড করেছিলেন তিনি।

চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্রের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। হিন্দি চলচ্চিত্র 'ধরতি কে লাল' এর সহকারি পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন তিনি। রাজ কাপুর অভিনীত ছবি 'জাগতে রহো' ও তার মূল বাংলা কাহিনি 'একদিন রাত্রে'-এর পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনাতেও ভূমিকা ছিল শম্ভু মিত্রের। নিজে অভিনয় করেছেন একাধিক বাংলা ছায়াছবিতে। তার মধ্যে 'মানিক', 'শুভবিবাহ', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', 'পথিক' উল্লেখযোগ্য।

পারিবারিক জীবন: ভারতীয় গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন ১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর শম্ভু মিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তৃপ্তি ভাদুড়ীর (পরে তৃপ্তি মিত্র) সঙ্গে। ১৯৪৮ এর ৫ই এপ্রিল তাঁদের একমাত্র কন্যা শাঁওলী মিত্রের জন্ম হয়।

সম্মাননা: শম্ভু মিত্র ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ম্যাগসেসে অর্জন করেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডি.লিট এবং বিশ্বভারতী থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডি.লিট ও দেশিকোত্তম উপাধি।

মৃত্যু: ১৯৯৭ সালে ১৯মে এই জীবন্ত কিংবদন্তী শিল্পীর মৃত্যু হয়।

৪০৪.৪.৭.২ : প্রবন্ধের সারাংশ

আনন্দ থেকে প্রকাশিত শম্ভু মিত্রের 'কাকে বলে নাট্যকলা' গ্রন্থের ব্ল্যার্বে এই প্রবন্ধটির মূল তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। সেই অংশটুকু তুলে ধরতে পারি—কাব্য সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য ইত্যাদি যেভাবে স্বীকৃত কলা, নাট্যকলাকেও কি সেই একইভাবে চিহ্নিত করা যায়? একজন কবি কিংবা কথাকার, চিত্রকর কিংবা নৃত্যশিল্পী যা কিছু সৃষ্টি করেন, তা অনন্যনির্ভর নয়। তাঁদের সৃষ্টি মুখ্যত একক প্রয়াস এবং স্রষ্টা সরাসরি তা পৌঁছে দিতে পারেন পাঠক কি দর্শকের কাছে। কিন্তু নাট্যকলার ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। এখানে নাটক চাই, চাই অভিনেতা-অভিনেত্রী, চাই সাজসজ্জা, দরকার হতে পারে সংগীতেরও। যেখানে এতকিছুর সম্মিলনে তৈরি হয় নাট্যকলা, সেখানে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এই কলার প্রকৃত স্রষ্টা তাহলে কে? সৃষ্টিটাই বা ঠিক কোনখানে? নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটক কতটা নাট্যকলার অংশ, আবার অভিনয়ও কীভাবে নাট্যকলার অবিচ্ছেদ্য অংশ তা যেমন দেখিয়েছেন তিনি, একইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন নাটকে যতটুকু লেখা থাকে তাকে কীভাবে ছাপিয়ে যায় নাট্যকলা। দেখিয়েছেন কীভাবে নাট্যকলা

হয়ে ওঠে অনুভবের সেই অনন্য সঞ্চার, যা অন্য কোনোভাবেই ব্যক্ত করতে পারে না নাটকের অন্তর্লীন ভাব ও সৌন্দর্যকে। লিখিত সংলাপ কীভাবে হয়ে ওঠে জীবন্ত কথোপকথন, চিরায়ত নাটকের সংলাপকে সমকালীন বাস্তবতার তথা দৈনন্দিন কথাবার্তার ছাঁচে কীভাবে ঢালাই করে নেন সার্থক অভিনেতা, মঞ্চসজ্জা ও সংগীতের ভূমিকা নাট্যকলায় কী এবং কতখানি, ভালো নাটকের ভালো অভিনয় কখন আর কীভাবে, মহলার মূল তাৎপর্য কী, নির্দেশকের ভূমিকা কী—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে এই প্রবন্ধটিতে।

ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "জলসাঘর বক্তৃতামালা"র একটা বক্তৃতা দিতে নিয়ে যান শম্ভু মিত্রকে। ১৬ই জুন ১৯৮৮ তে এই বক্তৃতাটি দেওয়া হয় (Jalsaghar oration on music and performing art)। মুখে বলা এই বক্তৃতাটি শ্রী গৌতম হালদারের সহায়তায় ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ করে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯১ এ। প্রাবন্ধিক বলেছেন—"নাটক আর অভিনয়ের যুগ্ম মিলন হলে পরেই তবে সেটাকে নাট্যকলা বলা হয়।" [কাকে বলে নাট্যকলা, শম্ভু মিত্র, আনন্দ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১০] অনেকে নাট্যকলাকে বলে থাকেন Composite art বা সংযুক্ত শিল্প। সেখানে অনেকগুলো শিল্প থেকে উপাদান এনে সংযোজন করে এই শিল্পকলাটি তৈরি হয়। সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য, সঙ্গীতের থেকে নাট্যকলার এখানেই পার্থক্য। তবে গান ও চিত্রকলাতেও মিশ্রত্ব লক্ষ করা যায়। নাট্যকলায় নাটক, অভিনয়, সংলাপ, সঙ্গীত, নির্দেশনা ইত্যাদি নানান উপাদান মিশ্রিত থাকে।

ইউরোপে একটা সময় অভিনেতাকেন্দ্রিক নাট্যরীতির প্রচলন হয়েছিল যেখানে নাটককারের কোনো দরকার ছিল না। একটা কাহিনির সামান্য কাঠামো অবলম্বন করে অভিনেতারা নিজেরাই নিজেদের সংলাপ তৈরি করে মঞ্চের উপরে বলতেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অসংখ্য নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা বেশিদিন টেঁকেনি। কয়েকজন লেখক, কয়েকজন কবি অভিনয়ের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের কাব্যপ্রতিভা বা সাহিত্যিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে নাটক লিখেছেন। সেগুলোও অভিনয়ের মধ্যে টেঁকেনি। আবার এমন কয়েকজন নির্দেশক চেষ্টা করেছেন অভিনেতাদের পুতুল বানিয়ে তার নির্দেশ মতো অভিনয় করাতে। সেটাও টেঁকেনি। আসলে নাটককারের কৃতিত্ব ও নটনটীদের অভিনয় কৃতিত্ব মিলে দর্শকদের একটা গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। তাহলে নাটককার আর অভিনেতা-অভিনেত্রীই কি নাট্যকলার সবটা? নাটককে আশ্রয় করেই তো নাট্যটা তৈরি হয়। তবে কি অভিনয় হোক না হোক—সেটা গৌণ? তাহলে নাট্যকলা বলে আলাদা নাম সৃষ্টি করছি কেন? নাট্যকলা বা নাট্যশাস্ত্র নটনটী সম্পর্কিতই বা কেন? প্রাবন্ধিকের একজন বন্ধু বলেছেন, নাটকে যা লেখা থাকে তা আমরা পড়ে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, মনশ্চক্ষেও সবকিছু দেখতে পাই না, অভিনয় হলে সবটা বুঝতে পারতাম। সেই প্রকাশটাও কি একটা শিল্প নয়?

তবে কি নাটক ছাড়া সব সাহিত্য পড়া মাত্রই বোঝা যায়? রবীন্দ্রনাথের পূরবী, বলাকা, শেষলেখা, পত্রপুট না বুঝতে পারলে কি অভিনয় করে বোঝাতে হবে? অভিনয় কি তাহলে মানে বই-এর মতো? প্রাবন্ধিক প্রকাশ-এর কথা বলেছেন। নাট্যকলাতে এক বিশেষ প্রকাশ হয় যা অন্য কলাতে হয় না। নাটকে যেটুকু লেখা থাকে সেটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাট্যকলা। নাট্যকলায় এমন কিছু অনুভব সঞ্চার করে যা অন্য আর কোনরকমে সঞ্চারিত হয় না। আর তা ভাষার মাধ্যমে, দৈনন্দিন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। লিখিত বর্ণের সীমিত প্রকাশক্ষমতার জন্যই অভিনয়কালে নটনটীরা সেটা পেরিয়ে যান। তাহলে নাট্যকলাটা সৃষ্টি হচ্ছে কখন? সেটা কি শুধু অভিনয়ে? আগেই বলা হয়েছে অভিনেতাকেন্দ্রিক নাট্যরীতি টেঁকেনি। তাহলে সৃষ্টিটা হচ্ছে কখন? মঞ্চসজ্জা? অথচ মঞ্চসজ্জা তো নাট্যকলার একটা অংশ মাত্র। যেমন নেপথ্য সঙ্গীত। এটাও একটা অংশ। অর্থাৎ চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, নিজে নিজেই

একটা শিল্পকলা। নাট্যে ব্যবহৃত হলে তখন আর তার স্বাধীনতা থাকছে না। তারা নাট্যকলার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো নাট্যাভিনয়ের অঙ্গ বা অংশও নয়। তাহলে বাকি থাকলো নাটক আর অভিনয়।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে নাটক আর অভিনয় আলাদা নয়। নাটক তো অভিনয়ের জন্য লেখা একটা বিশিষ্ট শৈলী। নাটক মঞ্চাভিনয়ের জন্যই লেখা। নাটকে থাকে সংলাপ। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সংলাপ বলতে হয়। সংলাপ শুধু চরিত্রগুলোর আবেগ প্রকাশ করার জন্য বা গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নয়। সংলাপে আরো ঢের জিনিস প্রকাশ পায়। হিমশৈলের মতো অনেকটা—ছয় ভাগের একটি ভাগ প্রকাশ পায়, নিচে থাকে অনেকখানি। সেই অনেকখানি প্রকাশ পায় ভালো অভিনয়ে। ভালো অভিনয় নাটকের মধ্যে টেনশন তৈরি করে। নাট্যকলার মূল কথা যে সম্পর্ক-সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কটা কী আর নিজের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কটা কী—এই কথাটাই প্রকাশ পায় নাট্যে। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে আবার কতগুলি আচরণবিধি আছে। মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রকাশ পায় স্বগতোক্তিতে, কখনো বা নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে অভিনয়ে স্পষ্ট করতে হয়। দ্বন্দ্বময় সম্পর্কগুলো গভীরভাবে নাট্যকলায় প্রকাশ পায়। নাট্যকলার মধ্যে নাটককার ও অভিনেতার সম্পর্ক বাইনারি স্টার বা যুগ্ম তারার মতো, পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে চলে।

নাট্যকলায় মহলার ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন প্রাবন্ধিক। মহলা শুধু সংলাপ মুখস্থ করার জন্য নয়, কে, কখন, কোথায় দাঁড়াবে সব তৈরি করার জন্যও নয়। মহলায় একটি চরিত্র অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সম্পর্কের একটা ভিন্নরূপ খুঁজে পায়। নট-নটী উভয়েই একটা আবিষ্কারের মুক্তি পায়। আর দর্শকও যেন নিজেকে আবিষ্কার করে। নাট্যাভিনয়ে কেউ মাস্টারমশাইয়ের মতো বলে দেয় না। প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এইভাবে—নাট্যকলার কেন্দ্রে আছে মানুষ। বিমূর্ত মানুষ নয়, একেবারে রক্তমাংসের বহুস্তরিক এবং বহুপার্শ্বিক মানুষ। এই মানুষ এবং তার সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং নিজের সঙ্গে তার একান্ত গোপন সম্পর্ক। মহৎ নাট্যকলায় প্রত্যেকটি চরিত্রের একটি জীবনদর্শন আছে। তারা একভাবে জীবনকে দেখেছে, দেখছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের এক একটি আলাদা গল্প। সম্পূর্ণ নাটকের একটা গল্প নয়, তা ছাড়িয়ে প্রত্যেকটা চরিত্রই এক একটা গল্পের মতো। এটাতে যে গল্পের একটা অনুভব হয় তা অনেক বড়। জীবনের যে প্রতিফলন, সেটাই গল্পটাকে ধরিয়ে দেয়।

প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন—"প্রত্যেকটি মানুষকেই যদি একটা বিশেষ ঘটনায়, বা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠা একটা আলোয় দেখতে পাই, তখনই কিন্তু আমরা একসঙ্গে যেন সবটা বুঝে নিতে পারি।" (পৃ ৫১)

একটা মানুষ, চরিত্র কী বোঝাতে চাইছে দর্শদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে নির্দেশকের কাজ কী? চলচ্চিত্রের একজন নির্দেশক অভিনেতা কীভাবে একটা কথা বলবে, তা কীভাবে দেখানো হবে তা ঠিক করে দেন। শেষকালে ছবিটা প্রস্তুত হবার পরও সংযোজন-বিয়োজন, পাল্টে দিতে পারেন। কিন্তু অভিনয়ে-মঞ্চনাট্যে এমনটা হয় না, অভিনেতারা যখনই নেপথ্য ছেড়ে মঞ্চে চলে যায় তখন সে নির্দেশকের হাতের বাইরে। সমস্ত চরিত্রগুলো যে যার নিজের মতো তৈরি করে নেয়, নির্দেশকের কাজ কারও ভালো অভিনয়টাকে ভেতর থেকে বার করে আনা। তবে অনেকক্ষেত্রে নির্দেশক গুরুগিরি করতে গেলে অন্যরা তৈরি হলেও নিজের ক্ষতি হয়। কারণ প্রত্যেক অভিনেতাই শিল্পী। উচ্চমানের শিল্পী নিয়েই নির্দেশককে কাজ করতে হয়।

নাট্যকলায় আর একটি বিষয়ের কথা বলা হয়। তাহলো দৈহিক বিভঙ্গ, দৈহিক আচরণ। যেমন অভিনয়ের সময় সুজাতা বুদ্ধের সামনে এসে প্রণাম করছে—তখন ওই প্রণামের একটা ভঙ্গি হয়। বুদ্ধিমান দর্শক তা দেখেই

অনুভব করতে পারবে। প্রাবন্ধিক কথা শেষে জানিয়েছেন, "একটা নাটক যদি হয়—তাতে কী প্রকাশ পায়?" 'রক্তকরবী' নাটক থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন। সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা orchestration তৈরি হচ্ছে। এরকম অনেক জিনিসই তৈরি হয়, যা দর্শকদের সচেতন জ্ঞানে আসে না। কিন্তু অবচেতনভাবে তাদের ভেতরে গিয়ে এগুলো প্রবেশ করে। এরকম চেতন-অবচেতন নিয়ে নানা স্তরে কাজ করে। কত নাড়া দেয় সঙ্গোপনে। তারই নাম দিয়েছেন শিল্পকলা। নাট্যকলা শেষপর্যন্ত শিল্পকলায় উন্নীত হয়। এখানেই সার্থকতা। প্রাবন্ধিক অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে নাট্যকলা কাকে বলে—বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যলার নানান উপাদানের কথা বলেছেন। নাটক, অভিনেতা, সংলাপ, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, সঙ্গীত, চিত্র, সম্পর্ক, প্রকাশ, আচরণ, দৈহিক ভঙ্গি—সমস্তটা মিলেই নাট্যকলা। আর দর্শকের মধ্যে তৈরি হওয়া বোধ বা চেতনার সঞ্চার।

৪০৪.৪.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যকলা কাকে বলে? নাট্যকলার উপাদানগুলি কী কী? কোন্ উপাদানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় এবং কেন-ব্যাখ্যা করো।

২। নাট্যকলায় নাটককার ও অভিনেতার সম্পর্কটিকে প্রবন্ধ অবলম্বনে স্পষ্ট করো।

৩। নাট্যকলা কীভাবে শেষ পর্যন্ত শিল্পকলায় উন্নীত হয় তা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করো।

৪০৪.৪.৭.৪ : গ্রন্থপঞ্জি

১। শম্ভু মিত্র, কাকে বলে নাট্যকলা, আনন্দ, ১৯৯১।

২। বরুণ দাস, অন্যধারার থিয়েটার বিবর্তনের বৃত্তান্ত, ২০১৭, এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৭৩।

৩। শাঁওলী মিত্র, ১৯১৫-১৯৯৭ শম্ভু মিত্র বিচিত্র জীবনের পরিক্রমা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১০, নয়া দিল্লি, ১১০০৭০।

৪। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৬।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ

একক-৮

তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক

পাঠ বিন্যাস :

৪০৪.৪.৮.১ : প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৪০৪.৪.৮.২ : প্রবন্ধের ভাববস্তু

৪০৪.৪.৮.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪০৪.৪.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৪.৪.৮.১ : প্রাবন্ধিক পরিচিতি

বাংলা নাটকের পালাবদলে বাদল সরকার (১৫ জুলাই, ১৯২৫-১৩ মে, ২০১১) পরিচিত এবং জনপ্রিয় মুখ। তাঁর পূর্বনাম ছিল সুধীন্দ্র সরকার। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে টাউন প্ল্যানার বা নগর পরিকল্পক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, ইংল্যাণ্ড এবং নাইজেরিয়াতে চাকরি করেন। ১৯৯২ সালে শেষ বয়সে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিশ্বসাহিত্য পাঠ করেছেন। গঠন করেছেন নাট্যদল ‘শতাব্দী’। বাংলা নাট্যজগতে তৃতীয় থিয়েটারের স্রষ্টাও তিনি। নাটকের বিষয়, আঙ্গিক, পরিবেশন রীতি নিয়ে আজীবন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর হাত ধরেই নতুন সাহিত্য সমালোচনার ধারা ‘নিউক্লিয়ার ক্রিটিসিজম’ গড়ে ওঠে। ১৯৬০-৭০ এর মধ্যে লিখিত নাটকগুলিতে ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ই আগস্টের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার অভিঘাত প্রসঙ্গ আছে, পারমাণবিক বোমার প্রভাব নিয়ে এত সাহিত্য কেউ সৃষ্টি করেননি। থার্ড থিয়েটার, অ্যাবসার্ড থিয়েটার, একাঙ্ক নাটক, হাস্যরসাত্মক কমেডি নাটক, রাজনৈতিক নাটক, সামাজিক নাটক বিভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয়ের নাটক তিনি লিখেছেন। অসংখ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। অনুবাদ করেছেন। সাগিনা মাহাতো, মিছিল, লক্ষীছাড়ার পাঁচালী, ভোমা, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস, হট্টমেলার ওপারে, সলিউশন এক্স, বড়ো পিসীমা, রাম শ্যাম যদু, সমাবৃত্ত, এবং ইন্দ্রজিৎ, সারারাত্তির, বল্লভপুরের রূপকথা, বাকি ইতিহাস, বাঘ, প্রলাপ, ত্রিংশ শতাব্দী, বিবর, পাগলা ঘোড়া, সার্কাস তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তিনি সঙ্গীত অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন দু’বার, পেয়েছেন পদ্মশ্রী পুরস্কার। তাঁর নাটক বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানে আজও পঠিত হয়।

৪০৪.৪.৮.২ : প্রবন্ধের ভাববস্তু

বাদল সরকার নাট্যকার হিসাবে পরিচিত, সমাদৃত। কিন্তু তাঁর নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর নাট্যবিশ্লেষক সত্তারই পরিচায়ক। 'তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক' প্রবন্ধটি বাদল সরকারের 'থিয়েটারের ভাষা ও অন্যান্য' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের দুটি অংশ—তৃতীয় থিয়েটার এবং বাঙালি দর্শক। 'বাঙালি দর্শক' এই শব্দবন্ধটির তাৎপর্য বোঝানোর জন্য প্রাবন্ধিক চারটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

দৃশ্য : এক— মিষ্টি জল ধরে রাখার জন্য গ্রামপ্রকল্পের উদ্যোগে সুন্দরবনের এক গণ্ডগ্রামে খাল খোঁড়া হচ্ছে। গ্রামের ফুরনের কাজে এসেছে এমন লোকজন তাদের ঘিরে ধরলো। আগের রাতে তারা ছ'হাজার মানুষের মধ্যে বসে 'ভোমা' নাটক, 'লক্ষীছাড়ার পাঁচালী' কবিগান দেখেছে, শুনেছে। আর সকলের মতো লোকটির খালি গা, খালি পা, শ্রমকঠিন পেশি, অনাহারশীর্ণ দেহ। গ্রামের স্কুল মাস্টার, যিনি এই প্রকল্পের পরিচালক, লোকটিকে জেরা করছিলেন—

—'ভোমা' কেমন লেগেছে?

—ভালো।

—বুঝতে পেরেছ?

—হ্যাঁ।

—কি ভালো লাগল? কি বুঝলে? গল্প ছিল না, গান ছিল না, তবে?

—আমাদের গরিব লোকদের বুঝতে কষ্ট নেই, বড়লোকেরা বুঝতে না পারে।

প্রাবন্ধিক তাকে পরিচায়িত করেছেন 'বাঙালি দর্শক' হিসাবে। যাদের পিতৃপুরুষ হয়তো বা ছিল সাঁওতাল বা ওঁরাও বা মুন্ডা। আর এখন বাঙালি, বাঙালি দর্শক।

দৃশ্য : দুই—দৃশ্যপট-বর্ধমান জেলার কাপাসটিকুরি গ্রাম, তিনশো সাঁওতাল দর্শকের বেশিরভাগ খালি গা, খালি পা। বাংলা বলে, বোঝেও। একেবারে শহুরে নাটক বলে পরিচিত 'মিছিল' একঘন্টা উদগ্র মনোযোগ নিয়ে তারা দেখেছে। নাটকের শেষে অভিনয় শিল্পীরা দর্শকদের আহ্বান জানালো স্বপ্নে দেখা মিছিলে যোগ দিতে। "এক বৃদ্ধ উঠে হাত না ধরে জড়িয়ে ধরলেন আমাদের একজনকে, তাঁর চোখে জল।"

প্রাবন্ধিক বললেন, "সাঁওতাল, তবু বাঙালি। বাঙালি দর্শক।"

দৃশ্য : তিন—উত্তর চব্বিশ পরগণার সুটিয়া গ্রামের পঁয়তাল্লিশ বছরের ভূমিহীন খেতমজুর। রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অভিনয় দেখে পরদিন সকালে চৈত্রের রৌদ্রে, ধানখেতের আল বেয়ে ধুলোভরা পথ ধরে রামচন্দ্রপুরের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। ওখানে অভিনয় দেখে আবার ঠাকুরনগরের উদ্দেশে হাঁটতে লাগলেন। সেখানে রাত বেড়ে গেল, ফেরা হল না। স্টেশনে খালি পেটে থাকবেন বলে বসে রইলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল—"কেন এলেন এতটা?

কি জানি? কেমন যেন নেশা লেগে গেল, ফিরতে পারলাম না।

বাঙালি দর্শক।"

দৃশ্য : চার—বেলা এগারোটা থেকে রামচন্দ্রপুরে আসর ছিল। আসরের শেষে গামছা, চাদর হাতে আমাদের দুজন দান গ্রহণ করছিল। এক বৃদ্ধা, ছেঁড়া কাপড়, হাতে ঝুলি; ঝুলি খুলে ভিক্ষালব্ধ খুচরো পয়সা থেকে সাবধানে বেছে পাঁচ পয়সার একটি মুদ্রা চাদরে ফেললেন। নাট্য আন্দোলনে দর্শক সরাসরি অংশ গ্রহণ করছে। বাঙালি দর্শক।

প্রাবন্ধিক বলছেন, এরা সবাই তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক। যদিও 'বাঙালি দর্শক' কথার মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত (বা উচ্চবিত্ত) লেখাপড়া জানা, ভদ্রলোক দর্শককে ধরে নেওয়া হয়েছে। সেরকম দর্শকও আছেন তৃতীয় থিয়েটারের। যারা নামমাত্র চাঁদা বা না থাকলে কিছু না দিয়ে অভিনয় দেখতে এসেছেন। প্রাবন্ধিকের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায়, তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক নিরন্ন, অনাহারক্লিষ্ট, যাদের পিতৃপুরুষ সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিহীন খেতমজুর, ভিক্ষুক পর্যন্ত।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় থিয়েটার। তৃতীয় নামটার গুরুত্ব সামান্যই। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বহন করে আজও ভারতে দুটি সমান্তরাল সংস্কৃতি—একটি গ্রামে, একটি শহরে। কাব্য, চিত্রকলা, সংগীতের মতো থিয়েটারও সমান্তরাল ধারায় চলছে। দেশের ঔপনিবেশিক চরিত্র যতক্ষণ না ঘুচছে ততদিন সমান্তরাল ধারায়ই চলবে, মিলবে না। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "এই দুই থিয়েটারের বিকল্প যদি দরকার হয় কোনো নাট্যকর্মীর এবং যদি তৈরি হতে আরম্ভ করে সেরকম কোনো নাট্যধারা, তবেই তাকে তৃতীয় বলা চলে।" (পৃ ১০৩) এক বিশেষ ধরণের দেশে, একটি বিশেষ যুগে, একটি বিশেষ তাগিদে এই বিকল্প থিয়েটারের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এই বিকল্প থিয়েটারের প্রয়োজনটা কাদের? যারা থিয়েটারকে ভালবাসে, যারা থিয়েটারের মাধ্যমে নিজের কথা অন্যকে বলতে চায়, অন্যকে বোঝাতে চায় এই বৃহত্তর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কথা, তাদেরই প্রয়োজনে বিকল্প থিয়েটারের অনুসন্ধান।

কিন্তু বিকল্প কেন? কী আছে এই থিয়েটারে? প্রথম থিয়েটার হল লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। এ ধরণের নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। আর দ্বিতীয় থিয়েটার শহরের থিয়েটার, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের কর্মক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র। সেই থিয়েটার সমাজ পরিবর্তনের কথা, প্রগতির কথা বলে কিন্তু যারা সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেই শ্রমজীবী মানুষ থিয়েটারে আসে না। তাদের কাছে এই থিয়েটার নিয়ে যাওয়াও ব্যয়সাধ্য, অসুবিধাজনক, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তাই যারা বৃহৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছে ওই কয়েকটি মানুষের প্রয়োজনে বিকল্প থিয়েটারের প্রয়োজন।

এই বিকল্প থিয়েটার তথা তৃতীয় থিয়েটারের বাহ্যিকরূপ প্রাবন্ধিকের মতে—"একটি নমনীয় (flexible), বহনীয় (portable) এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য (in-expensive) থিয়েটার"। নমনীয় অর্থাৎ এই থিয়েটার যে কোনো স্থানে, যে কোনো অবস্থায় করা যাবে। বহনীয় অর্থাৎ এই থিয়েটারের কুশীলব নিজেরাই যাবতীয় সরঞ্জাম বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। তাই স্বল্পব্যয়, কারণ মঞ্চসজ্জা, স্পটলাইট, পোশাক, দামি সরঞ্জামের প্রয়োজনও হয় না, বহনও করতে হয় না। এই বাহ্যিক রূপ বাদ দিলে যা থিয়েটারের মূল তথা অপরিহার্য সরঞ্জাম-সেটি হল মানুষের শরীর। শিল্পীর শরীরের মাধ্যমেই থিয়েটারের প্রকাশ। তাই প্রয়োজন ঐকান্তিক শিক্ষা ও কঠিন অনুশীলন। শিল্পীরাই তাদের অভিনয় দিয়ে মঞ্চ, পোশাক, পরিস্থিতিকে প্রকাশ করবেন। প্রাবন্ধিক আবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে, থিয়েটার সার্কাস বা জিমন্যাস্টিক নয়। শুধু শরীর দিয়ে থিয়েটার হয় না। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে এই তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম। এই থিয়েটারের উৎস—'কি বলতে চাইছি' অর্থাৎ মন। তা

থেকে আসছে 'কাকে বলতে চাইছি' এবং 'কিভাবে বলব'। তৃতীয় থিয়েটারের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের মন, সরঞ্জাম হচ্ছে মানুষের শরীর। প্রাবন্ধিক জ্যামিতিক আকারে জানিয়েছেন—মন > শরীর > নাট্যে প্রকাশ > অন্য মানুষের মন। নাট্যকার, পরিচালক বা গোষ্ঠীনেতা নয়, এর ভিত্তি হচ্ছে তৃতীয় থিয়েটারে যুক্ত সব মানুষ। অন্য থিয়েটারে 'তারকা' হবার উদ্দেশ্যে, বেচাকেনার উদ্দেশ্যে, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে থিয়েটারের বিষয়বস্তু গ্রহণ করা সম্ভব, তৃতীয় থিয়েটারে তা সম্ভব নয়। তাই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন—"এ থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন। একটি রাজনীতিও বলা চলে একে"। (পৃ ১৩৫)

এ থিয়েটারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্বিকার থাকা অসম্ভব। এ থিয়েটারে কেনাবেচার ব্যবসা অসম্ভব। তাই তৃতীয় থিয়েটার ফ্রী। কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কের মূল্য এ থিয়েটারে প্রবেশের শর্ত নয় এবং টাকার উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ দর্শক ও থিয়েটার যারা করেন তারাও অর্থনৈতিক দিক থেকে ফ্রী, মুক্ত, স্বাধীন। প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারে হয় দর্শকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের টিকিট নিতে হয়, নয়তো সরকারি অনুদান নিতে হয় কিংবা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা নিতে হয়। আর তৃতীয় থিয়েটার এই তিনটি পদ্ধতির একটিও গ্রহণ না করে চলছে। এখানে নাট্যকর্মীরা কিছু দেন ও না, কিছু নেন ও না। এখান থেকেই মুক্তি শুরু। মানুষ থেকে মানুষ। মাঝখানে টাকার ব্যবধান নেই, কারণ ক্রেতা বিক্রেতা নেই।

তৃতীয় থিয়েটারের মূল হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। নতুন নাট্যশৈলী আবিষ্কার এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিষয়বস্তুর নিরিখে নতুন নাট্যশৈলী খুঁজে নিতে হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হয়। নাট্যশৈলীর খাতিরে বিষয়বস্তু নয়, বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাট্যশৈলী খোঁজা। তৃতীয় থিয়েটারের দর্শকের কোনো অভাব নেই। সারা দেশের লোকই দর্শক। তাঁদের দোরগোড়ায় এই থিয়েটার নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই নাট্যকার তাঁর দল নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামে, কখনো আমন্ত্রণে, কখনো বিনা আমন্ত্রণে। দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত দানে খরচ উঠে আসছে। আসলে দর্শকের অভাব নেই, অভাব নাট্যকর্মীর, নাট্যগোষ্ঠীর। তার কারণ, বৃহত্তর স্বার্থ উপলব্ধি, থিয়েটার করতে চাওয়া, যথেষ্ট সময় দিতে পারা, এখন এরকম নাট্যকর্মীর সংখ্যা বিরল। গ্রামের মানুষ, কারখানার মানুষ, বস্তির মানুষ নিজেরাই নিজেদের জীবন নিয়ে নাটক তৈরি করবেন, দেখাবেন নিজেদের মতো মানুষকে। সেই পদ্ধতি শুরু হয়েছে—এমন আশাবাদী ভাবনার কথা বলেছেন। আসলে তৃতীয় থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালি দর্শকের দর্শনগত সাযুজ্য আছে। এই দর্শকের জন্যই তৃতীয় থিয়েটার, বিকল্প থিয়েটার।

৪০৪.৪.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শকের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাবন্ধিক তার স্বরূপ উন্মোচন করো।

২। "এ থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন"—এই মন্তব্যের আলোকে তৃতীয় থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৩। তৃতীয় থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালি দর্শকের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো।

৪০৪.৪.৮.৪ : গ্রন্থপঞ্জি

১। থিয়েটারের ভাষা ও অন্যান্য, জানুয়ারি ২০১১, সূত্রধর, কলকাতা ৩।

২। বাদল সরকার, নাটক সমগ্র, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:।

৩। শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার' থীমা, ২০১৭, কোল-২৬।